মাছচাষ ম্যানুয়াল

সম্পাদকমন্ডলী

সৈয়দ আরিফ আজাদ	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর বাংলাদেশ	আহ্বায়ক
শেখ মুস্তাফিজুর রহমান	অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পিআরএল), মৎস্য অধিদপ্তর	সদস্য
জনাব নিত্যরঞ্জন বিশ্বাস	প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, এফআইকিউসি, মৎস্য অধিদপ্তর	সদস্য
জনাব মোঃ গোলজার হোসেন	পরিচালক (রিজার্ভ), মৎস্য অধিদপ্তর	সদস্য
জনাব মোঃ মনোয়ার হোসেন	পরিচালক, মৎস্য প্রশিক্ষণ একাডেমি, সাভার, ঢাকা	সদস্য
জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম	উপপরিচালক (অর্থ ও পরিকল্পনা), মৎস্য অধিদপ্তর,	সদস্য
জনাব মোঃ রমজান আলী	উপপরিচালক (প্রশাসন), মৎস্য অধিদপ্তর	সদস্য
জনাব খঃ মাহবুবুল হক	পরিচালক, প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট, এনএটিপি-২, মৎস্য অধিদপ্তর	সদস্য সচিব

প্রকাশনায়

মহাপরিচালক
মৎস্য অধিদপ্তর বাংলাদেশ
মৎস্য ভবন, ঢাকা

প্রকাশকাল

ফেব্রুয়ারী ২০১৮

আর্থিক সহায়তায়

প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট, এনএটিপি-২, মৎস্য ভবন, ঢাকা

মুদ্রণ

মানিকগঞ্জ প্রিন্টার্স এন্ড প্যাকেজিং

প্রচার সংখ্যা

২০০০ কপি

মুখবন্ধ

‘মাছে ভাতে বাঙালী’ বাংলার চিরায়ত ঐতিহ্য। একসময় এ ঐতিহ্য হারিয়ে যেতে বসেছিল। স্বাধীনতার ৪৬ বছর পর বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য উত্তরসুরী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনায় ও প্রাজ্ঞ নেতৃত্বে দেশ আজ মাছ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ। উন্নত প্রযুক্তির সম্প্রসারণ, মানসম্পন্ন মৎস্যবীজের প্রাপ্ততা নিশ্চিতকরণ, উৎপাদন সামগ্রী বিশেষ করে সম্পূরক খাদ্যের ব্যবহার মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। মাছ উৎপাদন বৃদ্ধিতে অগ্রণী ভূমিকা রাখছেন উদ্যোগী মাছচাষিগণ। মৎস্য উৎপাদনের ক্রমধারায় অব্যাহতভাবে প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে লাভজনকভাবে মৎস্যচাষ অব্যাহত রাখতে হবে। উৎপাদন ব্যয় বিশেষ করে মাছের খাদ্যের মূল্য বৃদ্ধির কারণে মাছচাষিরা প্রায়শই ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছেন। বিশেষ করে পাংগাস, কৈ, তেলাপিয়া ইত্যাদি মাছের বিক্রয়মূল্যে উৎপাদনকারীগণ সন্তুষ্ট নন। এজন্য উৎপাদন সামগ্রী সরবরাহ বা অন্য যে কোন ক্ষেত্রে প্রণোদনা প্রদানের মাধ্যমে মাছচাষকে লাভজনকভাবে অব্যাহত রাখা প্রয়োজন।

গবেষণা ও চাষিদের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে মৎস্যচাষ প্রযুক্তি ও চাষ ব্যবস্থাপনায় নানাবিধ পরিবর্তন হয়েছে। নতুন নতুন প্রজাতির চাষ, সম্পূরক খাদ্যের ব্যবহার, পানি ব্যবস্থাপনা, মজুদ ঘনত্ব ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রেই মাঠ পর্যায়ে প্রচলিত প্রযুক্তিতে নতুন মাত্রা যুক্ত হয়েছে। অধিক ঘনত্বে লাভজনকভাবে টেকসই মাছচাষ অব্যাহত রাখতে তথা মৎস্যচাষে বিনিয়োগ অব্যাহত রাখার জন্য যথাযথ প্রযুক্তিগত জ্ঞান ও প্রয়োজনীয় তথ্য জানা আবশ্যক। সেলক্ষ্যে উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে কর্মরত মৎস্য অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের জনবল ও অন্যান্য সম্প্রসারণ কর্মীদের ব্যবহারের জন্য প্রধান প্রধান বাণিজ্যিক মৎস্যচাষ ব্যবস্থাপনার কলাকৌশল অন্তর্ভূক্ত করে ‘মাছ চাষ ম্যানুয়াল’ প্রণয়ন করা হয়েছে। মাছচাষে ভাল চাষাভ্যাস বা Good Aquaculture Practices এখন সময়ের দাবী। এবিষয়টি বিবেচনায় রেখে গবেষণার ফলাফল ও মাঠ পর্যায়ে সফলভাবে ব্যবহৃত প্রযুক্তির আলোকে ম্যানুয়ালটি লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। ম্যানুয়ালটি মৎস্যচাষি, বিনিয়োগকারী, সম্প্রসারণ কর্মীসহ সংশ্লিষ্ট সকলের বিশেষভাবে কাজে লাগবে বলে আমার বিশ্বাস। এনএটিপি-২ এর পরিচালক, পিআইইউ ম্যানুয়ালটি প্রকাশনায় বিশেষ ভুমিকা রেখেছেন। এজন্য তাকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাই। এছাড়া মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণ যারা অক্লান্ত পরিশ্রম করে ম্যানুয়ালটি প্রণয়ন করেছেন এবং সম্পাদনায় যারা আমাকে বিশেষভাবে সহায়তা করেছেন তাদের সকলের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

ম্যানুয়ালে বর্ণিত প্রযুক্তিসমূহ মাছচাষিগণ ব্যবহার করে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি তথা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখতে সক্ষম হলেই ম্যানুয়ালটি প্রণয়ন সার্থক হবে।

সৈয়দ আরিফ আজাদ
মহাপরিচালক
মৎস্য অধিদপ্তর বাংলাদেশ

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	শিরোনাম	পৃষ্ঠা নং
০১	মাছচাষ বিষয়ে সাধারণ আলোচনা	০১-১০
০২	রুই জাতীয় মাছের চাষ	১১-১৬
০৩	তেলাপিয়া চাষ ব্যবস্থাপনা	১৭-১৯
০৪	পাংগাস মাছের চাষ ব্যবস্থাপনা	২০-২৪
০৫	কৈ মাছের চাষ	২৫-২৭
০৬	শিং মাছের চাষ	২৮-৩৪
০৭	পাবদা মাছের চাষ ব্যবস্থাপনা	৩৫-৪১
০৮	গুলশা মাছের চাষ ব্যবস্থাপনা	৪২-৪৬
০৯	গলদা চিংড়ি চাষ ব্যবস্থাপনা	৪৭-৫৫
১০	বাগদা চিংড়ি চাষ	৫৬-৬৫
১১	খাঁচায় মাছচাষ	৬৬-৭১
১২	মাছের নার্সারি ব্যবস্থাপনা	৭২-৭৬
১৩	শিং মাছের নার্সারি ব্যবস্থাপনা	৭৭-৭৮
১৪	পাবদা মাছের নার্সারি ব্যবস্থাপনা	৭৯-৭৯
১৫	বাগদা চিংড়ির নার্সারী ব্যবস্থাপনা	৮০-৮০
১৬	রোগ ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা	৮১-৮৮
১৭	মাছ চাষে ঝুঁকি এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা	৮৯-৯৩

১৮	গুড এ্যাকোয়াকালচার প্রাকটিসেস	৯৪-৯৫
১৯	পরিশিষ্ট-১ (Annexure-1)	৯৬-৯৭

মাছচাষ বিষয়ে সাধারণ আলোচনা

মাছ বাংলাদেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কৃষিজ পণ্য। দেশের জনগোষ্ঠির প্রাণিজ আমিষের প্রধান উৎস মাছ। আর্থসামাজিক উন্নয়ন বিশেষ করে দারিদ্র বিমোচন, কর্মসংস্থান, খাদ্য নিরাপত্তা ইত্যাদি ক্ষেত্রে অগ্রগতির প্রধান হাতিয়ার মৎস্যচাষ। এজন্য দেশের মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি তথা মৎস্যচাষ ও মৎস্য কার্যক্রমে বিনিয়োগ বৃদ্ধি অত্যন্ত জরুরী। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংখ্যা কর্তৃক পরিচালিত সাম্প্রতিক এক সমীক্ষায় বলা হয়েছে যে অদূর ভবিষ্যতে মৎস্য ও মৎস্যজাত দ্রব্যাদির চাহিদা উলেণ্টখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পাবে। চাহিদা বাড়ার অন্যতম প্রধান কারণগুলো হলো: কাংখিত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন, জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং খাদ্যাভ্যাসে পরিবর্তন। মাছ আমরা পাই দু'ভাবে- (১) আহরণ করে (capture fishery) এবং (২) চাষাবাদের সুবাদে (culture fishery)। বিশ্বে প্রথমোক্তটি অর্থাৎ কেবল আহরণ করা মাছের উৎপাদন পরিমাণ স্থির, এমনকি কমে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বাংলাদেশের বিগত ৪ দশকের পরিসংখ্যান সুস্পষ্টভাবে এটি তুলে ধরেছে যে এদেশে মোট জাতীয় মৎস্য উৎপাদনে capture fishery এর অবদান ক্রমশ: কমে আসছে। বিশ্বে অনেক দেশেই capture fishery ইতোমধ্যে সর্বোচ্চ স্থায়িত্বশীল উৎপাদন (Maximum Sustainable Yield) এর পর্যায়ে পৌঁছে গেছে বা খুব শীঘ্রই পৌঁছাতে যাচ্ছে। বাংলাদেশের উদাহরণ দিয়ে বলা যায় ক্রমবর্ধমান মৎস্যচাহিদা পূরণে culture fishery ক্রমশই: জোরালো ভূমিকা রাখতে সক্ষম এবং রেখে চলেছে যার ধারাবাহিকতায় ২০১৬-১৭ অর্থ বৎসরে কাংখিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের মাধ্যমে দেশ মৎস্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে সক্ষম হয়েছে। মৎস্যচাষ কার্যক্রম কাজের সুযোগ বৃদ্ধি করে ফলে অধিক সংখ্যক লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়, তাদের আয় বৃদ্ধি পায়। বিশেষজ্ঞদের দৃঢ় অভিমত এই যে, বর্তমানে প্রাপ্য সম্পদ ও প্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমেই মৎস্যচাষ হতে উৎপাদন আরও উলেণ্টখযোগ্য হারে বাড়ানো সম্ভব। এর জন্য প্রয়োজন কেবল ব্যক্তিগত বা পারিবারিক প্রয়োজন মেটানো ছাড়াও বাজার চাহিদা পূরণের জন্য বাণিজ্যিক মৎস্যচাষে বিনিয়োগ বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ।

স্মরণাতীতকাল থেকে বাংলাদেশের মানুষের দৈনন্দিন খাদ্য তালিকায় মাছ অপরিহার্য অংশ হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। আমিষ জাতীয় খাদ্যের মধ্যে প্রাণিজ আমিষ উচ্চ মানসম্পন্ন এবং এই আমিষই মানুষের জন্ম হতে মৃত্যু পর্যন্ত দেহের অতীব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। শরীর ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বৃদ্ধিসহ শিশুদের মস্তিস্ক বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রতিভার বিকাশ সাধনে প্রাণিজ আমিষের অবদান অনস্বীকার্য। শিশুদের পুষ্টিহীনতা দূরীকরণসহ গর্ভাবস্থায় প্রসূতির অপুষ্টি পূরণেও আমিষ জাতীয় খাদ্য মুখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। প্রাণিজ আমিষের মধ্যে মৎস্য আমিষই উত্তম। এ আমিষ সহজপ্রাচ্য এবং মাছের হাড় ও কাঁটা নরম ও সরু হওয়ায় সহজেই হজম হয়ে শরীর গঠন ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজে সহায়তা করে। এছাড়া মাছের অন্যান্য পুষ্টিগত উপাদান হচ্ছে ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, লোহা ও ভিটামিন-এ। এগুলো মানবদেহের বিভিন্ন ক্রিয়া-প্রক্রিয়ায় ও গঠনমূলক কাজে লাগে। সামুদ্রিক মাছের তেল রক্তের কোলেস্টেরল কমায়, ফলে হৃদরোগের ঝুঁকি কমে। নিচের সারণীতে বিভিন্ন মাছের পুষ্টিমানের একটি বিবরণ দেয়া হলো। (প্রতি ১০০ গ্রাম)

প্রজাতি	আমিষ (গ্রাম)	স্নেহ (গ্রাম)	লোহা (গ্রাম)	ক্যালসিয়াম (গ্রাম)	ফসফরাস (গ্রাম)	পানি (গ্রাম)
ইলিশ	২১.৮	১৯.৪	০.২১	০.১৮	০.২৮	৫৩.৭
রুই	১৬.৬	১.৪	০.০৮৫	০.৬৮	০.১৫	৭৬.৭
কাতলা	১৯.৫	২.৪	০.৭৬	০.৫১	০.২১	৭৩.৭
মৃগেল	১৯.৫	০.৮	০.৯	০.৩৫	০.২৮	৭৫.০
কালবাউশ	১৪.৭	১.০	০.৩৩	০.৩২	০.৩৮	৮১.০
পাঙ্গাশ	১৪.২	১০.৮	০.০০০৫২	০.১৮	০.১৩	৭২.৩
বোয়াল	১৫.৪	২.৭	০.৬২	০.১৬	০.৪৯	৭৩.০
আইড়	১৫.৯	১.৩	০.৩৯	০.৩৮	০.১৮	৭৮.১
চিতল	১৮.৬	২.৩২	২.৯৮	০.১৮	০.২৫	৭৫.০
ফলি	১৯.৮	১.০	০.১৬	০.৫৯	০.৪৫	৭৩.৩

সরপুঁটি	১৫.৫	৯.৫	০.৫৪	০.২২	০.১২	৭০.২
শিং	২২.৮	০.৬	০.২৬	০.৬৭	০.৬৫	৬৮.০
মাগুর	১৫.০	১.০	০.৭১	০.২১	০.১৯	৭৮.২
কই	১৪.৮	৮.৮	১.৩৫	০.৪১	০.৩৯	৭০.০
ট্যাংরা	১৯.২	৬.৫	০.৩	০.২৭	০.১৭	৭২.৬
পাবদা	১৯.২	২.১	১.৩	০.৩১	০.২১	৭২.০
পুঁটি	১৮.১	২.৪	০.৯৬	০.৯১	০.৯৫	৭৫.০
মলা	১৮.০	৪.১	০.৪	০.৫৫	০.৩৫	-

মাছচাষ বর্তমানে শুধুমাত্র ব্যক্তিগত বা পারিবারিক চাহিদা পূরণের জন্য করা হয় না বরং এটি এখন একটি লাভজনক কৃষিকাজ বা ব্যবসা তথা বাণিজ্যিক কার্যক্রম। বাণিজ্যিক মৎস্যচাষের মুখ্য উদ্দেশ্য সম্ভাব্য সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জন। মৎস্যচাষে সফলতার জন্য প্রয়োজন উন্নত লাগসই প্রযুক্তি, মানসম্পন্ন উৎপাদন উপকরণ এবং যথোপযুক্ত বাজার ব্যবস্থা। সামাজিক স্থায়িত্বশীল মৎস্যচাষ পদ্ধতির ব্যবস্থাপনাকে তিনটি আন্তঃসম্পর্কীয় বিষয়ের সমন্বিত প্রয়োগ হিসেবেই দেখা হয়। বিষয় তিনটি হলো:

১. মৎস্যচাষ প্রযুক্তি ২. সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে বিবেচ্য বিষয়াদি ও ৩. পরিবেশ সম্পর্কিত বিষয়াদি

চিত্র ১: একনজরে স্থায়িত্বশীল মৎস্যচাষ ব্যবস্থার উপাদানসমূহের আন্তঃসম্পর্ক

উপরোক্ত তিনটি বিষয়ের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক যত নিবিড় ও কার্যকর হবে বাণিজ্যিক মৎস্যচাষ কার্যক্রম ততই সফলতা পাবে। মাছ এবং বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ অন্যান্য জলজ বিষয়াদির চাষের সফলতা বহুলাংশে নির্ভর করে পানির গুণাগুণের ওপর অর্থাৎ জলজ পরিবেশের ওপর। অন্য দিকে পানির গুণাগুণ প্রধানত নির্ভর করে সংশ্লিণ্টষ্ট ভৌগোলিক এলাকার পরিবেশের ওপর। জলজ পরিবেশের গুণাগুণ নির্ভর করে নিম্নোক্ত ৪টি বিষয়ের ওপর:

১. ভৌত উপাদানসমূহ, ২. রাসায়নিক উপাদানসমূহ, ৩. জৈব উপাদানসমূহ, এবং ৪. আবহাওয়াগত উপাদানসমূহ

মাছচাষে আমরা এসব উপাদানসমূহের প্রভাব নিয়ন্ত্রণ করার প্রয়াস পাই। প্রয়োজনমত প্রভাব নিয়ন্ত্রণ করা না গেলে হিতে বিপরীত হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে পানির গুণাগুণকে মাছের উৎপাদনে সহায়ক শক্তিতে রূপান্তর করতে পারার ওপর পানির উৎপাদনশীলতা নির্ভরশীল। উৎপাদনশীল ও অনুৎপাদনশীল পুকুরের মধ্যে পার্থক্যগত বৈশিষ্ট্যাবলি নিম্নের সারণিতে (সারণি-৩) বর্ণনা করা হলো:

চিত্র-২ পানির গুনাগুণ এবং মৎস্য উৎপাদনের আন্তঃসম্পর্ক

সারণি-৩: উৎপাদনশীল ও অনুৎপাদনশীল পুকুরের মধ্যে বৈশিষ্ট্যগত পার্থক্যাবলি

উৎপাদনশীল পুকুর	অনুৎপাদনশীল পুকুর
১. পুকুরের তলদেশের মাটি দোঁআশ; ২. খুব বেশী গভীর নয় যার ঢাল ক্রমশ: নেমে এসেছে (২:১ এটেল কর্দমাক্ত মাটির জন্য; ৩:১ দোঁআশ বা বালিময় মাটির জন্য); ৩. পুকুরের সম্পূর্ণ বা প্রায় সব পানি উৎপাদনশীল; ৪. পানির পি-এইচ ৭.৫ - ৮.৫;	১. পুকুরের তলদেশের মাটি বালিময় অথবা খুবই এটেল; ২. খাড়া পাড়যুক্ত গভীর পুকুর; ৩. পানির কেবল একাংশ উৎপাদশীল; ৪. পানি অম্ল-ীয় পিইচ ৬.৫ এর কম অতিক্ষারীয় পি এইচ ৮.৫ এর বেশী সর পরিমাণ কম;

৫. দ্রবীভূত অক্সিজেন ৫ পিপিএম বা তার বেশী; ৬. পানির স্বচ্ছতা ৪০ সে.মি. অথবা তার চেয়ে কম (মূলত প্লণ্টাংক্টনের কারণে ঘোলাত্ব); ৭. পানির গভীরতা হ্রাসের বার্ষিক হার ১ মিটারের কম; ৮. প্রয়োজনে পানি সরবরাহের নিশ্চিত ও স্থায়ী ব্যবস্থা আছে; ৯. পানিতে প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান যেমন নাইট্রোজেন এবং ফসফরাসের পরিমাণ বেশী।	৫. দ্রবীভূত অক্সিজেন ৫ পিপিএম এর কম; ৬. একই কারণে পানির স্বচ্ছতা ৪০ সে.মি. এর বেশী; ৭. এই হার ১ মিটারের বেশী; ৮. এই ধরনের কোন ব্যবস্থা নেই; ৯. নাইট্রোজেন এবং ফসফরাসের পরিমাণ কম।

মাছের বাসস্থান হচ্ছে জলাশয় এবং জীবন ধারণের একমাত্র মাধ্যম হচ্ছে পানি। সুতরাং মাছের সেই বাসস্থান হওয়া চাই স্বাস্থ্যসম্মত। মাছের খাদ্যগ্রহণ, বেঁচে থাকা, দৈহিক বৃদ্ধি, প্রজনন এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কার্যাদি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য ভৌত, রাসায়নিক ও জৈবিক গুণাবলীর একটি অনুকূল মাত্রা রয়েছে। জলজ পরিবেশে এসব গুণাবলীর অনুকূল মাত্রা মাছচাষে কাঙ্ক্ষিত উৎপাদনে সহায়ক ভুমিকা পালন করে থাকে অর্থাৎ মাটি ও পানির গুণাগুণের ওপরই নির্ভর করে মাছের উৎপাদন ভাল হবে কিনা। কোন জলাশয়ের পানি ধারণের আধার হলো মাটি। ভাল মাটিতে যেমন ভাল ফসল হয় ঠিক তেমনি ভাল মাটির পুকুরেও মাছের ভাল উৎপাদন পাওয়া সম্ভব। জলাশয়ের উৎপাদন ক্ষমতা প্রাথমিকভাবে মাটির ধরনের ওপর নির্ভর করে। উর্বর মাটিতে খনন করা পুকুরে সাধারণভাবে মাছের উৎপাদনও ভাল হয়। উর্বর মাটি ও পানি মাছের প্রাকৃতিক খাদ্য তৈরির অধিক পরিমানে প্রয়োজনীয় পুষ্টির যোগান দেয়। সুতরাং মাছচাষে মাটি ও পানির গুণাগুণের গুরুত্ব অপরিসীম।

পুকুরের মাটি ও পানির গুণাগুণ যথাযথ মাত্রায় না হলে-

- মাছের প্রাকৃতিক খাদ্য যথেষ্ট পরিমাণ উৎপাদন হবে না;
- মাছের বৃদ্ধি আশানুরূপ হবে না;
- বাইরে থেকে দেয়া খাদ্যের অপচয় হবে;
- মাছের উৎপাদন কম হবে; এবং
- মাছ রোগবালাইয়ে আক্রান্ত হয়ে মারা যেতে পারে।

পানির গুণাগুণ

পানির গুণাগুণ বলতে মাছের বেঁচে থাকা ও স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য পানির সহনশীল অবস্থাকে বুঝায়। পানিতে বিভিন্ন ধরনের গ্যাস, যেমন- অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, কার্বন ডাই-অক্সাইড, অনায়নিত অ্যামোনিয়া, হাইড্রোজেন সালফাইড এবং মিথেন; অজৈব পদার্থসমূহ, যেমন- ফসফরাস, ক্যালসিয়াম, পটাসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, সোডিয়াম ইত্যাদি; দ্রবীভূত জৈব পদার্থ যেমন- এমাইনো এসিড, প্রোটিন, শর্করা, ফ্যাটি এসিড, ভিটামিন ও টেনিক এসিড; অদ্রবীভূত জৈব পদার্থসমূহ, যথা- ব্যাক্টেরিয়া, প্রোটোজোয়া, উদ্ভিদ ও প্রাণী-প্লণ্টাংকটন; অদ্রবণীয় জৈব পদার্থসমূহ যথা- মাটির কণা ইত্যাদি বিভিন্ন মাত্রায় বিদ্যমান থাকে। এগুলো ছাড়াও কিছু ভৌত উপাদান, যেমন- তাপমাত্রা, পানির গভীরতা, আলো, ঘোলাত্ব ইত্যাদি পানির গুণাগুণের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। নিচে পানির গুণাগুণ নিয়ন্ত্রণকারী ভৌত-রাসায়নিক ও জৈবিক উপাদান সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

১. পানির ভৌত গুণাগুণ

পানির ভৌত অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে পুকুরের উৎপাদন ক্ষমতা সম্পর্কে ধারণা করা যায়। পানির ভৌত গুণাগুণগুলো নিম্নরূপ:

বর্ণ

পানির হালকা সবুজ বর্ণ পুকুরের অধিক উৎপাদনশীলতা নির্দেশ করে। পানিতে নাইট্রেটের পরিমাণ কম হলে পানির বর্ণ হলুদাভ হয়। ফসফরাসের পরিমাণ কমে গেলে পানি কালচে বর্ণ ধারণ করে। ধূসর বর্ণের পানিতে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ কম থাকে। কোন কোন উদ্ভিদ-প্লাঙ্কটনের আধিক্যের জন্য পানির বর্ণ মরচে লাল হয়, কিন্তু এগুলো মাছের খাদ্য নয়। নিচের সারণিতে পানির বর্ণের ওপর ভিত্তি করে মাছ চাষের উপযোগিতার ধারণা প্রদান করা হলো।

সারণি-১: পানির বর্ণের ওপর ভিত্তি করে মাছ চাষে জলাশয়ের উপযোগিতার ধরন

পানির বর্ণ	প্রাকৃতিক খাদ্যের পরিমাণ ও প্রকৃতি	মাছচাষে উপযোগিতা
স্বচ্ছ	উদ্ভিদ-প্ল- াংকটন নাই	ভাল নয়
সবুজাভ	পরিমাণমত উদ্ভিদ-প্লণ্ঢাংকটন আছে	ভাল
ঘন সবুজ	অতিরিক্ত উদ্ভিদ-প্লণ্ঢাংকটন আছে	ক্ষতিকর
বাদামী সবুজ	পরিমাণমত উদ্ভিদ ও প্রাণী-প্লণ্ঢাংকটন আছে	উত্তম
ধূসর সবুজ	অল্প উদ্ভিদ-প্ল- াংকটন ও ভাসমান পলিকণা বিদ্যমান	কম উপযোগী
মরচে লাল	মাছের খাদ্য নয় এমন উদ্ভিদ-প্ল- াংকটন বিদ্যমান	উপযোগী নয়

গভীরতা

মাছের প্রাকৃতিক খাদ্য প্লণ্ঢাংকটনের উৎপাদন ও সালোকসংশ্লেণ্ঢষণের জন্য সূর্যালোক অপরিহার্য। পুকুর বেশি গভীর হলে সূর্যালোক নির্দিষ্ট গভীরতা পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে না, এতে প্রাকৃতিক খাদ্যের পর্যাপ্ত উৎপাদন হয় না, ফলে মাছের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। পুকুরের গভীরতা কম হলে পানি গরম হতে পারে এবং তলদেশে ক্ষতিকর উদ্ভিদ জন্মাতে পারে। পানির গভীরতা বেশি হলে পুকুরের তলদেশে তাপমাত্রা কম থাকে, অক্সিজেনের অভাব ঘটে এবং তলদেশে ক্ষতিকর গ্যাস সৃষ্টি হয়। এ অবস্থায় দূষণ এড়াতে তলদেশের মাছ ও অন্যান্য প্রাণী পানির উপরিভাগে চলে আসে।

স্বচ্ছতা ও ঘোলাত্ব:

পুকুরের পানি ঘোলা হলে কার্যকর সূর্যালোক পানির নির্দিষ্ট গভীরতা পর্যন্ত প্রবেশ করতে পারে না। ফলে মাছের প্রাকৃতিক খাদ্য অর্থাৎ উদ্ভিদ-প্লণ্ঢাংকটনের উৎপাদন কমে যায়। আবার পানির উপরের স্তরে অতিরিক্ত উদ্ভিদ-প্লণ্ঢাংকটন উৎপাদনের ফলেও পানির স্বচ্ছতা কমে যেতে পারে। এতে অক্সিজেনের অভাবে মাছের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হয়। পানির স্বচ্ছতা ২৫ সেন্টিমিটার হলে পুকুরের উৎপাদন ক্ষমতা বেশি হয়। ঘোলা পানি মাছের খাদ্য চাহিদাকে প্রভাবিত করে। ঘোলা পানিতে দ্রবীভূত বিভিন্ন ধরনের কণা মাছের ফুলকায় আটকে থেকে ফুলকা বন্ধ করে দেয়। এতে মাছের শ্বাস নিতে কষ্ট হয়। ফলে মাছের খাদ্য চাহিদা হ্রাস পায়।

১. প্রতি শতকে ১.০-১.৫ কেজি হারে জিপসাম প্রয়োগ করে পানির ঘোলাত্ব দূর করা যায়।
২. পুকুরের কোণায় খড়ের ছোট ছোট আটি রেখে দিলেও ভাল ফল পাওয়া যায়।

তাপমাত্রা

মাছ শীতল রক্তবিশিষ্ট জলজ প্রাণী। মাছের শরীরের তাপমাত্রা পানির তাপমাত্রার সাথে উঠানামা করে। তাই মাছের বৃদ্ধি হার তাপমাত্রাার সাথে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত। গ্রহণযোগ্য সীমার (Optimum) মধ্যে তাপমাত্রা বাড়লে মাছের খাদ্য গ্রহণের প্রবণতাও বেড়ে যায়। যথাযথ তাপমাত্রায় অধিক খাদ্য গ্রহণের সাথে সাথে হজম ক্রিয়া ও নিঃসরণে কম সময় লাগে। ফলে অধিক পরিমাণে শক্তি উৎপন্ন হয়, কিন্তু ব্যয় হয় কম পরিমাণ। ফলে মাছের বৃদ্ধি দ্রুততর হয়। তবে তাপমাত্রা অত্যধিক বেড়ে গেলে পানিতে অক্সিজেনের মাত্রা কমতে থাকে। এতে মাছের খাদ্য গ্রহণের হার হ্রাস পায় এবং মাছ মারা যেতে পারে। আবার তাপমাত্রা কমে গেলে মাছের খাদ্য গ্রহণের হার কমে যায়। এজন্য শীতকালে পুকুরে সার ও খাদ্যের পরিমাণ কিছুটা কমিয়ে দিতে হয়। তাপমাত্রা খুব বেশি কমে গেলে মাছ খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে দিতে পারে। প্রসঙ্গত উলেণ্ঢখ্য, অগভীর (<১.১৫মি.) ছোট পুকুরে (<১০শতাংশ) তাপমাত্রা খুব দ্রুত উঠানামা করে থাকে।

রুইজাতীয় মাছ চাষের জন্য অনুকূল তাপমাত্রা ২৫-৩০ ডিগ্রী সে.। কোন কারণে পুকুরে পানির তাপমাত্রা বেড়ে গেলে বাইরে থেকে পরিষ্কার ঠান্ডা পানি সরবরাহ করা যেতে পারে। টোপাপানা দ্বারাও পুকুরের পানির ১০ ভাগ আয়তনে সাময়িকভাবে ছায়ার ব্যবস্থা করে বেশি তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে।

নিচের সারণিতে বিভিন্ন তাপমাত্রায় চাষোপযোগী কয়েকটি মাছের খাদ্য চাহিদা ও বৃদ্ধির হার দেওয়া হলো।

সারণি-২: পানির তাপমাত্রার সাথে মাছের বৃদ্ধি সম্পর্ক

মাছের প্রজাতি	তাপমাত্রা (°সে.)	খাদ্য চাহিদা	মাছের বৃদ্ধি	মন্তব্য
কাতলা, রুই, মৃগেল	৩০-৩৫ ২০ <১০	সবচেয়ে বেশি অপেক্ষাকৃত কম শুন্য	সর্বোচ্চ মোটামুটি বন্ধ	অনুকূল তাপমাত্রা - খাওয়া বন্ধ করে দেয়
সিলভার কার্প	৩০ ২০ ১৫	সবচেয়ে বেশি অপেক্ষাকৃত কম নূন্যতম	সর্বোচ্চ কিছু কম খুব কম	অনুকূল তাপমাত্রা - -
বিগহেড কার্প	৩০ ২০-২৫ ১৫	সবচেয়ে বেশি অপেক্ষাকৃত কম নূন্যতম	সর্বোচ্চ কম খুব কম	অনুকূল তাপমাত্রা - -
গ্রাস কার্প	>৩৮ ৩৫ ২০-৩০ <১০	কম সবচেয়ে বেশি অপেক্ষাকৃত কম শুন্য	কম সর্বোচ্চ অপেক্ষাকৃত কম বন্ধ	অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে অনুকূল তাপমাত্রা - খাওয়া বন্ধ করে দেয়
তেলাপিয়া	>৪০ ৩০-৩৫ ১৫-১৬	শুন্য সবচেয়ে বেশি শুন্য	বন্ধ সর্বোচ্চ বন্ধ	মারা যায় অনুকূল তাপমাত্রা খাওয়া প্রায় বন্ধ করে দেয়।

সূর্যালোক

সূর্যালোকের ওপর পুকুরের প্রাথমিক উৎপাদশীলতা তথা উদ্ভিদ-প্লণ্ঢাংকটনের উৎপাদন নির্ভর করে। পুকুরের পানিতে আলোর প্রবেশ বিভিন্নভাবে বাধাগ্রস্থ হতে পারে। যথা- পুকুর পাড়ে বড় গাছপালা, পানির ঘোলাত্ব, জলজ আগাছা ইত্যাদি। পুকুর পাড়ে বড় গাছ থাকলে ডালপালা কেটে দিয়ে পানিতে সূর্যালোক প্রবেশের ব্যবস্থা করতে হবে। পুকুরের পানি ঘোলা হলে আলো প্রবেশে বাধাপ্রাপ্ত হয়, ফলে প্লণ্ঢাংকটনের উৎপাদন উপরিভাগের সামান্য স্তরব্যাপী সীমাবদ্ধ থাকে। বিভিন্ন ধরনের ভাসমান আগাছাও পানিতে সূর্যালোক প্রবেশে বাধার সৃষ্টি করে। এগুলো সরিয়ে ফেলতে হবে। পুকুরের পানিতে আলো প্রবেশ বাধাগ্রস্ত হলে উদ্ভিদ-প্লণ্ঢাংকটনের উৎপাদন কম হয়। ফলে মাছের উৎপাদনও কমে যায়।

২. পানির রাসায়নিক গুণাগুণ

পানির রাসায়নিক গুণাবলী জলজ পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণ করে। রাসায়নিক গুণাবলী পরীক্ষা করে পুকুরের উৎপাদনশীলতা সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাওয়া যায়। নিচে পানির বিভিন্ন রাসায়নিক গুণাগুণ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

দ্রবীভূত অক্সিজেন

অক্সিজেন জীবনের জন্য অপরিহার্য। প্রয়োজনীয় পরিমাণ অক্সিজেন ছাড়া কোন প্রাণীর স্বাভাবিক বৃদ্ধি সম্ভব নয়। সে কারণে পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেন মাছ ও চিংড়ি চাষের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সাধারণভাবে চিংড়ির অক্সিজেন চাহিদা কার্পের চেয়ে বেশি। কৈ, শিং মাগুর মাছের অক্সিজেন চাহিদা তুলনামূলক কম।

উদ্ভিদ-প্ল- ংকটন ও জলজ উদ্ভিদ সালোকসংশ্লেণ্ঢষণ প্রক্রিয়ায় যে অক্সিজেন প্রস্তুত করে তা পানিতে দ্রবীভূত হয়। বাতাস থেকে কিছু পরিমাণ অক্সিজেন সরাসরি পানিতে মিশে। পুকুরের মাছ, জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণী এ অক্সিজেন দ্বারা শ্বাসকার্য চালায়। রাতে সূর্যালোকের অভাবে পানিতে কোন অক্সিজেন প্রস্তুত হয় না। পুকুরের তলায় জৈব পদার্থ পচনেও অক্সিজেন ব্যবহৃত হয়। এজন্য সকালে পুকুরের পানিতে অক্সিজেনের পরিমাণ খুব কমে যায়, বিকেলে

অপেক্ষাকৃত বেশি থাকে। পানিতে ২.০ মি.গ্রা/লিটারের (২ পিপিএম) কম অক্সিজেন থাকলে রুইজাতীয় মাছ স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারে না। পুকুরের পানিতে ৫-৮ মি.গ্রা/লিটার (পিপিএম) হারে দ্রবীভূত অক্সিজেন থাকলে মাছ কাঙ্ক্ষিত হারে বৃদ্ধি পায়।

পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেনের উৎস দু'টি-

ক. পানি সংলগ্ন বাতাস

খ. সবুজ শেওলা ও ডুবন্ত জলজ-জীবের সালোকসংশ্লেণ্ডষণ দ্রবীভূত অক্সিজেনের মাত্রা পানির নিম্নোক্ত গুণাবলির ওপর নির্ভর করে :

১. তাপমাত্রা ২. লবণাক্ততা এবং ৩. বায়ুমন্ডলের চাপ

তাপমাত্রার সাথে দ্রবীভূত অক্সিজেনের মাত্রার ব্যস্তানুপাতিক (inversely proportional) সম্পর্ক রয়েছে। তাপমাত্রা বাড়লে দ্রবীভূত অক্সিজেনের মাত্রা কমে এবং তাপমাত্রা কমলে দ্রবীভূত অক্সিজেনের মাত্রা বৃদ্ধি পায়। নিচের সারণিতে বিভিন্ন তাপমাত্রায় পানিতে অক্সিজেনের দ্রবণীয়তা দেখানো হলো:

সারণি-৩: তাপমাত্রার সাথে দ্রবণীয়তার সম্পর্ক

তাপমাত্রা (^{o} সে.)	অক্সিজেনের দ্রবণীয়তা (মি. গ্রা/লিটার)
১৬	৯.৮৬
১৮	৯.৪৫
২০	৯.০৮
২২	৮.৭৩
২৪	৮.৪০
২৬	৮.০৯
২৮	৭.৮১
৩০	৭.৫৪

বিভিন্ন কারণে পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ কমে যেতে পারে। পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেন কমে যাওয়ার প্রধান কারণগুলো নিম্নরূপ:

- পানিতে বসবাসকারী জলজ জীবের শ্বাস-প্রশ্বাস;
- পুকুরের তলায় বিদ্যমান জৈব পদার্থের পচন;
- তলায় অবস্থিত গ্যাসের বুদবুদের সাথে বায়ুমন্ডলে অক্সিজেন চলে যাওয়া;
- আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকা;
- ক্ষতিকর ব্লুম (bloom) সৃষ্টি;
- মাটিতে লৌহের পরিমাণ বেশি থাকা;
- পানিতে গাছের পাতা ও ডালপালা পড়া;
- কাঁচা গোবর বেশি পরিমাণে ব্যবহার;
- পানি খুব ঘোলা হওয়া।

মাছ চাষে অক্সিজেনের প্রভাব

মাছ ও চিংড়ি চাষের জন্য দ্রবীভূত অক্সিজেনের সর্বোত্তম মাত্রা হচ্ছে ৫-৮ মি. গ্রা/লিটার। পানিতে অক্সিজেনের পরিমাণ কম হলে মাছ ও চিংড়ির বৃদ্ধি, খাদ্যের পরিবর্তন হার ও ডিমের সংখ্যাও কমে যায়। অক্সিজেন খাদ্যদ্রব্য হজমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পানিতে পরিমিত মাত্রায় অক্সিজেন থাকলে খাদ্যের পরিবর্তন হার বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত কম পরিমাণ খাদ্যে অধিক পরিমাণ মাছ উৎপাদন হয়। পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেনের মাত্রা বাড়লে

মাছের খাদ্য চাহিদা বৃদ্ধি পায় এবং অক্সিজেনের মাত্রা কমলে খাদ্য চাহিদা হ্রাস পায়। এছাড়াও শ্বাসকষ্টজনিত কারণে ব্যাপকভাবে মাছ ও চিংড়ি মারা যেতে পারে। পানিতে অক্সিজেনের পরিমাণ সহনশীল মাত্রার নিচে নেমে গেলে নিম্নরূপ লক্ষণগুলো পরিলক্ষিত হয়ে থাকে -

- মাছ পানির উপর ভেসে উঠে ও খাবি খায়;
- চিংড়ি পুকুর পাড়ের কাছে চলে আসে;
- মাছ ও চিংড়ি ক্লান্তিহীনভাবে পানিতে ঘোরাফেরা করতে থাকে।

পানির রং অতিরিক্ত সবুজ হলে, তলায় খুব বেশি জৈব পদার্থ থাকলে, অধিক ঘনত্বে মাছ-চিংড়ি মজুদ করা হলে, বা প্রয়োজনের তুলনায় বেশি পরিমাণ সার ও খাদ্য প্রয়োগ করা হলে উপরোক্ত অবস্থার সৃষ্টি হওয়ার আশংকা থাকে। সাধারণতঃ মধ্যরাত থেকে ভোরের দিকে বা মেঘলা দিনে পুকুরে অক্সিজেন স্বল্পতা দেখা দেয়। পুকুরে অক্সিজেন পরিমাপ করার সময় তলদেশের পানিতে কী পরিমাণ অক্সিজেন দ্রবীভূত আছে তা বিবেচনায় আনতে হবে।

সাময়িক অক্সিজেন ঘাটতি মোকাবেলার উপায়

- পানির উপরিভাগে ঢেউ সৃষ্টি করে বা পানি আন্দোলিত করে
- সাঁতার কেটে বা বাঁশ পিটিয়ে বা হাত দিয়ে পানি ছিটিয়ে
- পাম্প দিয়ে নতুন পানি সরবরাহ করে

কার্বন ডাই-অক্সাইড

মাছের বেঁচে থাকার জন্য অক্সিজেন যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি মাছের প্রাকৃতিক খাদ্য তৈরির জন্য কার্বন ডাই-অক্সাইড অপরিহার্য। সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার এটি একটি মৌলিক উপাদান। কার্বন-ডাই-অক্সাইড ছাড়া সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হতে পারে না। এরূপ অবস্থায় জলাশয়ের প্রাথমিক উৎপাদন (Primary production) ব্যাহত হয়। পুকুরের তলায় অত্যাধিক জৈব পদার্থ ও কাদা থাকলে অধিক তাপমাত্রায় পুকুরে এ গ্যাসের আধিক্য ঘটে। পানিতে ২ নিযুতাংশ কার্বন-ডাই-অক্সাইড থাকলে মাছের উৎপাদন ভাল হয়।

কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস পানিতে তাড়াতাড়ি দ্রবীভূত হতে পারে। পানিতে এ গ্যাসটি মুক্ত কার্বন-ডাই-অক্সাইড, বাইকার্বোনেট এবং কার্বনেট হিসেবে থাকতে পারে। পানিতে কার্বন ডাই-অক্সাইডের মূল উৎস হলো জৈব পদার্থের পচন এবং পানিতে অবস্থিত জলজ জীবের শ্বাস-প্রশ্বাস।

কার্বন ডাই-অক্সাইডের প্রভাব

পানিতে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ হ্রাস পেলে প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদন হ্রাস পায়। এতে মাছের খাদ্য চাহিদা পূরণ হয় না। আবার কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ অত্যধিক বৃদ্ধি পেলে পানির অম্লত্বের মাত্রা বৃদ্ধি পায়। ফলে প্রাথমিকভাবে প্রচুর প্রাকৃতিক খাদ্য তৈরি হলেও মাছের খাদ্য গ্রহণের প্রবণতা ও চাহিদা হ্রাস পায়।

মুক্ত কার্বন-ডাই-অক্সাইড সাধারণভাবে মাছ ও চিংড়ির জন্যে বিষাক্ত নয়। মাছ ও চিংড়ি কিছু সময়ের জন্য ৫০-৬০ মি. গ্রা/লিটার পর্যন্ত কার্বন-ডাই-অক্সাইড সহ্য করতে পারে। এ গ্যাসের বিষাক্ততা পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেনের ঘনত্বের ওপর নির্ভর করে। অক্সিজেনের ঘনত্ব বেশি হলে এর বিষাক্ততা কম হয়। পানিতে কার্বন ডাই-অক্সাইডের মাত্রা ১২ মি. গ্রা/লিটারের বেশি হওয়া উচিত নয়। পানিতে এর পরিমাণ বেশি হলে মাছ ও চিংড়ি শ্বাস কষ্ট হয়ে থাকে।

কার্বন ডাই-অক্সাইড নিয়ন্ত্রণের উপায়

- মজুদ ঘনত্ব ও সার প্রয়োগ নিয়ন্ত্রণ করে এবং পুকুরের গভীরতা কমিয়ে;
- নিয়মিত হররা টেনে;
- পানিতে ১.০ নিযুতাংশ হারে চুন প্রয়োগ করলে প্রায় ১.৫ নিযুতাংশ হারে কার্বন-ডাই অক্সাইড কমে যায়।

পিএইচ (pH)

ঋণাত্বক হাইড্রোজেন আয়ন ঘনত্বের পরিমাপকই পিএইচ। পিএইচ সংখ্যামান দ্বারা প্রকাশ করা হয়। এ পরিমাপক ০ থেকে ১৪ পর্যন্ত বিস্তৃত। পিএইচ-এর মাধ্যমে পানির অম্লত্ব ও ক্ষারত্বের পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়। এক্ষেত্রে ৭ নিরপেক্ষ মান, ৭ এর উপরে (৭-১৪) ক্ষারীয় মান এবং ৭ এর নিচে (৭-০) অম্লীয় মান নির্দেশ করে।

অপেক্ষাকৃত ক্ষারধর্মী পানি (পিএইচ ৬.৫-৯.০) মাছ চাষের জন্য ভাল। পিএইচ মাত্রা ৯.৫ এর বেশি হলে পানিতে মুক্ত কার্বন ডাই-অক্সাইড থাকতে পারে না। ফলে পানিতে উদ্ভিদ-প্লাঙ্কটনের উৎপাদন প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। এ অবস্থায় মাছের উৎপাদন দারুণভাবে ব্যাহত হয়। পানির পিএইচ ১১.০ হলে

বা ৪.০-এর নিচে নামলে মাছ মারা যেতে পারে। পিএইচ ৭.০-৭.৫ এর মধ্যে থাকলে ফসফরাস সারের কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায়। অম্ল পানিতে উদ্ভিদ-প্লাঙ্কটনের জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টির অভাব দেখা দেয়। পানি অম্লণ্ড হলে পুকুরে চুন দিতে হয়।

পানির পিএইচ মাছের খাদ্য চাহিদার ওপর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে। অম্ল পানি মাছ চাষের জন্য ভাল নয়। এ ধরনের পানিতে মাছের ক্ষুধা হ্রাস পায় ও খাদ্য চাহিদা কমে যায়। ফলে মাছের বৃদ্ধি কমে যায় ও উৎপাদন হ্রাস পায়। কোন জলাশয়ে পানির পিএইচ ৯.০-এর বেশি হলে এবং তা দীর্ঘদিন স্থায়ী হলে মাছের খাদ্য চাহিদা কমে যায় ও বৃদ্ধি শুন্যের কোঠায় দাঁড়ায়। পিএইচ মাত্রা ৭.০ থেকে ৮-৫ এর মধ্যে থাকলে মাছের খাদ্য চাহিদা বেশি থাকে ও উৎপাদন বেশি হয়।

পানির পিএইচ মানের দ্রুত উঠানামা মাছ ও চিংড়ি চাষের জন্য ভাল নয়। পানির পিএইচ মান কমে গেলে মাছ ও চিংড়ির নিম্নবর্ণিত অবস্থার সৃষ্টি হয়ে থাকে:

- মাছ ও চিংড়ির দেহ থেকে সোডিয়াম ও ক্লোরাইড বেরিয়ে যায়, ফলে এরা দুর্বল হয়ে মারা যায়;
- মাছ ও চিংড়ির রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ও খাবার রুচি কমে যায়;
- পুকুরে প্রাকৃতিক খাদ্যের উৎপাদন হ্রাস পায়;
- মাছ ও চিংড়ির প্রজনন ক্ষমতা লোপ পায়;

অন্যদিকে পানির পিএইচ বেড়ে গেলে মাছ ও চিংড়ির নিম্নবর্ণিত অবস্থার সৃষ্টি হয়ে থাকে;

- ফুলকা এবং চোখ নষ্ট হয়ে যায়;
- অসমোরেগুলেশন ক্ষমতা হ্রাস পায়;
- খাদ্য গ্রহণ বন্ধ হয়ে যায়।

পানির পিএইচ অনুমান

পানি মুখে দিয়ে টক বা লবণাক্ত স্বাদ লাগলে বুঝা যাবে পিএইচ ৭.০ এর কম;
অম্লণ্ড পানিতে লিটমাস কাগজ ভিজালে নীল হবে;
পানির পিএইচ ৭.০ এর বেশি হলে পানি মুখে দিলে কষযুক্ত মনে হবে;
ক্ষারীয় পানিতে লিটমাস কাগজ ভিজালে লাল হবে।

পুকুরে শতাংশ প্রতি ১ কেজি হারে চুন প্রয়োগ করে পিএইচ বাড়ানো যায়। মাছ চাষে পানির আদর্শ পিএইচ মাত্রা হচ্ছে ৭-৯। পিএইচ মান ৪ এর নিচে গেলে মাছ মারা যাবে। বর্ষাকালে সাধারণত: পানির পিএইচ যথাযথ মাত্রায় থাকে।

ক্ষারত্ব ও খরতা

পানিতে বিভিন্ন ক্ষার (বাই-কার্বনেট, কার্বনেট)-এর ঘনত্ব হলো ক্ষারত্ব। আর ক্যালসিয়াম এবং ম্যাগনেসিয়ামের মোট ঘনত্ব হচ্ছে খরতা। খরতা ক্যালসিয়াম কার্বনেটের পরিমাণ দিয়ে প্রকাশ করা হয়। মোট খরতা পরিমাণ মোট ক্ষারত্বের সাথে সম্পর্কিত। মাছ ও চিংড়ি চাষে উপযোগী ক্ষারত্ব মাত্রা ৭০-১৬০ মি.গ্রা./লিটার এবং খরতা ২০-১০০ মি.গ্রা./লিটার। পুকুরের পানির মোট ক্ষারত্ব নূন্যতম ৪০.০০ মি.গ্রা./লিটার থাকা বাঞ্ছনীয়। ক্ষারত্ব কম হলে পানিতে দ্রবীভূত পুষ্টির অভাব দেখা দেয় এবং বৃদ্ধি পেলে পুষ্টি উপাদান বৃদ্ধি পায় ও মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পায়।

ক্ষারত্ব ও খরতার প্রভাব

মাছ ও চিংড়ি চাষের জন্য হালকা খর পানি সবচেয়ে ভাল। ক্ষারত্ব ও খরতার কাঙ্ক্ষিত মানের চেয়ে খুব কম বা বেশি হলে:

- পানির বাফারিং ক্ষমতা কমে যায়, ফলে পিএইচ দ্রুত উঠানামা করে;
- পুকুরে সার দিলে তা আশানুরূপ কার্যকর হয় না;
- চিংড়ি খোলস বদলাতে পারে না;
- ক্ষারত্ব ৩০০ মিগ্রা/লিটারের বেশি হলে পুকুরের প্রাথমিক উৎপাদন হ্রাস পায়, কারণ এ অবস্থায় সালোকসংশেণ্ডষণের জন্যে প্রয়োজনীয় কার্বন ডাই-অক্সাইড থাকে না;
- মাছ সহজেই অম্লত্ব ও অন্যান্য ধাতুর বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হয়।

পুকুরে নিয়মিত চুন অথবা জিপসাম প্রয়োগ করে খরতা ও ক্ষারত্ব কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

ফসফরাস

প্রাকৃতিক পানিতে অতি অল্প পরিমাণ ফসফরাস থাকে। এই ফসফরাস ফসফেটে রূপান্তরিত হয়। পরিমিত ফসফেটের উপস্থিতিতে প্রচুর পরিমাণ উদ্ভিদ-প্লণ্ডাংকটন জন্মায়। জলজ উৎপাদনে ফসফরাস এককভাবে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। জৈব পদার্থের আধিক্যই ফসফরাসের সরবরাহ বাড়ায়। পুকুরের পানিতে ০.২ মি.গ্রা./লিটার ফসফরাস থাকা প্রয়োজন।

নাইট্রোজেন

নাইট্রোজেন জলজ উদ্ভিদের মৌলিক পুষ্টি উপাদান। আমিষ সংশ্লেণ্ঢষণের মৌলিক উপকরণ হিসেবে নাইট্রোজেন জলজ উৎপাদনের ক্ষেত্রে এক বিশেষ ভূমিকা পালন করে। প্রকৃতি প্রদত্ত নাইট্রোজেন জলাশয়ের নাইট্রোজেনের চাহিদা মেটাতে সক্ষম নয়। পানিতে ০.২ মি.গ্রা./লিটার নাইট্রোজেন মাত্রা মাছ চাষের জন্য খুবই উপযোগী।

- জিপসাম প্রয়োগ করে পানির মোট ক্ষারত্ব বাড়ানো যায়; এমপি সার প্রয়োগ করে পানিতে ফসফরাসের পরিমাণ কিছুটা বাড়ানো যায়ঃ ইউরিয়া সার প্রয়োগ করে পানিতে নাইট্রোজেনের অভাব দূর করা যায়

অ্যামোনিয়া

ইহা একটি নাইট্রোজেনজাত বিষাক্ত গ্যাস। এ গ্যাসের উপস্থিতিতে মাছ ও চিংড়ির স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। পানিতে অ্যামোনিয়ার বেশি মাত্রার উপস্থিতিতে সমস্ত মাছ ও চিংড়ি মারা যেতে পারে। অ্যামোনিয়া পানিতে দু'ভাবে থাকতে পারে- আয়নিত অ্যামোনিয়া (NH4+) ও অনায়নিত অ্যামোনিয়া (NH3)। অনায়নিত অ্যামোনিয়া আয়নিত অ্যামোনিয়ার চেয়ে বেশি ক্ষতিকর। অনায়নিত অ্যামোনিয়া মাছ ও চিংড়ির জন্যে বিষাক্ত। তাই পানিতে এর মাত্রা ০.০২৫ মি.গ্রা./লিটার এর বেশি হওয়া উচিত নয় এবং ০.১ মিগ্রা/লিটার অতিক্রম করা বিপদজনক।

মাছের বর্জ্য, উচ্ছিষ্ট খাদ্য, বিভিন্ন নাইট্রোজেনজাত পদার্থ, মৃত শ্যাওলা পচনের ফলে পানিতে অ্যামোনিয়া গ্যাসের সৃষ্টি হয়। এ ছাড়া দূষিত পদার্থের দ্বারা পুকুরের পানিতে অ্যামোনিয়া চলে আসতে পারে। তাপমাত্রা এবং পিএইচ মাত্রা বেশি থাকলে পানিতে অনায়নিত অ্যামোনিয়া বেড়ে যায়। সাধারণতঃ সন্ধ্যার দিকে যখন কার্বন-ডাই-অক্সাইড কম থাকে এবং পিএইচ মাত্রা বেশি থাকে, তখনই পানিতে অনায়নিত অ্যামোনিয়া বেড়ে যায়।

পুকুরে অ্যামোনিয়া বাড়লে মাছ ও চিংড়ির রক্ত এবং পেশীতে অ্যামোনিয়ার মাত্রা বেড়ে যায়। ফলে মাছ ও চিংড়ির দেহের পিএইচের মাত্রা কমে যায় ও বৃদ্ধি হ্রাস পায়। এ অবস্থায় মাছ ও চিংড়ি খাদ্য গ্রহণ বন্ধ করে দেয় এবং অস্বাভাবিকভাবে চলাচল করতে থাকে।

অতিরিক্ত মজুদ ঘনত্ব পরিহার করে এবং সার ও খাদ্য প্রয়োগ নিয়ন্ত্রণ করে অ্যামোনিয়া দূষণ প্রতিরোধ করা যায়।

হাইড্রোজেন সালফাইড

এ গ্যাসের ০.০১-০.০৫ মিলিগ্রাম/লিটার ঘনত্বে জলজ প্রাণীর মৃত্যু ঘটতে পারে। পানিতে এ গ্যাসের পরিমাণ ০.০০২ মিলিগ্রাম/লিটার এর বেশি থাকা কোনভাবেই নিরাপদ নয়। পানিতে হাইড্রোজেন সালফাইডের উপস্থিতি না থাকাই উত্তম।

লবণাক্ততা

সামান্য লবণাক্ততায় (৩পিপিটি) অধিকাংশ কার্পজাতীয় মাছ ও কৈ, মাগুর, শিং মাছ স্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পায়। স্বাদু পানিতে কৈ, মাগুর, শিং মাছ চাষের ক্ষেত্রে লবণাক্ততা কোন সমস্যা নয়।

৩. পানির জৈবিক গুণাগুণ

পুকুরের পানিতে স্বাভাবিকভাবে জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণী জন্মায়। কিছু কিছু জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণী অতি ক্ষুদ্র। ক্ষুদ্র জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণী মাছের প্রাকৃতিক খাদ্য। আবার কিছু কিছু জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণী পুকুরের পানি থেকে পুষ্টি গ্রহণ করে স্বাভাবিক উৎপাদনশীলতা কমিয়ে দেয়। ফলে মাছ চাষে বিঘ্ন ঘটে। নিম্নবর্ণিত জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণী পুকুরে জন্মে থাকে।

ভাসমান উদ্ভিদ

এ ধরনের জলজ উদ্ভিদের পাতা পানির উপরে ভাসতে থাকে কিন্তু মূল পানির মধ্যে ঝুলে থাকে। যেমন-কচুরিপানা, টোপা পানা, ক্ষুদে পানা ইত্যাদি। এগুলো পুকুরে সূর্যালোক প্রবেশে বাধার সৃষ্টি করে এবং পুকুরে ব্যবহৃত সার হতে পুষ্টি গ্রহণ করে পুকুরের উৎপাদন ক্ষমতা কমিয়ে দেয়। পুকুরে এ ধরনের উদ্ভিদ থাকলে সেগুলো উঠিয়ে ফেলতে হবে।

ডুবন্ত উদ্ভিদ

এ ধরনের জলজ উদ্ভিদ পানির তলদেশে থাকে। এরা পুকুরের গভীরে সূর্যের আলো প্রবেশে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। মাছের স্বাভাবিক চলাচলে বিঘ্ন ঘটায়। যেমন-পাতা ঝাঁঝি, কাঁটা ঝাঁঝি, নাজাস ইত্যাদি।

নির্গমনশীল উদ্ভিদ

কিছু জলজ উদ্ভিদের মূল পুকুরের কিনারায় থাকে এবং উদ্ভিদগুলো পানির উপরে বাড়তে থাকে, এগুলো নির্গমনশীল উদ্ভিদ। যেমন-আড়ালি, দল, কলমিলতা ইত্যাদি।

লতানো উদ্ভিদ

কিছু জলজ উদ্ভিদের মূল পুকুরের পানিতে ভাসমান থাকে এবং উদ্ভিদের শাখা প্রশাখাগুলো পানির উপরে ছড়িয়ে থাকে, এগুলো লতানো উদ্ভিদ। যথা - হেলেঞ্চা, মালঞ্চ, কেশরদাম ইত্যাদি।

প্ল- ্যংকটন

পানিতে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবকণা থাকে তাকেই প্লণ্যাংকটন বলা হয়। প্লণ্যাংকটন মাছের প্রাকৃতিক খাদ্য। প্লণ্যাংকটন বেশি থাকা পুকুরের অধিক উৎপাদনশীলতা নির্দেশ করে। প্লণ্যাংকটন দু'ধরনের ক) উদ্ভিদ-প্ল- ্যংকটন খ) প্রাণী-প্ল- ্যংকটন।

উদ্ভিদ-প্ল- ্যংকটন(Phytoplankton)

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলজ উদ্ভিদই উদ্ভিদ-প্লণ্যাংকটন। এগুলোর বর্ণ সবুজ। উদ্ভিদ-প্লণ্যাংকটন মাছের খাদ্য শিকলের প্রথম পর্যায়ের প্রাকৃতিক খাদ্য। যেমন-ডায়াটম, ভলভক্স, স্পাইরোগাইরা ইত্যাদি। এগুলোকে সবুজ শেওলাও বলা হয়। পুকুরে উদ্ভিদ-প্লণ্যাংকটন অত্যধিক জন্মালে পানির উপর ঘন সবুজ স্তর পড়ে। একে ব্লুম বলে। এরূপ অবস্থা মাছের জন্য ক্ষতিকর। ঘন সবুজ স্তর পুকুরের পানিতে সূর্যের আলো প্রবেশে বাঁধার সৃষ্টি করে। জলাশয়ে পরিমিত উদ্ভিদ-প্লণ্যাংকটনের উপস্থিতি সফলভাবে মাছ চাষের জন্য অত্যাবশ্যক।

প্রাণী-প্ল- ্যংকটন (Zooplankton)

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলজ প্রাণীকে প্রাণী-প্ল- ্যংকটন বলা হয়। প্রাণী-প্ল- ্যংকটন সাধারণতঃ বাদামী বর্ণের হয়ে থাকে। যেমন-ডেফনিয়া, রটিফেরা, ময়না ইত্যাদি। প্রাণী-প্লণ্যাংকটন মাছের খাদ্য শিকলের দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রাকৃতিক খাবার।

কীট-পতংগ

পুকুরের তলদেশে বিভিন্ন ধরনের কীট-পতঙ্গ বাস করে। এগুলো মাছের খাদ্য চক্রের অন্তর্ভুক্ত। যথা-বিভিন্ন লার্ভি, ওয়াটার বিটল।

পানির উলি- খিত গুণাবলীসমূহ যথাযথ মাত্রায় সংরক্ষণ করা গেলে মাছ চাষ ব্যবস্থাপনা সহজ হয়। ফলে অল্প ব্যয়ে কাঙ্ক্ষিত উৎপাদন পাওয়া যায়।

৪. আবহাওয়াগত উপাদানসমূহ

- বৃষ্টিপাতের পরিমাণ, তাপমাত্রা, বন্যা প্রবণতা এ তিনটি প্রধান উপাদান মাছ চাষে প্রভাব বিস্তার করে।

মাটির গুণাগুণ

মাটির উপাদান: মাটি হলো ভূপৃষ্ঠর উপরিতলের নরম খনিজ এবং জৈব উপাদানের মিশ্রণ, যা উদ্ভিদের বৃদ্ধির জন্য প্রাকৃতিক মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। মাটি প্রধানত ৪টি প্রধান উপাদান সমন্বয়ে গঠিত। এগুলো নিম্নে উল্লিখিত হলো-

১) খনিজ পদার্থ - ৪৫%　　　২) জৈব পদার্থ - ৫%

৩) বায়ু - ২৫% ৪) পানি - ২৫%

সুতরাং মাটি কঠিন, তরল এবং গ্যাসীয় - এই তিন ধরনের পদার্থের সমন্বয়ে গঠিত। নিম্নে মাটির বিভিন্ন উপাদানের ওপর সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো-

১. খনিজ পদার্থ: ভূ- ত্বক প্রথমে শিলা দ্বারা গঠিত ছিল। পরে তা শিলা ক্ষয় প্রক্রিয়ায় ভেঙ্গে ছোট খন্ডে বা এককে রূপান্তরিত হয়। মাটির এই অংশ বালি ও কর্দম কণা দ্বারা গঠিত। শিলা ক্ষয় প্রক্রিয়ার ফলে উপরোক্ত কণা ও অত্যাবশ্যকীয় খাদ্যোপাদান যেমন- নাইট্রোজেন ফসফরাস, পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম এবং অন্যান্য পুষ্টি উপাদান মাটিতে যুক্ত হয়। মাটিতে খনিজের পরিমাণ হলো ৪৫%।

২. জৈব পদার্থ : মাটিতে ১-২% জৈব পদার্থ থাকে তবে হিম অঞ্চলের মাটি ২-৫% জৈব পদার্থ ধারণ করে। এই সব জৈব পদার্থ উদ্ভিদ ও প্রাণীর অবশিষ্টাংশ এবং মলমূত্র হতে মাটিতে আসে। জৈব পদার্থ মাটির আবদ্ধকরণ পদার্থ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। মাটিতে জৈব পদার্থের পরিমাণ খুম কম হলেও এটি ব্যাপকভাবে মাটির গুণাবলী নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। জৈব পদার্থ নিম্নলিখিত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে-

১. সমস্ত পুষ্টি উপাদানের মজুদ হিসেবে কাজ করে;
২. মাটির ভৌত, রাসায়নিক ও জৈব গুণাবলী উন্নত করে;
৩. ভূমি ক্ষয় রোধ করে;
৪. জলাশয়ের পানি ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে;
৫. অণুজীবের প্রধান শক্তি হলো এই জৈব পদাথ এবং
৬. মাটিতে নাইট্রোজেনের প্রধান উৎস এ জৈব পদার্থ।

৩. বায়ু ও পানি

প্রবল বর্ষার সময় বা সেচ দিলে মাটির অধিকাংশ রন্ধ্রই পানি দ্বারা পূর্ণ হয় কিন্তু শুকনা বা খরার সময় ঐ রন্ধ্রগুলো বায়ু দ্বারা পূর্ণ থাকে। বায়ুমন্ডলের বায়ু অপেক্ষা মাটির বায়ূতে বেশি পরিমাণ কার্বন-ডাই অক্সাইড ও জলীয়বাষ্প থাকে কিন্তু অক্সিজেনের পরিমাণ কম থাকে। বায়ূর প্রধান কাজ হলো উদ্ভিদের মূলের শ্বসন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করা। মৃত্তিকা পানির গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো:

১. মাটির ভৌত রাসায়নিক ও জৈবিক কার্য নিয়ন্ত্রণ করা;
২. শলা ক্ষয় প্রক্রিয়ায় সাহায্য করা;
৩. সালোক সংশ্লেষণ পদ্ধতিতে অংশগ্রহন করা;
৪. দ্রাবক ও পুষ্টি উপাদানের বাহক হিসেবে কাজ করে।

মাটির রাসায়নিক বৈশিষ্ট

মাছচাষের জন্য বদ্ধ জলাশয়ের পানির উপযোগিতা মাটির পি এইচ, ফসফরাস, নাইট্রোজেন, জৈব পদার্থ ইত্যাদি উপাদানের মাত্রার ওপর নির্ভর করে। নিচে এসব উপাদান সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো:

১. পি এইচ

মাটির পিএইচ ৬.৫ -৯.০ এর মধ্যে হলে তা মাছচাষের জন্য উত্তম। অনুকূল পিএইচ মাত্রায় ফসফরাসের প্রাপ্যতা বৃদ্ধি পায়। পিএইচ ৬.০ এর নিচে হলে মাটি অধিক অম্লীয় হয় এবং পানিতে ক্ষতিকর পদার্থের উপস্থিতি দেখা যায়। আবার পিএইচ-এর মাত্রা ৯.০ এর বেশি হলে ফসফরাসের সরবরাহ হ্রাস পায়।

২. ফসফরাস

মাটিতে পরিমিত জৈব পদার্থের উপস্থিতিই সহজ প্রাপ্য ফসফরাসের সরবরাহ অব্যাহত রাখে। মাছের জন্য প্রতি ১০০ গ্রাম মাটিতে ১০-১৫ মিলিগ্রাম হারে সহজপ্রাপ্য ফসফেট থাকা প্রয়োজন।

৩. নাইট্রোজেন

রায়ুমন্ডলের নাইট্রোজেনই মাটির নাইট্রোজেনের প্রধান উৎস। ১০০ গ্রাম মাটিতে ৮-১০ মিলিগ্রাম হারে সহজপ্রাপ্য নাইট্রোজেন থাকা দরকার।

৪. জৈব পদার্থ

জৈব পদার্থ পুকুরের তলার মাটিকে সজীব ও সক্রিয় রাখে এবং পানি চোয়ানো বন্ধ করে মাটির পানি ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। এটা ফসফরাস এবং নাইট্রোজেনের প্রধান উৎস জলজ পরিবেশে জৈব পদার্থ বায়ুমন্ডল থেকে সরাসরি নাইট্রোজেন ধারণ করে। অতিরিক্ত মাত্রায় জৈব পদার্থ পানির পিএইচ

কমিয়ে দিয়ে পানি দূষিত করে। ভাসমান কণার কারণে পানি ঘোলা হলে জৈব পদার্থ প্রয়োগে তা দূর করা যায়। পুকুর বা জলাশয়ের মাটিতে সাধারণত ১.০-২.০ ভাগ জৈব কার্বন থাকলে পানির উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

মাটির প্রকারভেদ

বালি, পলি ও কাদা - এই তিনটি স্বতন্ত্র মাটি কণার তুলনামূলক অনুপাতের উপর ভিত্তি করে মাটির বুনটসমূহের নামকরণ করা হয়েছে। বিভিন্ন মাটি বিভিন্ন অনুপাতে বালু, পলি ও কাদা কণা ধারণ করে থাকে। কোন মাটিতে বালু কণার পমিাণ বেশি, আবার কোনটাতে কাদা কণার পরিমান বেশি। এই পরিবর্তনকে নির্দিষ্ট সীমারেখায় রেখে মাটিকে ১২টি গ্রুপ বা দলে বিভক্ত করা হয়, এই দলগুলোই বুনটভিত্তিক শ্রেণী বলে পরিচিত। এই শ্রেণীগুলোর একটি হতে অন্যটির ভৌত, রাসায়নিক ও জৈবিক ধর্মে যথেষ্ট পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। যে মাটিতে অধিক পরিমাণ কাদা কণা (%) ধারণ করে তাকে কাদা মাটি, যে মাটিতে অধিক পরিমাণ পলি কণা (%) ধারণ করে তাকে পলি মাটি, আর যে মাটিতে বালু কণার পরিমান বেশি (%) থাকে তাকে বেলে মাটি বলে। যদি কোন মাটি এই তিন তিনটি শ্রেণীর একটিরও প্রভাব বিস্তারকারী ভৌতিক বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন না করে (যেমন -৪০ বালু কণা, ২০% কাদা কণা ও ৪০% পলি কণা যুক্ত মাটি) তবে তাকে দো–আঁশ মাটি বলে। দো-আঁশ বালু, পলি ও কাদা কণার শতকরা সমান থাকে না। কিন্তু এটা বালু, পলি ও কাদা কণাসমূহের কাছাকাছি প্রায় সামঞ্জস্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্য বা ধর্ম প্রদর্শন করে।

পুকুরের তলানী থেকে পুষ্টিকারক পদার্থসমূহের অবমুক্তি কিংবা ধারণ ক্ষমতা নির্ভর করে পানির বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক ধর্ম এবং তলদেশের কাদা ও পুকুরে অবস্থিত বিভিন্ন ধরনের ব্যাক্টেরিয়ার কর্মকান্ড এর ওপর। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভৌত রাসায়নিক প্রভাবকসমূহ যা তলদেশীয় মাটি ও পানির সঙ্গে আন্তঃক্রিয়া করে থাকে মূলত নির্ভর করে তলদেশীয় মাটির ধরন, তাপমাত্রা, গভীরতা পানির ঘনত্ব, দ্রবীভূত অক্সিজেন পিএইচ এবং মোট ক্ষারত্বের ওপর। তা ছাড়া আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবক আছে, সেগুলো হলো- আবহাওয়া, ঋতু, ওয়াটার শেড, পানি চোয়ানো ইত্যাদি।

আদর্শ পুকুরের বৈশিষ্ট্য

- ❖ পুকুর আয়তকার এবং আয়তন ৩০-১০০ শতাংশ বা আরো বড় হতে পারে;
- ❖ পানির গভীরতা ১.৫-২.০ মিটার এবং পুকুরের ঢাল ১ঃ২ অনুপাতে হলে ভাল হয়;
- ❖ দোঁ-আশ মাটির পুকুর হলে ভলো হয় (এটেল মাটির পুকুরের পানি ঘোলা থাকে, ফলে সূর্যের আলো পানির ভিতরে কম প্রবেশ করতে পারে। প্রাকৃতিক খাদ্য কম হয়। বেলে মাটির পুকুরে পানি ও পুষ্টির অভাব বেশি হয়);
- ❖ তলায় কাদার পরিমাণ ১০.০০-১৫.০০ সেঃ মিঃ এর বেশি না হয়;
- ❖ পুকুরে দৈনিক সূর্যালোকের মেয়াদ কাল ৬-৮ ঘন্টা থাকতে হবে;
- ❖ পাড়ে ছায়া সৃষ্টিকারী কোন গাছ বা ঝোঁপ-ঝাড় থাকবে না;
- ❖ বন্যা মুক্ত হতে হবে বা পুকুরের পাড় বাইরের পানি রোধ করার মত যথেষ্ঠ উচু ও শক্ত হতে হবে;
- ❖ পুকুরের পানি ধারণ ক্ষমতা থাকতে হবে;
- ❖ জরুরী পানি নির্গমণের ব্যবস্থা থাকতে হবে;
- ❖ পুকুরে পানি সরবরাহের ব্যবস্থা থাকতে হবে;
- ❖ পুকুরের তলদেশের পানি সম্পূর্ণ নিষ্কাশনের জন্য পুকুরের তলদেশ একদিকে ঢালু হতে হবে।

মাছ চাষের জন্য উপরোক্ত সকল বৈশিষ্ট্য একটি পুকুরে থাকবে তা নয় তবে মাছ চাষের জন্য পুকুর নির্বাচনের ক্ষেত্রে উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যের বিষয়গুলো বিবেচনায় রাখতে হবে, পাশাপাশি নিম্নে উলেণ্ডখিত সুযোগ সুবিধা পুকুরে থাকলে মাছ চাষে অধিক সফলতা পাওয়া যাবে।

- ❖ পুকুরটি একক মালিকানা হলে ভাল হয়। (লিজের পুকুর হলে ন্যূনতম ৫ বছরের জন্য লিজ নিতে হবে);
- ❖ পুকুরের সাথে ভাল যোগাযোগ ব্যবস্থা থাকতে হবে;
- ❖ ব্যবস্থাপনার সুবিধার জন্য পুকুরের অবস্থান বাড়ির কাছাকাছি হলে ভাল হয়;
- ❖ পোনার প্রাচুর্যতা থাকতে হবে।

মাছ চাষের জন্য পুকুর নির্বাচন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সঠিকভাবে পুকুর নির্বাচন করা না হলে মাছ চাষে সমস্যা হয়, মাছের ভাল ফলন পাওয়া যায় না, মাছ চুরি হতে পারে, উৎপাদিত মাছ ও পোনা পরিবহনে অসুবিধা হতে পারে এবং পুকুর পরিচর্যায় সমস্যা দেখা দিতে পারে সর্বোপরি মাছ চাষে সফলতা পাওয়া যাবে না।

রুই জাতীয় মাছের চাষ

বাংলাদেশে অভ্যন্তরীণ জলাশয়ে চাষকৃত মাছের মধ্যে সিংহভাগই জুড়ে আঝে রুইজাতীয় মাছ। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে পুকুরে চাষকৃত মাছের শতকরা ৪৯.০৬ ভাগই ছিল রুই জাতীয় মাছ। বাংলাদেশে সব এলাকায় এজাতীয় মাছের চাষ হয়ে থাকে এবং সকলের কাছেই এমাছ বিশেষভাবে সমাদৃত। জনপ্রিয়তা এবং চাষ প্রযুক্তির তুলনামূলক সহজলভ্যতার কারণে রুই-জাতীয় মাছের চাষ বাংলাদেশে সর্বাধিক। এই মাছের বাজার-চাহিদা সবসময়ই বেশী। ফলে অনেক চাষি এই মাছ চাষে আগ্রহী। মূলত চাষিদের ক্রমাগত প্রচেষ্টার ফলে এই মাছের নিবিড় চাষের প্রযুক্তির বিপ্লব ঘটেছে। 'চাপের পোনা' যা সাধারণ পোনার চেয়ে অধিক ঘনত্বে রেখে এক শীতকাল পার করে দিয়ে মজুদ করা হয় তা দ্রুত বৃদ্ধি পায়। দেশের বেশ কিছু অঞ্চলে এই ধরনের পোনা ব্যবহারের মাধ্যমে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে চাষ করে চাষিরা অল্প সময়ে অধিক মুনাফা অর্জনে সক্ষম হচ্ছেন। চাষ নিবিড়তার পাশাপাশি 'উত্তম মৎস্যচাষ অনুশীলনের' (Good Aquaculture Practices-GAP) মাধ্যমে নিরাপদ মাছ উৎপাদন করে অধিকতর উচ্চমূল্যে বাজারে বিক্রয় করা সম্ভব।

চাষযোগ্য প্রধান প্রধান রুইজাতীয় মাছের পরিচিতি

রুই *(Labeo rohita)*

বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য

রুই মছের মাথা দেহের তুলনায় ছোট, দেহ লম্বাটে। লেজের দিক ক্রমশ সরু। সমস্ত শরীর উজ্জ্বল আঁশ দিয়ে ঢাকা, আঁশগুলো গোলাকার, মসৃণ এবং সারিবদ্ধভাবে সাজানো থাকে। এদের ঠোঁট কুঁচকানো, খাঁজ কাটা, উপরের ঠোঁটে এক জোড়া শুং থাকে।

আদি বাসস্থান

ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, নেপাল ও মিয়ানমার। খাল, বিল, নদী-নালা, হাওর-বাঁওড় ও পুকুরের পানির মধ্যস্তরে বাস করে। তবে বর্তমানে ফিলিপাইন, শ্রীলঙ্কা, জাপান, মালয়েশিয়া, রাশিয়া, এবং আফ্রিকার, কয়েকটি দেশেও চাষ হচ্ছে।

খাদ্যাভ্যাস

রুই মাছ সাধারণভাবে পানির মধ্যস্তরে বিচরণ করে এবং স্তরে বিদ্যমানে খাদ্যগ্রহণ করে থাকে। তবে পানির উপর এবং নিচের স্তরেও এমাছের অবাধ বিচরণ পরিলক্ষিত হয়। প্রাণি-প্লাঙ্কটন, পচা জৈব পদার্থ ও ছোট কীট প্রাকৃতিক খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে। আর সম্পূরক খাদ্য হিসেবে ফিশ মিল, খৈলের গুঁড়া, চালের কুড়া, গমের ভুষি গ্রহণ করে।

প্রজনন

অনুকূল পরিবেশে ২ বছর বয়সে রুই প্রজননক্ষম হয় এবং মে- জুলাই মাসে প্রাকৃতিক পরিবেশে প্রজনন ঘটায়। অপেক্ষাকৃত কম গভীর এবং স্রোতশীল পানিতে এরা ডিম ছাড়ে। বদ্ধ জলাশয়ে রুই মাছের প্রজনন ঘটে না। তবে হ্যাচারিতে প্রণোদিত প্রজননের মাধ্যমে রেণু উৎপাদন হয়। একটি প্রজনন উপযোগী স্ত্রী রুই থেকে ৩ লক্ষাধিক ডিম পাওয়া যেতে পারে।

কাতলা *(Catla catla)*

বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য

কাতলা মাছের মাথা বেশ বড়, দেহের মাঝের অংশ চওড়া। মুখের হা বেশ বড়, নিচের ঠোঁট মোটা এবং সামনের দিকে প্রশস্ত। দেহের রং রূপার মত চকচকে সাদা তবে পিঠের রং কিছুটা কালচে।

আদি বাসস্থান

ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, নেপাল, শ্রীলঙ্কা ও মিয়ানমার। বর্তমানে রাশিয়া, থাইল্যান্ড, চীন, জাপান, ফিলিপাইন, মালয়েশিয়াসহ অনেক দেশে কাতলার চাষ হচ্ছে। কাতলা বিশেষভাবে স্রোতস্বিনী নদ-নদীর মাছ। তবে খাল-বিল, হাওড়-বাওড়, পুকুর-দিঘিসহ মিঠা পানির যে কোন জলাশয়ে বাস করতে পারে। এমন কি অল্প লবণাক্ত পানিতেও কাতলা খাপ খাইয়ে নিতে পারে।

খাদ্যাভ্যাস

কাতলা সাধারণভাবে পানির উপর স্তরে বিচরণ করে। এরা ছোট অবস্থায় প্রধানত প্রাণি-প্লণ্টাংকটনভোজী। তবে কৈশোরের পর থেকে পুকুরের পরিবেশ থেকে শেওলা, ছোট কীট, উদ্ভিদের খন্ডাংশ, পচা জৈব পদার্থ ইত্যাদি প্রধান খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে থাকে। সম্পূরক খাদ্য হিসেবে গমের ভুষি, চালের কুড়া, ফিশমিল, খৈল গ্রহণ করে।

প্রজনন

প্রাকৃতিক পরিবেশ ৩ বছর বয়সেই কাতলা পরিপক্ক হয়। তবে বাংলাদেশের পরিবেশে পুকুরে চাষকৃত মাছ ৪ বছরের আগে পরিপক্ক প্রজননক্ষম হয় না বলে বিশেষজ্ঞদের ধারণা। এ মাছ জলাশয়ে ডিম পাড়ে না। মে-জুলাই মাসে স্রোতযুক্ত নদীতে ডিম পাড়ে। সেখানে থেকে রেণু পোনা সংগ্রহ করে চাষ করা যায়। বর্তমানে কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমেই বেশির ভাগ রেণু উৎপাদন করা হয়ে থাকে। প্রজনন উপযোগী বয়সে কাতলা মাছ হতে ৪-৫ লক্ষ ডিম পাওয়া যেতে পারে।

মৃগেল ***(Cirrhinus mrigala)***

বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য

দেহ লম্বাটে ও কিছুটা গোলাকার। মাথা খুবই ছোট কিন্তু মুখের গহ্বর অপেক্ষাকৃত বড়। গায়ের রং পিঠের দিকে তামাটে, দু'পাশ ও পেট রুপালী। মৃগেল মাছের ঠোঁট পাতলা ও উপরের ঠোঁট কিছুটা লম্বাটে এবং নিচের দিকে বাঁকানো।

আদি বাসস্থান

বাংলাদেশ ও ভারতের প্রায় সকল অঞ্চলেই বিস্তৃত। এ ছাড়াও মায়ানমার ও পাকিস্তানে এ মাছের বিস্তৃতি রয়েছে। রুই, কাতলার মত মৃগেল মাছ মিঠা পানির যে কোন জলাশয়ে বাস করতে পারে। বর্ষাকালে ধান ক্ষেতে এ মাছ খুব বেশি দেখা যায়। এরা পানির নিচের স্তরে বিচরণ করে।

খাদ্যাভ্যাস

মৃগেল মাছ জলাশয়ের তলদেশে স্তর থেকে খাদ্যগ্রহণ করে। প্রাণি-প্লাংকটন, তলার ছোট/বড় কীট-পতঙ্গ, পচা জৈব পদার্থ, কাদা, বালি ইত্যাদি মৃগেলের খাদ্য। সম্পূরক খাদ্য হিসাবে চালের কুঁড়া, ফিসমিল, গমের ভুষি, সরিষার খৈল খায়।

প্রজনন

মৃগেল মাছ ১ বছর বয়সেই পরিপক্ক হয়। কারও কারও মতে এ মাছ ৬ মাসেই পরিপক্ক হয়ে থাকে। একই বয়সের পুরুষ মাছ স্ত্রী মাছের তুলনায় অপেক্ষাকৃত আগে পরিপক্কতা অর্জন করে। পরিণত বয়সে ১ কেজি ওজনের একটি মৃগেল মাছ হতে ১ লাখ ডিম পাওয়া যেতে পারে। এ মাছও বদ্ধ জলাশয়ে ডিম পাড়ে না। মে- জুলাই মাসে স্রোতযুক্ত নদীতে ডিম দেয়। এপ্রিল মাস থেকেই কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে রেণু উৎপাদন করতে দেখা যায়।

কালবাউশ ***(Labeo calbasu)***

বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য

দেহের তুলনায় মাথা ছোট। সমস্ত দেহ কালো বা ধূসর কালো আঁশ দিয়ে ঢাকা, চোখ লাল রংয়ের, মুখের দুই পাশে একজোড়া করে গোঁফ থাকে। রুই ও কাতলা মাছের তুলনায় কম বর্ধনশীল।

আদিবাসস্থান

বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, নেপাল, শ্রীলঙ্কা ও মায়ানমারে এই মাছ পাওয়া যায়। নদী, খাল, বিল, হাওর-বাঁওড় ও পুকুর ইত্যাদি জলাশয়ে নিচের স্তরে বাস করে।

খাদ্যাভ্যাস

কালবাউশ নিচের স্তরে বাস করে এবং নিচের স্তরেই খাদ্য সংগ্রহ করে। পরিণত বয়সে পচা ও অর্ধপচা জলজ উদ্ভিদ এবং কীটপতঙ্গ খায়। পোনা অবস্থায় এককোষী শেওলা, পচা ও অর্ধপচা জলজ উদ্ভিদ গ্রহণ করে।

প্রজনন

২য় বৎসরে কাল বাউশ মাছ প্রজননশীল হয়। এরা বদ্ধ পানিতে ডিম দেয় না। বর্ষাকালে স্রোতশীল পানিতে ডিম দেয়। হ্যাচারিতে ইনজেকশন প্রয়োগ করে কৃত্রিমভাবে প্রজনন করানো হয়। বাংলাদেশে সকল অঞ্চলেই হ্যাচারিতে এই মাছের পোনা পাওয়া যায়।

গ্রাস কার্প ***(Ctenopharyngodon idelle)***

বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য

দেহ লম্বাটে, মাথা চওড়া, মুখ ছোট, ঠোঁট সামান্য লম্বা। শরীরের রং পেটের দিকে রুপালী সাদা কিন্তু পিঠের দিক কালচে ধূসর বা সবুজাভ, গলার ভিতরে চিরনির দাঁতের মতো দু'সারি দাঁত রয়েছে। সারা শরীর মাঝারি আকারের আঁশ দ্বারা আবৃত।

আদি বাসস্থান

চীন, হংকং ও রাশিয়ার আমুর নদী। এ মাছটি ১৯৬৬ সালে হংকং থেকে প্রথম আমাদের দেশে আনা হয়। পরবর্তীকালে ১৯৭০ সালে জাপান থেকে এবং ১৯৭৯ সালে নেপাল থেকে আমদানি করা হয়। ১৯৮০ সালে গ্রাসকার্পের প্রজনন করানো সম্ভব হয়। পুকুর, খাল-বিলের সকল স্তরে বিচরণ করে। তবে এরা জলাশয়ের পাড় ঘেঁষে চলাচল করতে পছন্দ করে।

খাদ্যাভ্যাস

গ্রাসকার্প প্রধানত তৃণভোজী স্বভাবের। পোনা অবস্থায় এরা প্রাণি-প্ল- াংকটন ও মশার লার্ভা খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে। বয়স বাড়ার সাথে সাথে খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তিত হয় এবং পুকুরের পরিবেশ থেকে ঝাঁঝি, হাইড্রিলা, স্পাইরোডেলা, ক্ষুদি পানা, কুটি পানা, নরম ঘাস ইত্যাদি খেতে শুরু করে। বাইরে থেকে সরবরাহকৃত কলার পাতা, আলুর পাতা, সজনে পাতা, শীতকালীন শাকশব্জি খেতেও এরা বেশ পছন্দ করে। গ্রাসকার্প দৈনিক দেহের ওজনের প্রায় ৪০-৫০% উদ্ভিদ জাতীয় খাবার গ্রহণ করতে পারে।

প্রজনন

পুরুষ ও স্ত্রী মাছ যথাক্রমে ২ ও ৩ বছরে পরিপক্বতা অর্জন করে। পুকুরে বা বদ্ধ জলাশয়ে এদের পরিপক্বতা আসে কিন্তু প্রজনন করে না। কৃত্রিম উপায়ে মে-আগস্ট মাস পর্যন্ত এদের প্রজনন করানো হয়। একটি পরিপক্ব গ্রাসকার্প মাছ হতে প্রায় ২ লাখ পর্যন্ত ডিম পাওয়া যেতে পারে।

সিলভার কার্প *(Hypophthal mieththys molitrix)*

বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য

সিলভার কার্প দেখতে অনেকটা ইলিশ মাছের মত দেহের মাঝের অংশ চওড়া, মাথা লেজের অংশ সরু। মুখ কাতলা মাছের মতো উপরের দিকে তোলা। দেহ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রুপালী আঁশে ঢাকা। মাথা ও পিঠের দিক গাঢ় ধূসর। এদের নালীর দৈর্ঘ্য গ্রাসকার্প অপেক্ষা বেশি এবং ফুলকায় অনেকগুলো ফুলকা রেকার বর্তমান বলে পানি থেকে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্ভিদ-প্লণ্টাংকটন গ্রহণ করতে পারে।

আদি বাসস্থান

দক্ষিণ ও মধ্য চীনের নদীসমূহে এবং আমুর নদীর অববাহিকা মাছটির আদি বাসস্থান। সেখান থেকেই এ মাছচাষ ও গবেষণার উদ্দেশ্যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। ১৯৬৯ সালে হংকং থেকে আমাদের দেশে আনা হয় এবং ১৯৭৬ সালে সফলভাবে কৃত্রিম প্রজনন ঘটানো সম্ভব হয়। এরা নদী, খাল-বিল, হাওর-বাঁওড় এর পানির উপরের স্তরে বিচরণ করে।

খাদ্যাভ্যাস

অপেক্ষাকৃত ছোট পোনা সাধারণত প্রাণি-প্লণ্টাংকটন খেতে অভ্যস্ত। পোনার আকার কিছুটা বড় হলে এরা উদ্ভিদ-প্লণ্টাংকটন খেয়ে খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন করে এবং বাকি জীবন প্রধানত উদ্ভিদ-প্লণ্টাংকটন খেতে খুবই পছন্দ করে।

প্রজনন

সিলভার কার্প ২ বছরের মধ্যেই প্রজননক্ষম হয়। এ বয়সের একটি মাছ হতে সর্বাধিক ৮ লক্ষ পর্যন্ত ডিম পাওয়া যেতে পারে। এরা বদ্ধ পানিতে ডিম দেয় না, কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে পোনা উৎপাদন করা হয়। মার্চের শেষ দিকে এদের প্রজনন মৌসুম শুরু হয়।

কার্পিও *(Cyprinus carpio)*

বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য

কার্পিও এর মাথা শরীরের তুলনায় ছোট, পেট মোটা এবং পিঠ ধনুকের মতো বাঁকানো। এর গায়ের রং হালকা সোনালি-বাদামি। সারা দেহ আঁশ দিয়ে ঢাকা থাকে।

আদিবাসস্থান

এশিয়া মহাদেশের নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চল বিশেষ করে চীন এদের আদিবাস বলে মনে করা হয়। ১৯৬০ সালে থাইল্যান্ড থেকে এ মাছটি আমাদের দেশে আনা হয়।

আবাসস্থল

হাওর-বাঁওড় ও পুকুরের পানির নিচের স্তরে বাস করে। পুকুরের তলদেশ থেকে এ মাছ খাদ্য গ্রহণ করে। খাদ্যের জন্য এরা পুকুরের তলদেশ, পাড় ও চারপাশের মাটি খামচে আলগা করে। রেণু অবস্থায় এরা প্রাণি-প্লাংকটন ভক্ষণ করে। পরিণত বয়সে প্লাংকটন, ছোট/বড় কীট, ছোট, শামুক, কেঁচো, পচা জৈব পদার্থ ইত্যাদি খেতে পছন্দ করে।

প্রজনন

৫-৬ মাসেই এ মাছ প্রজননক্ষম হয়। এরা বদ্ধ জলাশয়ের অনুকূল পরিবেশে প্রাকৃতিক প্রজননে অভ্যস্ত এবং বছরে দু'বার (জানুয়ারি-মার্চ ও জুলাই-আগষ্ট) প্রজনন করে। কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমেও এ মাছের পোনা উৎপাদন করা যায়।

থাই সরপুঁটি *(Puntius gonionotus)*

বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য

উজ্জ্বল রুপালি রঙের দেহ, লেজটি খাঁজকাটা, পায়ু ও শ্রোণী পাখনার প্রান্ত রক্তিম গোলাপী। মাছের নাসাগ্র গোলাকার এবং মুখে দু'জোড়া গোঁফ থাকে। মাছটি চ্যাপ্টা।

আদি বাসস্থান

থাইল্যান্ড। ১৯৮৭ সালে এ মাছটি থাইল্যান্ড থেকে আমাদের দেশে আমদানী করা হয়। নদী, খাল-বিল, হাওড়-বাঁওড় ও পুকুরের পানির সকল স্তরে এরা বিচরণ করে।

খাদ্যাভ্যাস

রেণু অবস্থায় এরা এককোষী শেওলা ও ছোট প্রাণি-প্লাংকটন খায়। পরিণত অবস্থায় এরা উদ্ভিদভোজী। উদ্ভিদ হিসেবে ক্ষুদি পানা, হাইড্রিলা, নরম ঘাস, পেঁপে পাতা, আলু পাতা, বাধাঁকপি ইত্যাদি এদের খুবই প্রিয় খাদ্য। সম্পূরক খাদ্য হিসাবে চালের কুড়া ও সরিষার খৈল পছন্দ করে।

প্রজনন

থাই সরপুঁটি ১ বছরেই প্রজননক্ষম হয় এবং এপ্রিল-মে মাসে এরা প্রজনন করে। এরা বদ্ধ পানিতে ডিম পাড়ে না, কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে হ্যাচারিতে পোনা উৎপাদন করা হয়। তবে বিশেষ অবস্থায় যেমন হ্যাচারি সংলগ্ন পুকুরে যদি পানির প্রবাহ থাকে কিংবা বৃষ্টির পানি যদি পুকুরে গড়িয়ে ঢোকার সুযোগ থাকে তাহলে পুকুরেও প্রজনন করতে সক্ষম।

চাষ পদ্ধতি

পুকুর নির্বাচন: বাণিজ্যিক মাছচাষের জন্য অপেক্ষাকৃত বড় আকারের পুকুর, ৪০ শতাংশ বা তদূর্ধ হওয়া বাঞ্চনীয়। পানির গভীরতা ৪ থেকে ৬ ফুটের মধ্যে হলে ভাল হয়। মাটি দোআঁশ বা এঁটেল দোআঁশ এবং পুকুরটি আয়তাকার হওয়া উত্তম।

পুকুর প্রস্তুতি

পাড় ও তলদেশ: পাড়ে ঝোপ-ঝাড় থাকলে পরিস্কার করতে হবে। পানিতে যথেষ্ট পরিমাণে (কমপক্ষে দৈনিক ৮ ঘন্টা) সূর্যালোক প্রবেশের সুবিধার্থে সম্ভব হলে বড় গাছ কেটে ফেলতে হবে। সম্ভব না হলে অন্তত ভেতর দিকের ডাল-পালা কেটে ফেলতে হবে। প্রয়োজনে পানি নিস্কাশন করে পুকুরের পাড় মেরামত ও তলদেশ অতিরিক্ত কর্দমুক্ত করে সমান করতে হবে। অন্যথায় পুকুরের পানির গুণাগুণ দ্রুত খারাপ হয়ে যাবে। তাছাড়া, তলদেশ সমান না হলে পরবর্তীতে মাছ আহরণ করা কঠিন হবে।

* **জলজ আগাছা ও অবাঞ্চিত মাছসহ রাক্ষুসে মাছ দুরীকরণ:** যদি পানি প্রাপ্তি বিশেষ সমস্যা না হয় তাহলে পুকুরের পানি নিস্কাশন করে সব জলজ আগাছা এবং অবাঞ্চিত মাছসহ রাক্ষুসে মাছ অপসারণ করা যেতে পারে। পানি প্রাপ্তি সমস্যা হলে, প্রথমে পুকুরে বারবার জাল টেনে যতদূর সম্ভব সকল মাছ ধরে ফেলতে হবে। এরপর অবশিষ্ট সব মাছ ধরে ফেলার জন্য প্রতিশতক আয়তন ও প্রতিফুট পানির গড় গভীরতার জন্য ২৫-৩০ গ্রাম হারে রোটেনন প্রয়োগ করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, ৪ ফুট পানির গড় গভীরতার এক একর পুকুরে ১০-১২ কেজি রোটেনন লাগবে।
* **চুন প্রয়োগ:** রোটেনন প্রয়োগ করা হয়ে থাকলে প্রয়োগের ২/১ দিন পর প্রতি শতকে ১ কেজি হারে চুন প্রয়োগ করতে হবে। এই হারে এক একর জলায়তন বিশিষ্ট পুকুরের জন্য চুন লাগবে ১০০ কেজি।
* **সার প্রয়োগ:** সাধারণভাবে একটি পুকুরে প্রস্তুতকালীন সারের সুপারিশকৃত মাত্রা নিম্নরূপ:

সার	প্রয়োগমাত্রা/শতক
ইউরিয়া	১০০-১৫০ গ্রাম
টিএসপি	৫০-৭৫

টিএসপি সারের পরিবর্তে ডিএপি সার ব্যবহার করলে ইউরিয়ার প্রয়োগমাত্রা অর্ধেক হবে।

পোনা মজুদ

রুই জাতীয় মাছের মিশ্র চাষের জন্য প্রথমে মাছের প্রজাতি নির্বাচন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মাছের প্রজাতি নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়সমূহ পূর্বে আলোচিত হয়েছে। রুই জাতীয় মাছের মিশ্র চাষের ক্ষেত্রে এ বিষয়ে খেয়াল রাখতে হবে যে, পুকুরের উপরের স্তরের উপযুক্ত শুধু মাত্র সিলভার কার্প মাছ ছাড়া যেতে পারে আবার সিলভারের সাথে বিগহেড বা কাতলা মাছের পোনা ছাড়া যেতে পারে। কিন্তু বিগহেড এবং কাতলা একত্রে ছাড়া যাবে না কারণ তারা পরস্পর একই খাবার খায়। সিলভারের সাথে কাতলা মাছের পোনা ছাড়লে সিলভার কার্পের পোনা ছাড়ার কয়েক দিন আগে কাতলা মাছের পোনা ছাড়তে হবে এবং কাতলার পোনা অবশ্যই আকারে তুলনামূলক বড় হতে হবে। মিশ্রচাষে থাই সরপুটি মাছের পোনা বেশি ছাড়লে রুই মাছের বর্ধন কম হবে। তবে সরপুটি মাছের বর্ধন হার বেশি হওয়ায় চাষের তিন মাসের মধ্যে বাজারজাতকরণের উপযুক্ত হয়ে যায়, সে ক্ষেত্রে সরপুটি আগেই বিক্রয় করে দেয়া গেলে রুই মাছের বর্ধন স্বভাবিক রাখা যেতে পারে। মিশ্র চাষে ৮ ধরনের কার্পের পোনা এক সাথে চাষ করা যায়। সব প্রজাতির পোনা একই এলাকায় একই সময়ে নাও পাওয়া যেতে পারে। এলাকাভিত্তিক প্রাপ্যতার ওপর ভিত্তি করেই কার্পের পোনার জাত নির্বাচন করা উচিত। পুকুরে বড় আকারের (কার্পঃ ১০-১৫ সেমি) এবং চাপের পোনা (Over Wintering) ছাড়া হলে কম সময়ে বেশি উৎপাদন পাওয়া যায়। বর্তমানে বাণিজ্যিক চাষে অনেক বড় আকারের পোনা এমনকি ১ কেজি বা তার চেয়ে বড় আকারের মাছও মজুদ করতে দেখা যায়। প্রয়োজনীয় আকারের পোনা এক উৎস থেকে না পাওয়া গেলেও মাছের অধিক ফলন নিশ্চিত করার জন্য বিভিন্ন উৎস থেকে হলেও অধিক সময় এবং শ্রম ব্যয় করে উপযুক্ত আকারের পোনা সংগ্রহের চেষ্টা করতে হবে।

সময় ও সতর্কতা: পুকুর প্রস্তুতির ৪/৫ দিন পর যখন পানি হালকা সবুজ রঙ ধারণ করবে তখন পোনা মজুদ করা যাবে। ‘চাপের পোনা’ ফেব্রুয়ারী-মার্চ মাসেই মজুদ করা হয়। প্রয়োজনীয় সংখ্যক পোনা পুকুরে ছাড়ার সময় পুকুরের পানির সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য পাত্রের পানি পুকুরের পানির সাথে কিছুটা সময় নিয়ে অল্প অল্প করে পরিবর্তন করতে হবে, যেন পাত্রের পানির তাপমাত্রা ও পি এইচ (pH) ক্রমশ পুকুরের পানির মত হয়ে যায়। এর পর পাত্রের পানিসহ মাছ ধীরে ধীরে পুকুরে ছেড়ে দিতে হবে।

মজুদ ঘনত্ব

দেশে এখন অঞ্চল ভেদে ভিন্ন ভিন্ন মজুদ হার ব্যবহৃত হচ্ছে, এতে সংখ্যার প্যাশাপাশি পোনার ওজনও কম-বেশি হয়। পদ্ধতি ও প্রজাতিভেদে পোনার আকার ২৫০ গ্রাম থেকে ১.৫ কেজি পর্যন্ত হতে পারে। প্যাডল হুইলে বা এ্যারেটরের সাহায্যে পানিতে অক্সিজেন মিশ্রণ ও পানি প্রবাহ তৈরির সুযোগ থাকলে মজুদ হার বাড়ানো এবং বেশি ফলন পাওয়া সম্ভব। সফল মজুদহারসমূহের ভিত্তিতে গঠিত চারটি মজুদ মডেল নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

মডেল-১: পোনার ওজন ২৫০-৪০০ গ্রাম				মডেল-২: পোনার ওজন ৪০০-৭৫০ গ্রাম		
প্রজাতি	সংখ্যা/বিঘা (৩৩ শতাংশ)	সংখ্যা/একর		প্রজাতি	সংখ্যা/বিঘা (৩৩ শতাংশ)	সংখ্যা/একর
কাতলা	১৫-২০	৪৫-৬০		কাতলা	৫০	১৫০
সিলভার কার্প	১৬০-২২০	৪৮০-৬৬০		সিলভার কার্প	১০০	৩০০
রুই	১৬০-২২৫	৪৮০-৬৮০		রুই	১৫০	৪৫০

মৃগেল/কালবাউস	৯০-১০০	২৭০-৩০০
গ্লাস কার্প	১৫-২০	৪৫-৬০
মিরর কার্প	৮০-৯০	২৪০-২৭০
গ্লাস কার্প	৫-১০	১৫-৩০
মোট	**৫২৫-৬৮৫**	**১৫৭৫-২০৬০**

মৃগেল/কালবাউস	১০০	৩০০
মোট	**৪০০**	**১২০০**

মডেল-৩: পোনার ওজন ৭৫০ গ্রাম- ১ কেজি		
প্রজাতি	**সংখ্যা/বিঘা (৩৩ শতাংশ)**	**সংখ্যা/একর**
কাতলা	২৫	৭৫
সিলভার কার্প	৭০	২১০
রুই	১২০	৩৬০
মৃগেল/কালবাউস	৬০	১৮০
গ্রাস কার্প	১০	৩০
মোট	**২৮৫**	**৮৫৫**

মডেল-৪: পোনার ওজন ১ কেজি- ১.৫ কেজি		
প্রজাতি	**সংখ্যা/বিঘা (৩৩ শতাংশ)**	**সংখ্যা/একর**
কাতলা	২০	৬০
রুই	৯০	২৭০
মৃগেল/কালবাউস	৫০	১৫০
মোট	**১৬০**	**৪৮০**

কোন কোন অঞ্চলে শিং, মাগুর শতকে ১৫-১৮টি হারে রুই-জাতীয় মাছের সাথে মিলিয়ে চাষ করা হয়। বাজারজাত করার উপযোগী হয়ে গেলে বড় মাছগুলো ধরে বিক্রয় করে দিয়ে সমসংখ্যক পোনা পুন:মজুদ করলে ভাল ফলন পাওয়া যাবে।

পোনার উৎস

বাণিজ্যিক মৎস্য খামারের চাহিদা পুরণের জন্য দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ‘চাপের পোনা’ মাছের খামার গড়ে উঠেছে। কোন কোন সরকারী মৎস্য খামার বা অন্য কোন ভাল উৎস থেকে পোনা সংগ্রহ করে বা অনেক চাষি নিজেরাই খামারের আলাদা ইউনিটে এই ধরনের বিশেষ পোনা তৈরি করে নিতে পারেন।

খাদ্য ব্যবস্থাপনা

গ্রাস কার্পের জন্য আলাদাভাবে কচি ঘাস, ক্ষুদি পোনা, কলাপাতা ইত্যাদি প্রতিদিন সকালে ও বিকেলে দিতে হবে। এ ছাড়া বাকি সব মাছ প্রধানত তৈরি সম্পূরক খাদ্যের ওপর নির্ভরশীল। খাবার চাষি নিজে তৈরি করে নিতে পারেন অথবা বাণিজ্যিকভাবে বাজারজাত করা তৈরি পিলেট খাবার ব্যবহার করতে পারেন। মাছের ওজন গড়ে ১.৫ কেজি হওয়া পর্যন্ত সঠিকভাবে নমুনায়নের মাধ্যমে নির্ধারণ করে দেহের ওজনের ৩% হারে প্রতিদিন দিতে হবে। এ খাবার সমান দুভাগে ভাগ করে সকাল-বিকাল সমহারে দেয়া যায়। মাছের গড় ওজন ১.৫ কেজির বেশি হয়ে গেলে খাদ্য প্রদান হার ধীরে ধীরে পুকুরে মাছের মোট ওজনের ২.৫% এ নামিয়ে আনতে হবে। পনের দিন পরপর নমুয়ান করতে হবে এবং মজুদকৃত প্রতিটি প্রজাতিকে নমুনায়ানে অন্তর্ভুক্ত

করতে হবে। কেবল নির্ভরযোগ্য এবং বিধি-বিধান অনুসরণ করে চলা খাদ্য প্রস্তুতকারীর নিকট হতে খাবার ক্রয় করতে হবে। প্রয়োজনে চাষি নিজেও নিম্নোক্ত ভাবে খাবার তৈরি করে নিতে পারেন। এতে করে একদিকে যেমন খাদ্যের গুণগতমান নিশ্চিত করা যাবে তেমনি তা মূল্য সাশ্রয়ী হবে।

প্রতি ১০০ কেজি খাদ্য তৈরিতে বিভিন্ন উপাদানের ব্যবহার মাত্রা

খাদ্য উপাদান	পরিমাণ (কেজি)
চালেক কুড়া/গমের ভুষি	৪৯.৫০
সরিষার/তিলের খৈল	২০.০০
ফিশমিল/প্রোটিন কনসেনট্রেট	২০.০০
আটা	৫.০০
চিটাগুড়	৫.০০
ভিটামিন ও খনিজ	০.৫০
মোট	১০০

মাছ চাষকালীন সার প্রয়োগ

রুই জাতীয় মাছের কয়েকটি প্রজাতি রয়েছে যারা সম্পূর্ণভাবে প্রাকৃতিক খাদ্যের উপর নির্ভরশীল। আর পুকুরে সার দিলে এই প্রাকৃতিক খাদ্য জন্মায়। পোনা ছাড়ার পর পুকুরে পরিমিত প্রাকৃতিক খাদ্য না থাকলে মাছের ভাল ফলন পাওয়া যাবে না। অধিক ফলন পেতে পুকুরে নিয়মিত সার দিতে হয়। সার দৈনিক বা সাপ্তাহিক বা পাক্ষিক ভিত্তিতে দেয়া যায়। তবে মাত্রানুযায়ী সার প্রতিদিন প্রয়োগ করা হলে উত্তম ফল লাভ করা সম্ভব। পানির রং অবশ্যই হালকা সবুজ বা বাদামী সবুজ রাখা উচিত। সূর্যালোকিত দিনে দুপুরে পানির রং পর্যবেক্ষণ উত্তম। এ কাজটি নিজের চোখেই করা উচিত। সেকিডিস্কের দৃশ্যমানতা অবশ্যই ২০-২৫ সে.মি. রাখা উচিত। প্রতিদিন অথবা সপ্তাহে একবার সেকি ডিস্কের সাহায্যে প্রাকৃতিক খাদ্যের পরিমাপ করা উচিত। রুইজাতীয় মাছ চাষে নিয়মিত সার প্রয়োগে পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক খাদ্য তৈরি করে পানির রং সবুজ রাখা হলে সম্পূরক খাদ্য কিছুটা কম হলেও মাছের ভাল উৎপাদন পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে উৎপাদন খরচও অনেক কম পড়ে।

সারণি: মজুদ পরবর্তী দৈনিক ও সাপ্তাহিক সার প্রয়োগের নমুনা (শতাংশ)

সারের ধরন	সারের নাম	দৈনিক সারের পরিমাণ (গ্রাম)	সাপ্তাহিক সারের পরিমাণ (গ্রাম)
অজৈব	ইউরিয়া	৫-৭	৪০-৫০
অজৈব	টিএসপি	১০-১২	৭০-৮০

শীতকালে পানির তাপমাত্রা ১১^{০} সে. এর নিচে নেমে গেলে সার প্রয়োগ বন্ধ রাখতে হবে। সে হিসেবে বছরে প্রায় ৩০০ দিন সার প্রয়োগ করলেই চলে। সারের কার্যকারিতা ভাল পেতে পুকুরে সার প্রয়োগের আগে হালকা মাত্রায় চুন প্রয়োগ করা উত্তম। জৈব সার টিএসপি সারের সাথে ১২-২৪ ঘন্টা ভিজিয়ে রাখতে হবে। ছিটানোর আধা ঘন্টা পূর্বে ইউরিয়া সার পূর্বে ভিজিয়ে রাখা জৈব সার ও টিএসপি'র সাথে ভালভাবে মিশিয়ে নিতে হবে। সকাল ১০:০০ টার মধ্যে এই সার সমস্ত পুকুরে ছিটাতে হবে। প্রতিদিন সার প্রয়োগে সমস্যা হলে পুকুরের পানির রং পর্যবেক্ষণ করে ১২-১৫ দিন পর প্রতি শতাংশে নিম্ন হারে সার দেয়া যেতে পারে। তবে সম্পুরক খাদ্য ব্যবহারের জন্য সারের পরিমান কমবেশী হতে পারে।

সারের নাম	সারের পরিমাণ
ইউরিয়া	১০০-১৫০ গ্রাম

টিএসপি	১৫০-২০০ গ্রাম

আহরণ

* ফেব্রুয়ারী-মার্চে মজুদ করে ডিসেম্বরের মধ্যেই সব মাছ ধরে ফেলতে হবে;
* বাজার চাহিদার ভিত্তিতে নির্দিষ্ট দিনক্ষণ ঠিক করা প্রয়োজন;
* ভোর বেলায় মাছ ধরতে হবে।

উৎপাদন

বর্ণিত পদ্ধতিতে একর প্রতি মাছের উৎপাদন ৪-৫ টন পাওয়া সম্ভব।

সম্ভাব্য উৎপাদন ব্যয়, আয় ও মুনাফা

জলায়তন ১.০০ একর

সময়কাল: ৮-৯ মাস

ব্যয়ের খাত	ব্যয় (টাকা)
ইজারামূল্য, পুকুর প্রস্তুতি, রোটেনন, চুন সার ইত্যাদি (থোক)	৬০,০০০.০০
পোনা: বিভিন্ন মডেলের গড় (মডেল ভেদে তারতম্য হবে)	৮০,০০০.০০
খাবার: ৯০০০ কেজি x ৪০ টাকা	৩,৬০,০০০.০০
অন্যান্য (শ্রমিক, জালটানা, ঔষধপত্র, বাজারজাতকরণ)	৪,০০,০০.০০
ব্যাংক সুদ (১০% হারে, ৯ মাসের জন্য)	৩৯,৩৭৫.০০
মোট ব্যয়	**৫,৭৯,৩৭৫.০০**

আয়: উৎপাদন ৪৫০০ কেজি x ১৯০ টাকা প্রতি কেজি হারে

= ৳ ৮,৫৫,০০০.০০

ব্যয়: ৳ ৫,৭৯,৩৭৫.০০

মুনাফা: ৳ ৮,৫৫,০০০.০০ - ৳ ৫,৭৯,৩৭৫.০০ = ৳ ২,৭৫,৬২৫.০০

তেলাপিয়া চাষ ব্যবস্থাপনা

ভূমিকা

তেলপিয়া দ্রুত বর্ধনশীল সুস্বাদু মাছ। দেখতে আকর্ষণীয় এবং অধিক উৎপাদনশীল হওয়ায় চাষ লাভজনক। এ মাছ একক, মিশ্র, সমন্বিত পেনে ও খাঁচায় চাষ করা যায় বলে বাংলাদেশে এর চাষ সম্প্রসারিত হচ্ছে। বাংলাদেশে পাঁচ ধরণের তেলাপিয়া চাষ হয় যেমন- মোজাম্বিক তেলাপিয়া, নাইল তেলাপিয়া, লাল তেলাপিয়া, গিফ্‌ট তেলাপিয়া এবং মনোসেক্স তেলাপিয়া। তন্মধ্যে বিশুদ্ধ জাতের গিফ্‌ট তেলাপিয়া অধিক উৎপাদনশীল হওয়ায় চাষি ও খামারীদের কাছে এ মাছ ব্যাপক জনপ্রিয়তা পায়। গিফ্‌ট তেলাপিয়া থেকে উৎপাদিত মনোসেক্স (এক লিঙ্গ) পুরুষ তেলাপিয়া আরও দ্রুত বর্ধনশীল হওয়ায় এর চাষ ব্যবস্থাপনা ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত হয়েছে।

অর্থনৈতিক গুরুত্ব

- তেলাপিয়া মাছ সুস্বাদু এবং দেখতে আকর্ষণীয় হওয়ায় অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাজারে এর ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। তাই একে বৈশ্বিক মাছ বলা হয়;
- সর্বভুক বিধায় মাছ চাষে উৎপাদন খরচ কম হয় এবং চাষ লাভজনক;
- রোগ প্রতিরোধক্ষম এবং প্রকৃতির বিরুপ পরিবেশে এবং অধিক ঘনত্বে চাষ করা যায়; এবং
- স্বাদু ও লবণাক্ত পানি ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের জলাশয়ে চাষ করা যায়।

বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য: তেলাপিয়ার সমস্ত শরীর আঁইশে ঢাকা। মাথা ছোট। পৃষ্ঠ পাখনা কাঁটাযুক্ত। বক্ষ পাখনা ছোট। একই বয়সের পুরুষ তেলাপিয়া স্ত্রী অপেক্ষা বড়। মোজাম্বিক তেলাপিয়া আকারে ছোট, রং ধুসর থেকে কালো। এর উৎপাদনশীলতা কম। নাইল তেলাপিয়া দেখতে ধুসর নীলাভ থেকে সাদা লালচে। পুরুষ মাছের গলার অংশে লালচে এবং স্ত্রী মাছের বর্ণ লালচে হলুদাভ। আকার আকৃতি অন্য সব তেলাপিয়ার মতই কিন্তু রং লাল এবং এর উৎপাদন কম বলে জনপ্রিয়তা পায়নি। গিফ্‌ট তেলাপিয়ার লেজের আড়াআড়ি রেখা সমূহ নিরবচ্ছিন্ন। নাইল তেলাপিয়ার গায়ের রং এর চেয়ে এটির গায়ের রং হালকা। মনোসেক্স তেলাপিয়া মাছগুলি সম আকৃতির গিফ্‌ট তেলাপিয়ার মতো উচ্চ ফলনশীল, তাপমাত্রার সহনশীল মাত্রা ১২-৩৫° সে., ২-৮ পিপিএম অক্সিজেন এবং ৩-২৫ পিপিটি লবণাক্ততায় বাঁচতে পারে। মনোসেক্স তেলাপিয়া অধিক উৎপাদনশীল জাত, এরা কম অক্সিজেন এবং বিস্তৃত তাপমাত্রায় খাপ খাওয়াতে সক্ষম।

চিত্রঃ তেলাপিয়া মাছ

আদি বাসস্থান: তেলাপিয়ার আদি বাসস্থান আফ্রিকা। মোজাম্বিক তেলাপিয়ার উৎস আফ্রিকার মোজাম্বিক যা ১৯৫৪ সালে থাইল্যান্ড থেকে আনা হয়। নাইল তেলাপিয়ার উৎস আফ্রিকার নীল নদ। ১৯৭৪ সালে এই তেলাপিয়া থাইল্যান্ড থেকে বাংলাদেশে আনা হয়। লাল তেলাপিয়া মূলতঃ তাইওয়ানের এলবিনো মোজাম্বিক এবং নাইলোটিকাস এর হাইব্রিড যা ১৯৮৮ সালে থাইল্যান্ড থেকে বাংলাদেশে আনা হয়। গিফ্‌ট তেলাপিয়া ১৯৯৪ সালে বিএফআরআই ফিলিপাইন থেকে আমদানী করে। এটি নাইল তেলাপিয়ার উন্নত সংস্করণ।

চাষ ব্যবস্থাপনা

পুকুর নির্বাচন: পুকুর নির্বাচনের ওপর তেলাপিয়ার উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ বিশেষ প্রভাব ফেলে থাকে। সাধারণ মাছ চাষের জন্য পুকুর নির্বাচনের সাথে তেলাপিয়া চাষের জন্য উপযুক্ত পুকুরের বৈশিষ্ট্যে তেমন কোন পার্থক্য নেই। অধিক ঘনত্বে পোনা মজুদ করা হলে পুকুরের গভীরতা বাড়ানো যেতে পারে।

পুকুর প্রস্তুতি: যে কোন ধরণের মাছ চাষের ন্যায় তেলাপিয়া চাষের ক্ষেত্রেও নিয়মিতভাবে পাড় ও পাড়ের ঢাল মেরামত, তলার অতিরিক্ত ও পঁচা কাদা অপসারণ, পুকুরের তলদেশ সমান করা এবং পুকুরের পানিতে ছায়া সৃষ্টিকারী পাড়ের বড় গাছের ডাল পালা ও পাড়ের ঝোপ-ঝাড় পরিস্কার করতে হবে। এছাড়া নিম্নবর্ণিত কাজগুলো সম্পন্ন করতে হবে:

- পুকুর শুকিয়ে রাক্ষুসে ও অবাঞ্চিত মাছ দূর করা সবচেয়ে উত্তম। এতে পুকুরের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায়। পুকুর শুকানো না গেলে নিম্নলিখিত দ্রব্যাদি প্রয়োগ করে রাক্ষুসে ও অবাঞ্চিত মাছ দূর করা যায়:

- রোটেনন পাউডার: ২০-৩০ গ্রাম/শতাংশ/ফুট পানির জন্য।
- চা বীজের খৈল: ১৪০-১৫০ গ্রাম/শতাংশ/ফুট পানির জন্য।

বিষাক্ততার মেয়াদ ৭-১০ দিন। ঐসময় পুকুরের পানি ব্যবহার ও গোসল নিষিদ্ধ।

- ব্লিচিং পাউডার: শতাংশ প্রতি ১৫-২০ গ্রাম
- ব্লিচিং পাউডার প্রয়োগ করে রোগ জীবাণু নির্মূল করা যায়।

ব্লিচিং পাউডার অবশ্যই গুলে ছিটাতে হবে এবং খোলা ব্লিচিং পাউডার ক্রয় ও ব্যবহার করা যাবে না।

চুন প্রয়োগ: তেলাপিয়ার পুকুর প্রস্তুতি থেকে শুরু করে মজুদ পরবর্তী ব্যবস্থাপনা, রোগবালাই প্রতিরোধ ও প্রতিকার প্রতিটি ধাপে এর প্রয়োগ অনিবার্য। পুকুরের মাটি ও পানির পিএইচ মান এবং রোগের লক্ষণ অনুযায়ী চুন প্রয়োগের মাত্রা নির্ধারণ করা হয়। পুকুর প্রস্তুতির ধাপে শতাংশ প্রতি ১ কেজি হারে চুন প্রয়োগ করা যেতে পারে।

সার প্রয়োগ: সাধারণত প্রাথমিক উৎপাদনশীলতা (ফাইটোপ্লাংকটন) বৃদ্ধির জন্য সার প্রয়োগ করা হয়। সার প্রয়োগের অন্যতম কারণ হচ্ছে প্রাথমিক উৎপাদকের (ফাইটোপ্লাংকটন) জন্য অত্যাবশ্যকীয় পুষ্টি উপাদান-নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও পটাসিয়াম (NPK) সরবরাহ করা যা জৈব ও অজৈব উৎস (সার) থেকে পাওয়া যায়। বর্ণিত উপাদানসমূহ শুকনো পুকুরের কাদা থেকেও স্বয়ংক্রিয়ভাবে অবমুক্ত হয় বিধায় পুকুর শুকানোর পরে সার প্রয়োগের প্রয়োজন হয় না। তবে পুকুর শুকানো সম্ভব না হলে প্রাথমিক উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য শতাংশ প্রতি ২০০ গ্রাম চালের কুড়া, ১০০ গ্রাম চিটাগুড় এবং ১ গ্রাম বেকারী ইষ্ট মিশিয়ে ইষ্ট মোলাশিস তৈরী করে প্রয়োগ করা যেতে পারে। উল্লেখ্য যে, জৈব সারের উৎস হিসেবে গোবর অথবা মুরগীর বিষ্ঠা প্রয়োগ একেবারে নিষিদ্ধ। কারণ এসব দ্রব্যাদি মাছের রোগ বিস্তারে সহায়ক, জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশের জন্য মারাত্নক হুমকি এবং নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনের অন্তরায়।

ইষ্ট মোলাশিস প্রস্তুত ও প্রয়োগ

- **একটি পাত্র বা ড্রামে প্রয়োজনীয় চালের কুড়া, চিটা গুড় ও বেকারী ইষ্ট একত্রে মিশিয়ে পানি দিয়ে ভিজিয়ে রাখুন।**
- **২৪ ঘন্টা পর উপরের স্বচ্ছ পানি পুকুরে ঢেলে দিন এবং সমপরিমাণ পানি দিয়ে ড্রাম ভরুন।**
- **পরবর্তী ৪৮ ঘন্টা পর ড্রামের সমুদয় দ্রব্য (ইষ্ট মোলাশিস) পুকুরে প্রয়োগ করুন।**

- **খাদ্য নিরাপত্তার চেয়ে নিরাপদ খাদ্য বেশী জরুরী।**
- **পুকুরে গোবর ও হাঁস-মুরগীর বিষ্ঠার ব্যবহার পরিহার করতে হবে।**

পোনা মজুদকালীন ব্যবস্থাপনা

তেলাপিয়া চাষের জন্য বিশ্বস্থ উৎস হতে ভাল জাতের মনোসেক্স পোনা সংগ্রহ করতে হবে। পুকুর প্রস্তুতের সময় হতে পোনা সংগ্রহের জন্য যোগাযোগ করতে হবে। সাধারণতঃ হ্যাচারিসমূহ হতে ২১-২৪ দিন বয়সের ধানী পোনা সরবরাহ করা হয়। এ ধরণের পোনা সরাসরি বড় পুকুরে চাষ করলে পোনার মৃত্যুহার বেড়ে যেতে পারে এবং খাদ্য ব্যবস্থাপনায় মাছের জীবভর (Biomass) বের করতে সমস্যা হয়। সেজন্য নার্সারি পুকুরে পোনা প্রতিপালন করে ১০-১৫ গ্রাম আকারের পোনা পুকুরে ছাড়া ভাল। পোনা মজুদের ২ দিন পূর্বে শতাংশ প্রতি ৪০০ গ্রাম জিওলাইট, ৫ মি.লি./মি.গ্রাম গ্যাস নিরোধক, ৩-৫ মি.গ্রাম জীবাণুনাশক প্রয়োগ করলে ভাল ফল পাওয়া যায়। এছাড়াও পোনা ছাড়ার ২-৩ ঘন্টা পূর্বে প্রতি শতাংশে ৩০ গ্রাম সোডিয়াম পারকার্বনেট প্রয়োগ করে পানি অক্সিজেন সমৃদ্ধ করা যায়।

- উচ্চ আমিষসমৃদ্ধ খাদ্য প্রয়োগের পাশাপাশি এ্যারেটর/পানির ঝর্ণা দিয়ে পুকুরের পানির অক্সিজেন বৃদ্ধি করে খাদ্যের পরিপাক ক্রিয়া (Digestibility) বৃদ্ধি করতে হবে অন্যথায় উচ্ছিষ্ট খাদ্যের পচন ক্রিয়ায় মাছ মারা যেতে পারে।
- খাদ্য গুদামের মেঝে শুকনা এবং পর্যাপ্ত আলো বাতাসের ব্যবস্থা রাখতে হবে। খাদ্য ও খাদ্য উপকরণ কুকুর, বিড়াল, ইঁদুর, তেলাপোকার নাগালের বাহিরে রাখতে হবে।

মজুদ ঘনত্ব

মজুদ পুকুরে পোনা ছাড়ার হার বা মজুদ ঘনত্ব নিম্নের বিষয়গুলোর ওপর নির্ভরশীল:

- চাষির মাছ চাষের পূর্ব অভিজ্ঞতা ও চাষির আর্থিক সামর্থ;
- চাষের সময়কাল ও মাছ চাষের ধরন: একক, মিশ্র, আধা নিবিড় বা নিবিড়;
- খাদ্যের ধরণ যেমন: ভেজা খাবার, পিলেট বা কারখানায় তৈরী ভাসমান খাবার;
- চাষকালীন ব্যবস্থাপনা যেমন: পুকুরে নিয়মিত পানি পরিবর্তন, এ্যারেটর ব্যবহার ইত্যাদি;
- আধা নিবিড় পদ্ধতিতে ২০০-২৫০টি তেলাপিয়ার পোনা মজুদ করা যেতে পারে। এর সাথে কার্প জাতীয় মাছের পোনা ১৫-২০ টি এবং শিং মাছের পোনা ১৫-২০টি মজুদ করা যেতে পারে।

পোনা পরিবহণ ও শোধন: তেলাপিয়া পোনা পরিবহণের সময় অত্যন্ত সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়। পোনা ধরে পাকা চৌবাচ্চায় রেখে ৬-৮ ঘন্টা টেকসই করে পলিব্যাগে অক্সিজেন দিয়ে পরিবহন করতে হবে। সমআকারের (৫-৭ সে.মি.) পোনা সকালে/বিকেলে শোধন করে খাপ খাওয়ায়ে মজুদ পুকুরে ছাড়তে হবে।

তেলাপিয়ার খাদ্য ব্যবস্থাপনা: তেলাপিয়া চাষে খাদ্য ব্যবস্থাপনা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ তেলাপিয়া চাষ সম্পূর্ণরূপে সম্পূরক খাদ্য নির্ভর। একটি বাণিজ্যিক মৎস্য খামারের প্রায় ৬০% ব্যয় হয় মাছের খাদ্য ক্রয়ে। এক্ষেত্রে সহজেই বুঝা যায় যে, লাভজনকভাবে খামার পরিচালনার ক্ষেত্রে খাদ্যের গুণাগুন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তেলাপিয়ার খাদ্যে ৩০-৩৫% আমিষ থাকা বাঞ্চনীয়।

খাবার প্রয়োগ: মাছের দৈহিক ওজনের ১০% থেকে ৩% হারে খাদ্য প্রয়োগ করতে হবে। মাছ ছোট অবস্থায় ৪ বার খাদ্য প্রয়োগ করা উচিত। মাছের গড় ওজন ২০ গ্রাম হলে দিনে ৩ বার খাদ্য প্রয়োগ করাই উত্তম। পিলেট খাবার পুকুরের নির্দিষ্ট স্থানসমূহে নির্দিষ্ট সময়ে এবং পরিমাণমত দিতে হবে। পোনা মজুদের পর ৩০-৩৫% আমিষ সমৃদ্ধ কৃত্রিম খাদ্য দৈহিক ওজনের ১০-৩% হারে নিম্নের ছক আনুযায়ী প্রয়োগ করা যেতে পারে:

সপ্তাহ	খাদ্য প্রয়োগের হার	খাদ্যের প্রকার
১ম দুই সপ্তাহ	১০%	স্টার্টার-২
২য় দুই সপ্তাহ	৮%	স্টার্টার-৩
৩য় দুই সপ্তাহ	৭%	স্টার্টার-৩
৪র্থ দুই সপ্তাহ	৬%	স্টার্টার-৩
৫ম দুই সপ্তাহ	৫%	গ্রোয়ার-১
৬ষ্ঠ দুই সপ্তাহ	৪%	গ্রোয়ার-১
৭ম দুই সপ্তাহ	৪%	গ্রোয়ার-২
৮ম দুই সপ্তাহ	৩%	ফিনিশার-২

- উচ্চ আমিষসমৃদ্ধ খাদ্য প্রয়োগের পাশাপাশি এ্যারেটর/পানির ঝর্ণা দিয়ে অক্সিজেন বাড়িয়ে খাদ্যের পরিপাক ক্রিয়া (Digestibility) বৃদ্ধি করুন। অন্যথায় উচ্ছিষ্ট খাদ্যের পচন ক্রিয়ায় মাছ মারা যেতে পারে।

প্রতি মাসে কমপক্ষে একবার নমুনায়ন করে প্রয়োজনীয় খাদ্যের পরিমাণ নির্ণয় করতে হবে। দৈনিক সকাল বিকেল দুবার খাদ্য প্রয়োগ করা যেতে পারে।

৫০ শতক পুকুরে তেলাপিয়া চাষের (এক ফসল) আয়-ব্যয়ের হিসাব:

ক্রমিক	ব্যয়ের খাত	সংখ্যা/ পরিমাণ	একক মূল্য (টাকা)	মোট (টাকা)	মন্তব্য
১.	ইজারা মূল্য (৬ মাস)	৫০ শতক	থোক	১০,০০০.০০	
২.	পুকুর সংস্কার ও প্রস্তুতি	৫০ শতক	থোক	২,০০০.০০	
৩.	চুন	৫০ কেজি	১৫/-	৭৫০.০০	
৪.	পোনা ক) তেলাপিয়া (১০-১৫ সে.মি.) খ) রুই (১৫-২০ সে.মি.) গ) সিলভার কার্প (১০-১৫ সে.মি.) ঘ) কাতলা (১৫-২০ সে.মি.) ঙ) শিং (৫-৭ সে.মি.)	 ১২,৫০০টি ১০০টি ১০০টি ৫০টি ১০০০টি	 ১.৫০ ১০/- ৩/- ১০/- ২/-	 ১৮,৭৫০.০০ ১০০০.০০ ৩০০.০০ ৫০০.০০ ২০০০.০০	-
৫.	কৃত্রিম খাদ্য (৩০% আমিষ, FCR ১.৫)	২৮৪৬.৫ কেজি	৪০/-	১,১৩,৮৬০.০০	-
৬.	ঔষধ, রাসায়নিক দ্রব্য ইত্যাদি	থোক	থোক	১৫,০০০.০০	-
৭.	অন্যান্য ব্যয়	থোক	থোক	১০,০০০.০০	-
৮.	**উপমোট ব্যয়**			**১,৭৪,১৬০.০০**	
৯.	**ব্যাংক ঋণের উপর ৮% সুদ**			**১৩,৯৩২.৮০**	-
১০.	**সর্বমোট**			**১,৮৮,০৯২.৮০**	

উৎপাদন ও আয়

পোনার মজুদ সংখ্যা	মৃত্যু হার (আনুমানিক)	বেঁচে থাকা মাছের সংখ্যা	গড় ওজন (গ্রাম)	মোট ওজন (কেজি)	একক মূল্য (টাকা)	মোট মূল্য (টাকা)
তেলাপিয়া- ১২,৫০০টি	১০%	১১,২৫০টি	২৫০	২৮১২.৫০	৮০/-	২,২৫,০০০.০০
রুই মাছ- ১০০টি	১০%	৯০টি	৫০০	৪৫.০০	১৮০/-	৮,১০০.০০
সিলভার কার্প-১০০টি	১০%	৯০টি	৫০০	৪৫.০০	৬০/-	২,৭০০.০০
কাতলা-৫০টি	৫%	২৫টি	৭৫০	১৮.৭৫	১৫০/-	২,৮১২.৫০
শিং -২০০০টি	১০%	১,৮০০টি	০.০২	৩৬.০০	৩০০/-	১০,৮০০.০০
			সর্বমোট	**২৯৫৭.২৫**		**২৪,৪১২.৫০**

নীট আয়: আয় - ব্যয়= ২,৪৯,৪১২.৫ - ১,৮৮,০৯২.৮ = ৳ ৬১,৩১৯.৭০

পাংগাস মাছের চাষ ব্যবস্থাপনা

আমাদের দেশের নদনদীতে এক সময় প্রচুর পাংগাস মাছ পাওয়া যেত। নদী থেকে পোনা সংগ্রহ করে দেশীয় পাংগাসের চাষ সম্প্রসারণ করার চেষ্টা করা হয়েছে কিন্তু তা লাভজনক হয়নি। বিশেষ করে পোনার প্রাপ্যতা নিশ্চিত না করতে পারায় দেশীয় পাংগাস চাষ তেমন অগ্রসর হয় নাই। দেশী পাংগাসের জনপ্রিয়তার প্রেক্ষিতে ১৯৯০ সালে থাইল্যান্ড থেকে আমাদের দেশীয় পাংগাসের অনুরূপ পাংগাস মাছ আমদানী করা হয়। বর্তমানে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি হ্যাচারিতে থাই পাংগাসের রেণু এবং পোনা বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদন হচ্ছে। ময়মনসিংহ, বগুড়া, যশোর, কুমিল্লা অঞ্চলসহ দেশের প্রায় অধিকাংশ এলাকায় থাই পাংগাস চাষের সম্প্রসারণ ঘটেছে ব্যাপকভাবে। দেশীয় রুই জাতীয় মাছের তুলনায় এ মাছের উৎপাদনশীলতা অনেক বেশি হওয়ায় এ মাছ পুকুরে আধা নিবিড়/নিবিড় পদ্ধতিতে একক/মিশ্রচাষ হচ্ছে। দেশের অভ্যন্তরীণ বাজারে মাছের চাহিদা পূরণে এমাছ এক বিশেষ ভূমিকা রেখে চলেছে। এ মাছ বদ্ধ জলাশয়ে তথা পুকুরে চাষের জন্য খুবই উপযোগী। তাছাড়া পেনে, খাঁচায় ও উন্মুক্ত জলাশয়ে এ মাছের চাষও করা হচ্ছে। পাংগাস বর্তমানে দেশের প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণে বিরাট ভূমিকা রাখছে।

Species –*Pungasius sutchi*

পাংগাস মাছের পরিচিতি

- এমাছের আদি বাস থাইল্যান্ড, কম্বডিয়া ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকায়;
- এ মাছ দেখতে রুপালি-সাদা, পিঠের দিকটা নিলাভ কালো রং এর হয়;
- পিঠে একটি ও কানকুয়ার পাশে দুটি শক্ত কাটা থাকে;
- মাছটির উপরের অংশে মাথা থেকে লেজের গোড়া পর্যন্ত নিলাভ কালচে লম্বালম্বি দাগ থাকে এবং তলদেশ উজ্জ্বল সাদা;
- এদের মুখের দুই প্যাশে দুই জোড়া গোফ ও পিঠে এডিপোস ফিন থাকে;
- এমাছ বদ্ধ জলাশয়ে ডিম দেয় না, পুকুরের নিম্নস্তরে বাস করে এবং সব ধরনের খাবার খেয়ে বড় হয়;
- পানিতে ভাসমান উদ্ভিদ, প্রাণী কণা, জলাশয়ের তলদেশে অবস্থানরত বিভিন্ন জলজ কিট, কেঁচো, শামুক ইত্যাদি খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে; এবং
- এদের প্রতিকূল পরিবেশ সহ্য ক্ষমতা অধিক, স্বল্প অক্সিজেন মাত্রায় টিকে থাকতে পারে।

পাংগাস মাছচাষের সুবিধা ও গুরুত্ব

আমাদের দেশের মানুষের খাদ্য ও পুষ্টি চাহিদা পূরণ এবং আর্থসামাজিক উন্নয়নে এ মাছের ভূমিকা অপরিসীম। সেকারণে কার্পজাতীয় মাছের পাশাপাশি পাংগাস মাছের বিজ্ঞান ভিত্তিক চাষের গুরুত্ব অপরিসীম। আরো যেসব কারণে পাংগাস মাছচাষ গুরুত্বপূর্ণ তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

- বাংলাদেশের মাটি, আবহাওয়া ও জলবায়ু এ মাছ চাষে অত্যন্ত উপযোগী;
- মাছটি দ্রুত বর্ধনশীল, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশি এবং স্বল্প অক্সিজেন মাত্রায় বেচে থাকে;
- মৌসুমি, বাৎসরিক ও অগভীর, ছোট-বড় সকল জলাশয়ে এ মাছ চাষ করা যায়;
- এ মাছ অত্যন্ত পুষ্টিকর ও সুস্বাদু, এর বাজার চাহিদা এবং যথেষ্ট বাজার মূল্য আছে;
- এ মাছে রোগ বালাই কম হয় এবং পরিবেশ তারতম্য সহ্য ক্ষমতা অনেক বেশি;
- আধা-নিবিড় ও নিবিড় পদ্ধতিতে চাষের ক্ষেত্রে অধিক উৎপাদন এবং ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ রয়েছে;
- এ মাছ ৬-৭ মাস চাষে খাবার উপযোগী ও বাজারজাতকরণ করা যায়;
- জীবন্ত অবস্থায় দীর্ঘ সময় পর্যন্ত বাজারজাত করা যায় ফলে নিশ্চিতভাবে উত্তম মূল্য পাওয়া যায়;
- এ মাছের পোনা উৎপাদন সহজ এবং সর্বত্র পাওয়া যায়;
- এমাছ থেকে ভ্যালু এডেড প্রোডাক্ট উৎপাদন করে বিদেশে প্রেরণ করার সুযোগ রয়েছে।

পাংগাস মাছ চাষ পদ্ধতি

পাংগাস মাছ একটি সর্বভূক মাছ। এরা নদীর মাছ হলেও পুকুরে সাফল্যজনকভাবে চাষ করা হচ্ছে। যেহেতু মাছটি দ্রুত বড় হয়, পরিবেশের তারতম্য সহ্য করতে পারে, অল্প জায়গায় অনেক বেশি উৎপাদন হয় সে জন্য চাষি এ মাছ চাষ অব্যাহত রেখেছে। পাংগাস মাছের সাথে অন্যান্য প্রজাতির মাছ একত্রে চাষ করে কিভাবে অধিক লাভ নিশ্চিত করা যায় মাঠ পর্য়ায়ে চাষিরা সে চেষ্টা করে যাচ্ছে নিরন্তরভাবে।

সাধারণ মাছ চাষের জন্য পুকুর নির্বাচনের সাথে পাংগাস চাষের জন্য উপযুক্ত পুকুরের বৈশিষ্ট্যে তেমন কোন পার্থক্য নেই। তবে অধিক ঘনত্বে পোনা মজুদ করা হলে পুকুরের গভীরতা বাড়ানো যেতে পারে। সব আকারের পুকুরে এমাছ চাষ করা যায় তবে মাঝারী থেকে বড় পুকুর (৫০-৩০০ শতাংশ) সবচেয়ে উপযোগী।

চাষের সময় কাল

চাষির নিজস্ব নার্সারিতে পোনা মজুদ থাকলে শীতের পরে মার্চের শুরুতেই পোনা মজুদ করে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত লালন পালন করলে মাছের গড় ওজন ১.০-১.৫ কেজি হয়ে যায়। শীতের পরে ১-২ মাস ভালভাবে খাবার প্রয়োগ করে মাছ বাজারজাত করলে মাছের আকার বড় হয় এবং ভাল দামও পাওয়া যায় তবে পাংগাস চাষে শীতকাল পরিহার করতে পারলে ভাল ফলাফল পাওয়া যায়।

পাংগাস মাছ চাষে মজুদপূর্ব ব্যবস্থাপনা

পুকুরে মাছের পোনা মজুদের আগে বেশ কিছু কাজ করতে হয়। এ কাজগুলো মাছচাষে সফলতা লাভ করার ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

পুকুর প্রস্তুতি:

যে কোন ধরণের মাছ চাষের ন্যায় পাংগাস চাষের ক্ষেত্রেও নিয়মিতভাবে পাড় ও পাড়ের ঢাল মেরামত, তলার অতিরিক্ত ও পঁচা কাদা অপসারণ, পুকুরের তলদেশ সমান করা এবং পুকুরের পানিতে ছায়া সৃষ্টিকারী পাড়ের বড় গাছের ডাল পালা ও পাড়ের ঝোপ-ঝাড় পরিস্কার করা করতে হবে। এছাড়া নিম্নবর্ণিত কাজগুলো সম্পন্ন করতে হবে:

পুকুরের আগাছা পরিস্কার করা: পুকুরে জলজ আগাছা থাকলে তা সম্পূর্ণ পরিস্কার করতে হবে। আগাছা মাছ চাষে নানবিধ সমস্যা সৃষ্টি করে। বিভিন্নভাবে পুকুর থেকে আগাছা দূর করা যায়। তবে যান্ত্রিক উপায়ে কায়িক পরিশ্রমে (Manually) অপসারণ করাই উত্তম। জৈবিক বা রাসায়নিক পদ্ধতি তেমন কার্যকর নয়।

রাক্ষুসে ও অবাঞ্চিত মাছ দূরীকরণ: পুকুরে লাভজনকভাবে পাংগাস মাছ চাষের পূর্বশর্ত হলো সঠিকভাবে পুকুর প্রস্তুত করা। পুকুর প্রস্তুতের সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ পুকুরটি মাছ শুন্য করা। রাক্ষুসে মাছ দুর করার বেশ কয়েকটি পদ্ধতি রয়েছে যেমন: বার বার জাল টানা, পুকুর শুকাানো, রোটেনন প্রয়োগ, ফমিটক্স ট্যাবলেট প্রয়োগ ইত্যাদি। তবে পাংগাস চাষের ক্ষেতে পুকুর শুকিয়ে তলার কাদা দুর করে ফেলা উত্তম।

ব্লিচিং পাউডার: পাংগাস মাছ চাষে ব্যাক্টেরিয়ার উপস্থিতি নানা প্রকার সমস্যার সৃষ্টি করে বলে এ জন্য পুকুর প্রস্তুতির সময় ব্লিচিং পাউডার (৩০% ক্লোরিন) প্রতি শতাংশে ১০০ গ্রাম হারে প্রয়োগ করে পুকুরের তলদেশ দূষণমুক্ত করা প্রয়োজন। ব্লিচিং পাউডার পুকুরের জলজ পরিবেশের বা পুকুরের তলদেশের মাটির সকল ক্ষতিকর ব্যাক্টেরিয়াকে ধ্বংশ করে।

ব্লিচিং পাউডার পানিতে দ্রবীভূত হয়ে হাইপোক্লোরাস এসিড ও ক্যালসিয়াম ক্লোরাইডে পরিণত হয়। এই হাইপোক্লোরাস এসিড ফ্রি র‌্যাডিক্যাল অক্সিজেন রিলিজ করে যা ক্ষতিকারক অনেক জীবাণু ও অন্যান্য অর্গানিজম বিনষ্ট করে।

চুন প্রয়োগ: মাছচাষে চুন প্রয়োগ অত্যাবশ্যক। পুকুর প্রস্তুতের সময় পুকরের বিদ্যমান পিএইচ মাত্রার ওপর বা তলদেশের কাদার পরিমাণের ওপর ভিত্তি করে শতাংশে ১-২ কেজি চুন প্রয়োগ করতে হবে। চুনের কার্যকরীতা ভাল পেতে সাদা চাকা পোড়া চুন (CaO) প্রয়োগ করতে হবে। পাউডার চুন বা কলি চুন (Ca (OH)2) এর কার্যকরীতা ভাল থাকে না।

সার প্রয়োগ: পাংগাস মাছ চাষে সাধারণত পুকুরে সার প্রয়োগ করার প্রয়োজন হয় না। তবে পুকুরের প্রাথমিক উৎপাদশীলতা বৃদ্ধির জন্য একবার সার প্রয়োগ করা যেতে পারে। সারের মাত্রা পুকুর ভেদে প্রতি শতাংশে ইউরিয়া ১০০-১৫০ গ্রাম এবং টিএসপি ১০০-১৫০ গ্রাম হারে প্রয়োগ করা যেতে পারে। কোনভাবেই পুকুরে জৈব সার তথা গোবর বা মুরগির বিষ্টা বা অন্য কোন অপদ্রব্য ব্যবহার করা যাবে না যা জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর এবং উত্তম মাছ চাষ অনুশীলনের (Good Aquaculture Practice) পরিপন্থী।

পুকুরের ওপর বড় ফাঁসের জাল স্থাপন: পাংগাস মাছ পুকুরে অধিক ঘনত্বে চাষ করা হয়। সহজে শিকারী পাখি মাছ ধরতে না পারে সে জন্য সমস্ত পুকুরের উপর বড় ফাঁসের জাল স্থাপন করতে হয়। জালব্যতিত লম্বা সুতা পুকুরের আড়াআড়ি সারিসারি টানা দিয়েও এ কাজটি করা যেতে পারে। অন্যথায় প্রতিদিন মাছ শিকারী পাখিতে প্রচুর পরিমাণ মাছ খেয়ে ফেলবে এবং যা মাছ উৎপাদনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।

মজুদ কালীন ব্যবস্থাপনা

পোনা সংগ্রহ ও পরিবহন: পাংগাস মাছের পোনা পরিবহন রুই জাতীয় মাছের পোনা পরিবহনের মত হলেও কিছুটা ভিন্নতা রয়েছে। এ মাছ কাটা যুক্ত হওয়ায় বড় আকারের পোনা অক্সিজেন ব্যাগে পরিবহন করা যায় না। পাংগাস মাছের চাষের জন্য সাধারণত বড় আকারের (১০০-২৫০ গ্রাম) পোনা মজুদ করা হয়। এ ধরনের পোনা সংগ্রহ ও পরিবহন জটিল এবং ব্যয়বহুল। পোনা প্রাপ্তি নিশ্চিত করার জন্য চাষির নিজের একটি পুকুরে আগে থেকেই ছোট (১-২ ইঞ্চি) আকারের পোনা মজুদ করে লালন পালন করে নেয়া উচিত। এতে পোনার ব্যয় কমে আসবে এবং প্রয়োজনের সময়, নিদিষ্ট আকারের পোনা প্রাপ্তি নিশ্চিত হবে। পাংগাসের পোনা সাধারণত প্লাষ্টিকের বড় আকারের ব্যারেলে পরিবহন করা হয়। একটি ব্যারেলে পোনার আকার ভেদে ৫০০-২০০০টি পোনা পরিবহন করা যেতে পারে। দূরবর্তী স্থানে পোনা পরিবহনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনে পানি পরিবর্তন করতে হবে। এ সময় ড্রামের পোনার পীড়ণ প্রশমিত করার জন্য এক প্যাকেট ওর স্যালাইন দেয়া যেতে পারে। পানিতে বাড়তি অক্সিজেনের উৎস হিসাবে সোডিয়াম পারকার্বনেট প্রয়োগ করা যেতে পারে। বেশি দূরে বা অধিক সময় ধরে পোনা পরিবহনের ক্ষেত্রে পোনার পরিমাণ কমিয়ে নিতে হবে।

২.৩. পাংগাস মাছের পোনা পরিবহনে সতর্কতা

১) পুকুর থেকে পোনা পরিবহনের আগের দিন পুকুরে কোন খাবার দেওয়া যাবে না। পোনা পরিবহনের পূর্বে অবশ্যই পোনা টেকসই করে নিতে হবে। এ জন্য পোনা পরিবহনের কয়েক ঘন্টা আগে পানির ফোয়ারা যুক্ত হাউজে রাখতে হবে। পোনা পরিবহনের সময় একই আকারের পোনা পরিবহন করা উত্তম।

২) পাংগাস মাছের পোনা গায়ে আঁশ থাকে না কিন্ত তার তিনটি কাটা থাকে এ জন্য মাছের পোনা নার্সারি পুকুর থেকে ধরা বা কন্ডিশনিং হাউজ (Cistern) থেকে ধরার (Handling) সময় বিশেষ সর্তকতা অবলম্বন করতে হবে।

৩) পোনা পরিবহনের সময় অধিক ঘনত্ব অবশ্যই পরিহার করতে হবে। পাত্রের পানি পরিবর্তনের সময় ক্রমান্বয়ে নতুন পানি যুক্ত করে পুরাতন পানি ফেলে দিতে হবে।

পানির বিষাক্ততা পরীক্ষা: যদি পুকুর প্রস্তুতি পর্যায়ে কোন প্রকার বিষ প্রয়োগ করা হয় হবে পুকুরে পোনা মজুদের আগে অবশ্যই পানির বিষাক্ততা আছে কিনা পর্যবেক্ষণ করে নিতে হবে। পুকুরে একটি হাপা বেধে তার ভিতরে কিছু পোনা মাছ ছেড়ে কয়েক ঘন্টা পর্যবেক্ষণ করেও এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া যেতে পারে।

মজুদ ঘনত্ব: পাংগাস চাষের সফলতার অন্যতম প্রধান একটি নিয়ামক হচ্ছে মজুদ ঘনত্ব। অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে পুকুরে মাছ চাষে উদ্ভূত সমস্যার প্রধান কারণ অধিক হারে মাছের পোনা মজুদ। এজন্য পুকুরে পরিমাণ মত মাছ ছাড়তে হবে। এখানে পাংগাস মাছ বাণিজ্যিকভাবে চাষের অধিক প্রচলিত কয়েকটি মডেল উল্লেখ করা হল। পুকুরে পোনা মজুদের সময় পোনার আকার অবশ্যই ১০০ গ্রামের উপরে হলে ভাল হয়।

(প্রতি শতাংশে পোনা ছাড়ার সংখ্যা)

প্রজাতির নাম	মডেল ১	মডেল ২	মডেল ৩	মডেল ৪
পাংগাস	১৫০-৩০০	১০০-১৫০	৭৫-১০০	৫০-১০০
কার্পজাতীয়	৫-৮	৩-৫	৩-৫	২০-৪০
শিং বা মাগুর	-	৫০-১০০	-	-
তেলাপিয়া	-	-	৭৫-১২০	৫০-১০০

মডেল ১: এ পদ্ধতি পাংগাস মাছের একক চাষ বলা যেতে পারে। বর্তমানে একক পাংগাস চাষ কিছুটা কমে আসছে। এ পদ্ধতিতে বেশি হারে (২৫০-৩০০টি/শতাংশে) পোনা ছাড়লে মাছের আকার বেশি বড় করা যাবে না। অথবা পাংগাস মাছ যখন আধা কেজি আকারের হবে তখন অর্ধেক মাছ বিক্রয় করে দিয়ে বাকি মাছ বড় আকারের করা যেতে পারে। মাছ আংশিক আহরণের সময় সব মাছকে বিরক্ত করা যাবে না পুকুরের এক প্রান্ত হতে বেড় জাল দিয়ে প্রয়োজনীয় পরিমাণ মাছ ধরে নিতে হবে। সবমাছ ধরে সেখান থেকে বাছাই করলে পুকুরে রেখে যাওয়া মাছের ক্ষতি হবে।

মডেল ২: এ পদ্ধতিতে পাংগাস মাছের সাথে শিং বা মাগুর মাছের চাষ লাভ জনক হিসাবে মাঠ পয়ায়ে প্রচলিত আছে। শিং এবং মাগুর মাছের পোনা একটু বড় আকারের (কেজিতে ৪০০-৫০০) ছাড়তে হবে। এখানে শিং বা মাগুর মাছ পাংগাসের খাবারের উপর নির্ভর করে চাষ পরিচালিত হয়। এখানে শিং বা মাগুর মাছের জন্য আলাদা খাবার দেবার প্রয়োজন হয় না।

মডেল ৩: পাংগাস মাছের সাথে তেলপিয়া মাছ চাষ করতে হলে তেলাপিয়ার পোনা নার্সারিতে ২৫-৩০ গ্রাম আকারের পোনা তৈরী করে নিতে হবে। অথবা তেলাপিয়ার (Mono-sex) পোনা আগে পুকুরে ছেড়ে নিয়ে ৩৫-৪০ দিন লালন পালনের পর পাংগাস মাছের পোনা ছাড়তে হবে। তেলাপিয়া মাছ পাংগাস মাছের সাথে দ্রত বড় হয়। এরা পুকুরের উচ্ছিষ্ট খাবার ও পুকুরের তলদেশের জৈব পদার্থ খেয়ে পুকুরের পরিবেশ ভাল রাখতে সহায়তা করে। এ পদ্ধতিতে তেলাপিয়ার একটি বাড়তি ফসল পাওয়া যায়। তেলাপিয়া বেশি দিলে পাংগাস মাছের সংখ্যা কমিয়ে দিতে হবে এবং এক্ষেত্রে পাংগাস মাছের ডুবন্ত খাবারের সাথে তেলাপিয়ার জন্য ভাসমান খাবার বা উভয়ের জন্য ভাসমান বা ডুবন্ত যে কোন খাবার ব্যবহার করা যেতে পারে।

মডেল ৪: পাংগাস. তেলাপিয়া এবং কার্প জাতীয় মাছ একত্রে চাষই এখন মাঠ পর্যায়ে বেশি প্রচলিত। বিশেষ করে পাংগাস মাছের দাম কমে যাওয়াতে চাষি তার মাছ চাষে লাভ নিশ্চিত করার জন্য এ পদ্ধতি অনুসরণ করছে। এ পদ্ধতিতে মাছের উৎপাদনও বেশি হচ্ছে এবং কার্প জাতীয় মাছের অধিক উৎপাদনর হচ্ছে ফলে মাছ বিক্রয়ে অধিক অর্থ উপার্জন হচ্ছে। এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করতে হয়, পুকুরে পাংগাস মাছ দিলে চাষির পুকুরে খাবার দেবার বিষয়ে যে ভাবে যত্নবান থাকেন শূধু কার্পজাতীয় মাছের চাষে তেমনটি মনোযোগী থাকেন না। এ জন্য পাংগাস চাষের সাথে অন্যান্য প্রজাতির মাছের ফলন অধিকতর ভাল হয়। কার্প জাতীয় মাছের পোনা অবশ্যই পাংগাসের পোনার মত আকারের অথবা কিছুটা বড় আকারের হতে হবে অন্যথায় কার্প জাতীয় মাছের বর্ধন ভাল হবে না।

মজুদ পরবর্তী ব্যবস্থাপনা

পুকুরে মাছের পোনা ছাড়ার পরের কাজগুলোকে মাছ চাষের পরিচর্যাও বলা যেতে পারে। পোনা পুকুরে ছাড়ার পরে মাছের দ্রুত বর্ধনের জন্য যে কাজ করতে হয় তা নিম্নে আলোচনা করা হল।

পোনার মৃত্যুহার কমাতে করণীয়: যে কোন মাছ চাষের পুকুরে পোনা ছাড়ার পরদিন ভোরে পুকুরে পর্যবেক্ষণ করতে হবে কোন পোনা মারা গেছে কি না। যদি পোনা দুই একটি মারা যায় তবে আর ছাড়ার প্রয়োজন নাই তবে অধিক সংখ্যক পোনা মারা গেলে কি পরিমাণ পোনা মারা গেছে তা হিসাব করে পুনরায় সমপরিমাণ পোনা সংগ্রহ করে পুকুরে মজুদ করতে হবে। মজুদের প্রথম তিন দিন খাদ্যের সাথে অক্সিটেট্রাসাইক্লিন (১০ গ্রাম প্রতি কেজি খাবারের সাথে) মিশিয়ে খাওয়াতে হবে। এতে আঘাত প্রাপ্ত পোনার মৃত্যুহার কমে যাবে।

খাদ্য ব্যবস্থাপনা: সাধারণভাবে ধারণা করা হয় মাছ চাষের মোট ব্যয়ের ৭০% ব্যয় হয় খাদ্য বাবদ। অতএব মাছচাষে খাদ্য অত্যন্ত প্রভাবশালী ফ্যাক্টর। পাংগাস সাধারণত তলদেশের খাবার খেয়ে বড় হয়। কিন্তু বর্তমান সময়ে মাঠপর্যায়ে পাংগাস মাছ চাষে ভাসমান খাবার ব্যবহার চাষের ধরণে পরিবর্তন এনেছে। পাংগাস মাছ চাষে খাদ্য ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। চাষের মাছকে প্রতিদিন খাদ্য সরবরাহ অবশ্যই নিশ্চিত করতে হয়। কোন কারণে ২-৩ দিন খাদ্য প্রয়োগ বাদ পড়লে মাছ চাষে বা উৎপাদনে বড় ধরণের নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। বার বার এমনটি ঘটলে উৎপাদন এমনভাবে ব্যাঘাত ঘটতে পারে যে চাষি পাংগাস চাষে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারেন। অর্থাৎ বিনিয়োগকৃত পুঁজি ফেরত নাও পেতে পারেন। কোন কারণে যদি নিয়মিত ব্যবহৃত খাদ্য পাওয়া না যায় তবে মাছকে অভূক্ত রাখা যাবে না। প্রয়োজনে খৈল, গমের ভূঁষি বা অন্য যে কোন প্রকারের মাছের খাবার মাছকে খাওয়াতে হবে। পাংগাস মাছ চাষে অধিক ফলন নিশ্চিত করার জন্য পুকুরে সুষম ভাল মানের সম্পূরক খাবার প্রয়োগ করতে হবে। সম্পূরক খাবার দিয়ে চাষের জন্য অধিক আমিষ সমৃদ্ধ (২৮-৩০% এর অধিক) খাবার সরবরাহ করতে হয়। পাংগাস মাছের বিভিন্ন বয়সে বিভিন্ন মাত্রার আমিষ সমৃদ্ধ খাবার প্রয়োজন হয়।

খাদ্য তৈরী: পাংগাস মাছের খাবার দুইভাবে তৈরি করা যেতে পারে।

নিজস্ব খামারে তৈরি (Supplementary Feed)ঃ এ মাছ চাষের জন্য নিজস্ব খামারে বা বাড়িতে সম্পূরক খাদ্য প্রস্তুত করা যায়। নিম্নে উল্লেখিত উপকরণ ব্যবহার করে খামারে পাংগাস মাছের খাবার তৈরী করা যেতে পারে। নিজস্ব খামারে খাবার তৈরি করে পাংগাস মাছ চাষের ক্ষেত্রে পুকুরে মজুদ ঘনত্ব কিছুটা কম দিতে হবে।

ক্র.নং	উপকরণের নাম	পরিমাণ (%)	প্রোটিন এর পরিমাণ
১.	ফিসমিল বা মিট এন্ড বোনমিল	২০	১১
২.	সরিষার খৈল	২৫	৮.৫
৩.	সয়াবিন খৈল	১০	৪
৪.	অটোকুড়া	২৮	৩.৫
৫.	ভূট্টা	১০	১.৫
৬.	আটা	৩	০.৫
৭.	চিটাগুড়	২	
৮.	মাছের তৈল	০.৫	
৯.	ঝিনুকের গুঁড়া	০.৫	
১০.	ভিটামিন প্রিমিক্স (Growth Promoter)	১	
	মোট	১০০%	২৯%

খাদ্য তৈরিতে সরিষার খৈল ব্যবহার করতে হলে অবশ্যই ১২ ঘন্টা ভিজিয়ে রাখতে হবে। কারণ খৈলে মাছের বর্ধনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী উপাদান আছে যা পানিতে ভিজিয়ে রাখলে ক্ষতিকর উপাদান প্রশমিত হয়।

বাণিজ্যিক খাবার (Artificial Feed): বাজারে বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদিত (Formulated Industrial Feed) বিভিন্ন ব্রান্ডের খাদ্য পাওয়া যাচ্ছে। এধরনের খাদ্যের এফসিআর ভাল। যদিও পাংগাস পুকুরের তলদেশের মাছ তবে এরা ভাসমান খাবারও ভালভাবে গ্রহণ করে। ভাসমান খাবার খাওয়ালে খাবারের অপচয় রোধ করা যায় এবং মাছের তৃপ্ত মাত্রা (Satiation level) অনুযায়ী খাবার সরবরাহ করা যায়। মাছের খাদ্যে যদি মাইকোটক্সিন শোষণকারী (Mycotoxins Absorbent) উপাদান ও জৈব এসিড (Potassium Diformate) ব্যবহার করা যায় তাহলে সকল প্রধান পুষ্টি উপাদানের ADC (Apparent Digestibility Coefficient) উন্নত হবে এবং খাদ্য মুল্য (Cost-Benefits) লাভজনক হবে।

খাদ্য প্রয়োগঃ পুকুরে পোনা মজুদের পর মাছের মোট ওজনের ৮-৩% হারে ভাসমান বা ডুবন্ত খাবার দিতে হবে। মোট খাবারের অর্ধেক সকালে এবং বাকি অর্ধ্যেক বিকালে প্রয়োগ করতে হবে। খাবার পুকুরের নির্ধারিত স্থানে, নিদিষ্ট সময়ে দিতে হবে। বড় পকুর হলে খাবার একাধিক স্থানে দিতে হবে। ভাসমান খাবার দেয়ার ক্ষেত্রে যে পরিমাণ খাবার মাছ খাচ্ছে সে পরিমাণ খাবার দিতে হবে।

খাবার প্রদান পদ্ধতিঃ পাংগাস মাছের পুকুরে বিভিন্নভাবে খাবার প্রয়োগ করা যেতে পারে। সাধারণত বেশিরভাগ পুকুরে, পুকুরের পাড় হতে পানিতে খাবার ছিটিয়ে প্রয়োগ করা হয়। পাংগাস মাছ খাবারের প্রতি খুব দ্রুত সাড়া দেয় এবং সকলে এক সাথে খাবার গ্রহণে প্রতিযাগিতায় লিপ্ত হয়। মাছ চাষের পুকুর বড় হলে পুকুরের একটি পাড় বরাবর খাবার দেয়া যেতে পারে।

অটোফিডারঃ যাদের পুকুরে বিদ্যুতের সংযোগ নেয়া সম্ভব তাঁরা অটোফিডার ব্যবহার করতে পারেন। এখানে একটি খাবার ধারণ করার পাত্র থাকে এবং ইলেকট্রনিক যন্ত্র থাকে যাতে নির্দেশনা দিয়ে রাখা যায় কত সময় পরে কি হারে কতটুকু খাবার মেশিন পুকুরে ছিটিয়ে প্রয়োগ করবে। মেশিন নির্দিষ্ট সময় অন্তর নির্দিষ্ট পরিমাণ খাবার পুকুরের একটি বড় অংশে ছিটিয়ে দেয়। এতে বিদ্যুতের খরচ বাড়লেও শ্রমিক কম লাগে।

নৌকা বা ভাসমান যানে খাদ্য প্রয়োগঃ পাংগাস মাছ চাষের পুকুর বড় আকারের হলে নৌকায় প্রয়োজনীয় খাদ্য নিয়ে পুকুরের মাঝ বরাবর খাবার ছিটিয়ে প্রয়োগ করা যেতে পারে। এটিও একটি ভাল পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে মাছের খাদ্য গ্রহণে প্রতিযোগিতা কম হবে। পুকুরের পাড়ের ক্ষতি হবে না।

নুমায়ন ও খাবারের পরিমাণ নির্ধারণঃ মাছচাষে কিছু মাছ ধরে মাছের গড় ওজন বের করে সমস্ত মাছের ওজন (Biomass) বের করে খাবারে পরিমাণ সমন্বয় করা প্রয়োজন। পাংগাস মাছের ক্ষেত্রে প্রতি ১৫-২৫ দিন অন্তর করা যেতে পারে। সঠিকভাবে নমুনায়নের জন্য মোট মাছের ১০% মাছ ধরে নমুনায়ন করতে হবে। মোট ওজন বের করার ক্ষেত্রে ৯০% বাঁচার হার ধরতে হবে। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে নমুনায়নে উক্ত পরিমাণ মাছ ধরা কঠিন হয়। পাংগাস মাছের ক্ষেত্রে মজুদকৃত মাছ থেকে ৫০-১০০টি মাছ ধরে নমুনায়ন করা যেতে পারে।
খাদ্য প্রয়োগে নিম্নবর্ণিত সতর্কতা অবলম্বন করতে হবেঃ

- প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাদ্য দেয়া যাবে না;
- খাদ্যে ছত্রাক হয়ে গেলে বা পঁচা এবং মেয়াদউত্তীর্ণ খাদ্য পুকুরে দেয়া যাবে না;
- বৃষ্টির দিনে খাবার কমিয়ে দিতে হবে;
- খাদ্য সংরক্ষণ স্থানে পর্যাপ্ত আলো বাতাস প্রবেশের ব্যবস্থা থাকতে হবে;
- পুকুরে প্রতিদিন একই স্থানে একই সময়ে এবং পরিমিত পরিমাণ খাবার দিতে হবে;
- খাবার অপচয় হলে তা পুকুরের পানির পরিবেশ নষ্ট করবে এবং পরিণতিতে মাছের নানা প্রকার সমস্যা সৃষ্টি করবে;
- পাংগাস মাছের সাথে অন্য প্রজাতির মাছ থাকলে ভাসমান খাবারের সাথে কিছু ডুবন্ত খাবার দেয়া যেতে পারে;
- খাবার পরিবর্তনের প্রয়োজন হলে তা করতে হবে ধাপে ধাপে। কারণ নতুন খাবারের স্বাদ বা গন্ধ একই রকম হবে না। মাছ খাদ্যের ঘ্রাণ, স্বাদ, আকার এবং খাদ্য প্রয়োগের সময় উৎপন্ন সাড়া অত্যন্ত প্রখরভাবে অনুসরণ করে। এ কারণে আগের প্রদত্ত খাবারের সাথে আংশিক মিশিয়ে ২-৩ দিন সময় নিয়ে খাদ্য পরিবর্তন করতে হবে। খাদ্যের আকার পরিবর্তনের সময়ও একই পদ্ধতি অনুসরণ করা ভালো।

সার প্রয়োগঃ

সাধারণত পাংগাস মাছ অধিক ঘনত্বে চাষ করা হয় এবং প্রতিদিন প্রচুর খাবার পুকুরে দিতে হয়। মাছ সে খাবার গ্রহণ করে পুকুরের পানিতে মল ত্যাগ করে এবং উচ্ছিষ্ট খাবারও পুকুরের তলদেশে জমা হয়ে পানির পুষ্টি বাড়িয়ে দেয়। এর ফলে পুকুরে সার প্রয়োগ ছাড়াই পানি ক্রমান্বয়ে সবুজ থেকে গাড় সবুজ হয়ে যায়। পানির পরিবশে ভালো রাখায় অনেক সময় কঠিন হয়ে পড়ে। কোন কারণে সার ব্যবহার করতে হলে কেবল অজৈব সার (ইউরিয়া ও টিএসপি) পুর্বে উল্লেখিত মাত্রায় ব্যবহার করতে হবে।

মাছ আহরণ ও বাজারজাতকরণ

উপরে বর্ণিত পদ্ধতিতে নিয়মিত পুকুরে খাদ্য এবং পরিচর্যা চালিয়ে গেলে ৫-৬ মাস বয়সে গড়ে মাছের আকার ১ কেজি হয়ে যাবে। এ আকারের মাছ বাজারজাত করার জন্য উপযুক্ত হয়। মাছ বাজারজাত করার সময় মাছের বাজার দর বিবেচনায় রাখতে হবে। মাছ আহরণের পূর্ব দিনে পুকুরে কোন প্রকার খাদ্য প্রয়োগ করা যাবে না। এতে আহরিত মাছ অনেক বেশি সময় সতেজ থাকে এবং মাছ Unwanted Flavour হতে মুক্ত থাকা যায়। পাংগাস মাছ জীবন্ত অবস্থায় বিক্রয় করা যায়। প্লাস্টিকের ড্রামে বড় ছোট (Grading) আলাদা করে বিক্রয় করা উত্তম। বাজারে প্রেরণের সময় পরিবহন পাত্রে অধিক ঘনত্বে পরিবহন না করাই ভাল। কারণ মাছ আঘাত প্রাপ্ত হলে বেশি সময় সজীবতা থাকে না এবং মাছের গাঁয়ের রং নষ্ট হয়ে যায়।

পাংগাস মাছ চাষের লাভ ক্ষতি বিশ্লেষণ

বাণিজ্যিকভাবে মাছ চাষের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে অল্প ব্যয়ে অধিক মুনাফা অর্জন করা। কাজেই সকল প্রকার মাছ চাষের বেলায় আয় ব্যয়ের হিসাব নিরুপণ করা অতীব জরুরী কাজ। কিন্তু আমাদের দেশের অধিকাংশ চাষি আয় ব্যয়ের হিসাব সঠিকভাবে করেন না। পাংগাস মাছের একক চাষের আয় ব্যয়ের নমুনা হিসাব (জলায়তন ৫০ শতাংশ):

ক্র.নং	উপকরণের বিবরণ	পরিমাণ	একক দর	মোট খরচ	মন্তব্য
১.	সংস্কার			১৫,০০০.০০	
২.	চুন	১০০ কেজি	২০/-	২০০০.০০	
৩.	ইউরিয়া	১০ কেজি	২০/-	২০০.০০	

৪.	টিএসপি	১০ কেজি	৩০/-	৩০০.০০	
৫.	মাছের পোনা পাংগাস	৭৫০০টি	১০/-	৭৫০০০.০০	
৬.	কার্প	১৫০টি	৫/-	৭৫০.০০	
৭.	খাদ্য	১১৪৭৫ কেজি	৩৪/-	৩,৯০,১৫০.০০	
৮.	বিবিধ			১৫,০০০.০০	
			মোট খরচ	**৪,৯৮,৪০০.০০**	

উৎপাদন

পাংগাস মাছ (বাঁচার হার ৯০%, প্রতিটি কেজি) = ৬৭৫০ কেজি, মোট মূল্য ৬৭৫০ x ৯২ = ৬,২১,০০০.০০

কার্প জাতীয় মাছ (১০০ % বাচার হার) = ১৫০ কেজি, মোট মূল্য ১৫০ x ১৫০ = ২২,৫০০.০০

সর্বমোট = ৬,৪৩,৫০০.০০

নীট লাভ = (মোট আয় - মোট খরচ) = ৬,৪৩,৫০০.০০ - ৪,৯৮,৪০০.০০ = ১,৪৫,১০০.০০ টাকা।

কৈ মাছের চাষ

ভূমিকা

মিঠা পানির মাছচাষে বাংলাদেশের অবস্থান অন্যতম। নদীমাতৃক বাংলাদেশে ২৯৭ প্রজাতির মাছ পাওয়া যায়। তন্মধ্যে ১৫০ প্রজাতি হচ্ছে ছোট মাছ। ছোট মাছের মধ্যে কৈ মাছ পুষ্টিগুণ ও স্বাদে অতুলনীয়। বাংলাদেশের মাটি, আবহাওয়া ও জলবায়ু এ মাছ চাষের জন্য অত্যন্ত উপযোগী। জীবন্ত অবস্থায় কৈ মাছ বাজারজাত করা যায় বিধায় এ মাছের বাজার মূল্য তুলনামূলক বেশি। যে কোন ধরণের জলাশয়ে এমনকি চৌবাচ্চা ও খাঁচাতেও এ মাছ চাষ করা যায়। মৎস্য বিজ্ঞানীদের নিরলস গবেষণার মাধ্যমে প্রনোদিত প্রজনন, পোনা উৎপাদন ও চাষ পদ্ধতি সফলতা লাভ করায় মূল্যবান এ মাছটি বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করা সম্ভব হয়েছে।

সাধারণ নাম ঃ কৈ মাছ

ইংরেজি নাম ঃ Climbing Perch

বৈজ্ঞানিক নাম ঃ *Anabas testudineus*

মাছের বৈশিষ্ট্যঃ

এ মাছের মাথা বড় ও প্রায় ত্রিকোনাকৃতি। দেশী কৈ এর বর্ণ কালচে সবুজ বা বাদামি সবুজ। দেহ আঁশ দিয়ে ঢাকা। দুটো চোয়ালেই দাঁত আছে। পৃষ্ঠ ও বক্ষপাখনা ধারালো কাঁটা যুক্ত। কৈ মাছ কানকো দিয়ে শুকনায় চলাফেরা করতে পারে। কানকোর পিছনে কালো ফোটা বিদ্যমান। অতিরিক্ত শ্বসণ অঙ্গের কারণে এরা বাতাস থেকে অক্সিজেন নিয়ে শ্বাসকার্য চালায়।

প্রাপ্তি স্থান/বাসস্থানঃ

বাংলাদেশ, ভারত, নেপাল, শ্রীলংকা, মায়ানমার, ভিয়েতনাম, প্রভৃতি দেশে কৈ মাছ পাওয়া যায়।

আবাসস্থল ও প্রাকৃতিক প্রজননঃ

কৈ মাছ মুক্ত জলাশয় বা প্লাবনভূমির মাছ। বর্ষাপ্লাবিত ধানক্ষেত, খাল-বিল, ডোবা নালা ইত্যাদি জলাশয়ে কৈ মাছ দেখা যায়। দেশের সব অঞ্চলে কৈ মাছ দেখা যায়। তবে, গোপালগঞ্জ জেলার চান্দার বিল, মাদারীপুর জেলার বাঘিয়ার বিল, পাবনা, নাটোর ও নওগাঁর চলন বিল কৈ মাছের জন্য বিখ্যাত। অনেক পুরাতন বা মজা পুকুরের ঝোঁপঝাড়, জঙ্গল অথবা কচুরী পানার শিখড়ে ও কাদায় এদের বসবাস। জলাশয়ের নিচের স্তরে এরা বাস করে। বৈশাখ জৈষ্ঠ মাসে নতুন বৃষ্টি হলে এরা স্রোতের উজানে খাল বিল থেকে উঠে ধানক্ষেতের স্বল্প পানিতে ডিম দেয়। ডিম থেকে রেনু পোনা ১৫-২০ দিনে পরিণত পোনায় উপনীত হয়ে আবার খাল-বিল, ডোবা-নালায় বিস্তার লাভ করে।

খাদ্যাভাসঃ

কৈ মাছ সর্বভূক। জু-প্লাংকটন এর প্রধান খাদ্য। এরা ছোট অবস্থায় অতিক্ষুদ্র জলজ প্রাণী ও কীট পতঙ্গ খায় এবং বড় হলে পতঙ্গ ও তাদের শুককীট, শৈবাল, পোকা মাকড় পঁচা জৈব পদার্থ ইত্যাদি খায়।

অর্থনৈতিক গুরুত্বঃ

কৈ মাছ পুষ্টি গুণে ভরপুর। প্রতি ১০০ গ্রাম মাছে আমিষের পরিমাণ ১৪.৮ গ্রাম। এরা দ্রুত বর্ধনশীল এবং স্বল্প সময়ে জীবন্ত বাজারজাত করা যায় বলে এ মাছের বাজার মূল্য অধিক ও চাহিদা ব্যাপক। রোগীর পথ্য হিসেবেও এ মাছ অধিক পরিচিত।

দৈহিক বৃদ্ধিঃ কৈ মাছ স্বল্প সময়ে বাজারজাত করা যায়। নিয়মিত সম্পূরক খাদ্য দিলে ৪-৬ মাসে দেশী কৈ ৫০-৬০ গ্রাম, থাই কৈ ১০০-১২৫ গ্রাম এবং ভিয়েতনামী কৈ ২০০-২৫০ গ্রাম পর্যন্ত হতে পারে।

চাষ ব্যবস্থাপনা

পুকুর নির্বাচনঃ

পুকুর নির্বাচনের উপর কৈ মাছের উৎপাদন ও আয় অনেকাংশে নির্ভরশীল। স্থান, মাটির গুণাগুণ, পুকুরের গভীরতা, আকার আয়তন, তলার প্রকৃতি, পাড়ের ঢাল, কাদার প্রকৃতি ইত্যাদি কৈ মাছ উৎপাদন ও আহরণের উপর প্রভাব বিস্তার করে। সাফল্যজনকভাবে কৈ মাছ চাষের জন্য নির্বাচিত পুকুরের বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নরুপ হওয়া ভাল:

- **মাটি:** যে কোন মাটির পুকুরে কৈ মাছ চাষ করা যায়, তবে দো-আঁশ মাটি উত্তম।
- **মজুদ পুকুরের আকার:** আয়তকার হলে ভাল।
- **জলায়তন:** ব্যবস্থাপনার সুবিধার্থে ছোট থেকে মাঝারি পুকুর কৈ চাষের জন্য উত্তম।

তলা সমান ও কাদা কম হলে জাল টানা ও মৎস্য আহরণ সহজ হবে।

- পুকুর পাড়ের পূর্ব-দক্ষিণ দিকে বড় গাছপালা না থাকা উত্তম।
- পাড় উঁচু ও শক্ত হলে ভাল এবং পানি নির্গমন ও নিষ্কাশনের ব্যাবস্থা থাকা উত্তম।

পুকুরের ঢালে (কিনারে) নিয়ন্ত্রিত মাত্রায় কিছু জলজ আগাছা রাখা যেতে পারে।

পুকুর প্রস্তুতি:

- কৈ মাছ চাষের জন্য পুকুর শুকানো উত্তম।
- পুকুর শুকানো সম্ভব না হলে শতক প্রতি ৩০-৪০ গ্রাম রোটেনন প্রয়োগ করে অনাকাঙ্খিত মাছ ও প্রাণী দূর করা।
- কালো কাদা অপসারণ, তলা সমান ও পাড় মেরামত করতে হবে।
  ব্লিচিং পাউডার- শতাংশ প্রতি ১৫-২০ গ্রাম ব্লিচিং পাউডার প্রয়োগ করে রোগ জীবাণু নির্মুল।

- **ব্লিচিং পাউডার অবশ্যই গুলে ছিটাতে হবে।**
- **খোলা ব্লিচিং পাউডার ক্রয় ও ব্যবহার থেকে বিরত থাকুন।**

- **চুন প্রয়োগ:** কৈ মাছ চাষের জন্য চুন একটি অত্যাবশ্যকীয় উপকরণ। পুকুর প্রস্তুতি থেকে শুরু করে মজুদ পরবর্তী ব্যবস্থাপনা, রোগবালাই প্রতিরোধ ও প্রতিকার প্রতিটি ধাপে এর প্রয়োগ অনিবার্য। পুকুরের মাটি ও পানির পিএইচ মান এবং রোগের লক্ষণ অনুযায়ী চুন প্রয়োগের মাত্রা নির্ধারণ করা হয়। পুকুর প্রস্তুতির ধাপে শতাংশ প্রতি ১ কেজি হারে চুন প্রয়োগ করা হয়।

- **সার প্রয়োগ:** সাধারণত প্রাথমিক উৎপাদনশীলতা (ফাইটোপ্লাংকটন) বৃদ্ধির জন্য সার প্রয়োগ করা হয়। সার প্রয়োগের অন্যতম কারণ হচ্ছে প্রাথমিক উৎপাদকের (ফাইটোপ্লাংকটন) জন্য অত্যাবশ্যকীয় পুষ্টি উপাদান-নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও পটাসিয়াম (NPK) সরবরাহ করা যা জৈব ও অজৈব উৎস (সার) থেকে পাওয়া যায়। বর্ণিত উপাদানসমূহ শুকনো পুকুরের কাদা থেকেও স্বয়ংক্রিয়ভাবে অবমুক্ত হয় বিধায় পুকুর শুকানোর পরে সার প্রয়োগের প্রয়োজন হয় না। তবে পুকুর শুকানো সম্ভব না হলে প্রাথমিক উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য শতাংশ প্রতি ২০০ গ্রাম চালে কুড়া, ১০০ গ্রাম চিটাগুড় এবং ১ গ্রাম বেকারী ইষ্ট মিশিয়ে ইষ্ট মোলাশিস তৈরী করে প্রয়োগ করা যেতে পারে। উল্লেখ্য যে, জৈব সারের উৎস হিসেবে গোবর অথবা মুরগীর বিষ্ঠা প্রয়োগ একেবারে নিষিদ্ধ। কারণ এগুলি মাছের রোগ বিস্তারের সহায়ক, জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশের জন্য মারাত্মক হুমকি এবং নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনের অন্তরায়।

ইষ্ট মোলাশিস প্রস্তুত ও প্রয়োগঃ

একটি পাত্র বা ড্রামে প্রয়োজনীয় চালের কুড়া, চিটা গুড় ও বেকারী ইষ্ট একত্রে মিশিয়ে পানি দিয়ে ডুবিয়ে রাখুন।

২৪ ঘন্টা পর উপরের স্বচ্ছ পানি পুকুরে ঢেলে দিন এবং সমপরিমাণ পানি দিয়ে ড্রাম ভরুন।

পরবর্তী ৪৮ ঘন্টা পর ড্রামের সমুদয় দ্রব্য (ইষ্ট মোলাশিস) পুকুরে প্রয়োগ করুন।

- পুকুরের চার পার্শ্বে নিরাপত্তা বেষ্টনী/বেড়া/জাল স্থাপন: জৈব নিরাপত্তা এবং কৈ মাছের পলায়নপরতা রোধকল্পে ৩ থেকে ৪ ফুট উঁচু বাঁশের বেড়া অথবা ঘন ফাঁসের জাল স্থাপন করতে হবে।

- পোনা মজুদের ২ দিন পূর্বে শতাংশ প্রতি ৪০০ গ্রাম জিওলাইট ৫ মি.লি. এ্যামোনিয়া গ্যাস নিরোধক দ্রব্য এবং ৩ গ্রাম হারে জীবাণুনাশক প্রয়োগ করলে ভাল ফলাফল পাওয়া যায়। পোনা ছাড়ার ২-৩ ঘণ্টা পূর্বে সোডিয়াম পারকার্বনেট প্রয়োগ করে পানি অক্সিজেন সমৃদ্ধ করা যায়। উল্লেখ্য যে জিওলাইট পুকুরের অর্ধ ঝুলন্ত (Suspended Material) পদার্থের তলানী ফেলে মাছের খাদ্য গ্রহণ সহজ করে।

পোনা সংগ্রহ, পরিবহন ও মজুদ: সার প্রয়োগের ৩-৪ দিন পর পোনা মজুদ করা যেতে পারে। স্থানীয় হ্যাচারী/নার্সারী/খামার থেকে সুস্থ সবল উন্নতজাতের পোনা মাছ সংগ্রহ করা যেতে পারে। পরীক্ষিত ও বিশ্বস্ত হ্যাচারী/খামার থেকে পোনা সংগ্রহ করা উত্তম। দুই পরতের পলিথিন ব্যাগে অক্সিজেন দিয়ে পোনা পরিবহন করা যেতে পারে। একক চাষে ১০০০-১৫০০টি কৈ পোনা অথবা ৮০০টি কৈ এর সাথে ৫০০টি শিং মাছের পোনা মজুদ করা যেতে পারে। খামারের উৎপাদনশীলতা, চাষির অভিজ্ঞতা ও আর্থিক স্বচ্ছলতা এবং স্থানীয় খামারীদের বর্তমান প্রাকটিস এর ভিত্তিতে শতাংশ প্রতি ০.৫ থেকে ১ গ্রাম ওজনের ৮০০-১০০০টি কৈ মাছের পোনা মজুদ করা যেতে পারে। কৈ মাছের পোনা মজুদের ১ মাস পর ১০-১৫ গ্রাম ওজনের মনোসেক্স তেলাপিয়ার পোনা ১৫-২০টি ছাড়া যেতে পারে। এছাড়াও ৪-৫ ইঞ্চি আকারের সিলভার কার্প এর পোনা ৩-৪টি এবং ২-২.৫ ইঞ্চি আকারের শিং মাছের পোনা ৫০০টি মজুদ করা যেতে পারে। উল্লেখ্য যে, কৈ মাছ চাষের পুকুরের ফাইটোপ্লাংটন ব্লুম এবং জুপ্লাংটন এর আধিক্য নিয়ন্ত্রণের জন্য যথাক্রমে সিলভার কার্প এবং মনোসেক্স তেলাপিয়ার পোনা মজুদ করা হয়। ব্যয় সমন্বয় করার জন্যও উক্ত প্রজাতির মাছ অবদান রাখে।

খাদ্য ব্যবস্থাপনা:

কৈ মাছের একক অপেক্ষা মিশ্র চাষ উত্তম, লাভজনক ও ব্যয় স্বাশ্রয়ী।

পানির ভৌত রাসায়নিক গুনাগুণ যেমন পিএইচ তাপমাত্রা অক্সিজেন ইত্যাদির উপর খাদ্য গ্রহণের মাত্রা নির্ভর করে। নিবিড় মাছ চাষে সম্পূরক খাদ্যের ব্যবহার অতীব গুরুত্বপূর্ণ। কৈ মাছ চাষে ৩০-৩৫% আমিষ সমৃদ্ধ পিলেট খাদ্য নিম্নের ছক অনুযায়ী সকাল, দুপুর ও বিকেল বেলা প্রয়োগ করা যেতে পারে। প্রতি ১০-১৫ দিন পর পর নমুনায়ন করে মাছের বৃদ্ধি পর্যবেক্ষণ করে খাদ্য সমন্বয় করা যেতে পারে।

কৈ মাছের খাদ্য প্রয়োগের তালিকা (প্রতি শতাংশে):

দিন	দৈহিক ওজন (গ্রাম)	খাদ্য প্রয়োগের হার (%)	খাদ্যের নাম (গ্রাম)
১-৯	১	২০	নার্সারি-২
১০-১৯	৪	১৫	নার্সারি-২
২০-২৯	৭	১২	নার্সারি-২
৩০-৩৯	১২	১০	স্টার্টার
৪০-৪৯	২০	৮	স্টার্টার
০-৫৯	২৮	৭	ক্রামবল
৬০-৬৯	৩৮	৬	ক্রামবল
৭০-৭৯	৫২	৫	গ্রোয়ার
৮০-৮৯	৬৫	৪.৫	গ্রোয়ার
৯০-৯৯	৮০	৪	গ্রোয়ার
১০০-১২০	১০০	৩.৫	ফিনিসার

- উচ্চ আমিষসমৃদ্ধ খাদ্য প্রয়োগের পাশাপাশি এ্যারেটর/পানির ঝর্ণা দিয়ে অক্সিজেন বাড়িয়ে খাদ্যের পরিপাক ক্রিয়া (Digestibility) বৃদ্ধি করুন। অন্যথায় উচ্ছিষ্ট খাদ্যের পচন ক্রিয়ায় মাছ মারা যেতে পারে।
- খাদ্য গুদামের মেঝে শুকনা রাখুন।
- পর্যাপ্ত আলো বাতাসের ব্যবস্থা রাখুন।
- খাদ্য ও খাদ্য উপকরণ কুকুর, বিড়াল, ইঁদুর, তেলাপোকার নাগালের বাহিরে রাখুন।

মাছ আহরণ ও বাজারজাতকরণ: কৈ মাছ ৪-৫ মাসের মধ্যে বিক্রয় যোগ্য হয়। সঠিক ঘনত্বে পোনা মজুদ এবং নিয়মিত আমিষ সমৃদ্ধ খাবার দিলে ৪-৫ মাসে দেশী কৈ মাছ ৫০-৬০ গ্রাম, থাই কৈ ১০০-১২৫ গ্রাম এবং ভিয়েতনামী কৈ ২০০-২৫০ গ্রাম পর্যন্ত হতে পারে। এ সময় জালটেনে অথবা পুকুর শুকিয়ে সমুদয় মাছ ধরা যেতে পারে।

আয় ব্যয়ের হিসাব:

৫০ (পঞ্চাশ) শতক পুকুরে কৈ (থাই কৈ) মাছ চাষের (এক ফসল) ব্যয়ের হিসাব:

ক্রমিক নং	বিবরণ/ব্যয়ের খাত	সংখ্যা/পরিমান	একক মুল্য (টাকা)	মোট মুল্য (টাকা)
১.	পুকুর ভাড়া (৬ মাসের জন্য)	৫০ শতক	থোক	১০,০০০.০০
২.	পুকুর সংস্কার/ প্রস্তুতি	৫০ শতক	থোক	২,০০০.০০
৩.	চুন	৫০ কেজি	১৫.০০	৭৫০.০০
৪.	**পোনা-** ক. কৈ মাছের পোনা (০.৫-১ গ্রাম) খ. মনোসেক্স তেলাপিয়া গ. সিলভার কার্প এর পোনা ঘ. শিং মাছের পোনা	৪০,০০০টি ১,০০০টি ২৫০টি ২৫০০০টি	০.৮০ ২.০ ৩.০ ১.৫০	৩২,০০০.০০ ২,০০০.০০ ৭৫০.০০ ৩৭,৫০০.০০
৫.	সম্পূরক খাদ্য (৩৫% প্রোটিন, FCR -১.২)	৪,৬৯২ কেজি	৪৫.০০	২,১১,১৪০.০০
৬.	শ্রমিক মজুরী, জালটানা ইত্যাদি	থোক	থোক	১০,০০০.০০
৭.	অন্যান্য ব্যয়	থোক	থোক	৫,০০০.০০
			উপমোট ব্যয়	**৩,১১,১৪০.০০**
			ব্যাংক ঋনের উপর ৮% হারে সুদ	**২৪,৮৯১.০০**
			সর্বমোট ব্যয়	**৩,৩৬,০৩১.০০**

উৎপাদন ও আয়:

পোনা মজুদ (সংখ্যা)	মৃত্যু হার (আনুমানিক)	বেঁচে থাকা মাছের সংখ্যা	গড় ওজন (গ্রাম)	মোট ওজন (কেজি)	একক মুল্য	মোট মুল্য (টাকা)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
কৈ মাছ- ৪০,০০০টি মনোসেক্স তেলাপিয়া-১,০০০টি সিলভার কার্প - ২৫০টি শিং মাছের পোনা- ২৫,০০০টি	২০% ১০% ১০% ১০%	৩২,০০০টি ৯০০ টি ২২৫ টি ২২,৫০০টি	৮০ ২৫০ ৫০০ ৫০	২,৫৬০ ২২৫ ১১২.৫ ১১২৫	১৩০.০০ ৮০.০০ ৮০.০০ ৪০০.০০	৩,৩২,৮০০.০০ ১৮,০০০.০০ ৯,০০০.০০ ৩,৩৭৫০০.০০
					সর্বমোট মাছ = ৪,০২২ কেজি	**৬,৯৭,০০০.০০**

নীট আয়: আয়- ব্যয়= ৬,৯৭,০০০.০০ - ৩,৩৬,০৩১.০০ = ৩,৬০,৯৬৯.০০ টাকা।

শিং মাছের চাষ

ভূমিকা

আমাদের দেশে বিগত কয়েক দশকে রুই জাতীয় মাছসহ বেশ কয়েকটি বিদেশী প্রজাতির মাছ পরিকল্পিতভাবে চাষের আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে। দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছের মধ্যে কৈ, শিং, মাগুর, টেংরা, পাবদা সকলের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয় সুস্বাদু মাছ হিসাবে সমাদৃত। প্রাকৃতিক জলাশয়ের সুস্বাদু ছোট আকারের নানা প্রজাতির মাছ আর আগের মত পাওয়া যায় না। প্রাকৃতিক জলাশয়ে অন্যান্য ছোট প্রজাতির মাছের ন্যায় শিং মাছের প্রাচুর্যতা ক্রমহ্রাসমান। দেশের প্রাণিজ আমিষের তথা পুষ্টির চাহিদা পূরণে এধরনের ছোট মাছের গুরুত্ব অপরিসীম। শিং মাছের পরীক্ষামূলক চাষ প্রাথমিকভাবে পাংগাসের সাথি ফসল হিসাবে শুরু হয়। চাষ লাভজনক হওয়ায় প্রতিনিয়ত এ মাছ চাষের পুকুরের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। কেবল চাষের পুকুরের সংখ্যায় যে বৃদ্ধি পাচ্ছে তা নয়, চাষের নিবিড়তাও (Intensification) বাড়ছে। এ মাছের পোনা উৎপাদন পদ্ধতিও বেশ সহজ হওয়ায় বেসরকারী পর্যায়ে স্থানীয় হ্যাচারি মালিকগণ পর্যাপ্ত পোনা মাছ উৎপাদন করে এ মাছ চাষে বিশাল ভূমিকা রাখছে।

শিং মাছের পুষ্টিমান

শিং মাছের পুষ্টিগুণ অন্যান্য মাছের তুলনায় অনেক বেশি এবং খেতে খুবই সুস্বাদু। রোগ মুক্তির পর স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য রোগীর পথ্য হিসেবে এ মাছ সমাদৃত। এ মাছের আমিষ সহজ পাচ্য ও কাটা নরম হওয়ায় সহজেই হজম হয় এবং শরীর গঠন ও রক্ষণাবেক্ষণে সহায়তা করে। বিভিন্ন সমীখ্যায় দেখা গেছে ভিটামিন ‘এ’ এর অভাবে প্রতি বছর ৩০ হাজারের অধিক শিশু রাতকানা রোগে আক্রান্ত হয়। গ্রামীণ মানুষের শতকরা ৫৭ ভাগ প্রয়োজনীয় ভিটামিন ‘এ’ এর অভাবে, ৮৯ ভাগ ‘আয়রন’ এর অভাবে, ৮০ ভাগ ‘ক্যালশিয়ামের’ এর অভাবে এবং ৫৩ ভাগ রক্ত শূন্যতায় ভূগছে। এ মাছে উচ্চ মাত্রায় আমিষ, ভিটামিন, ক্যালশিয়াম ও অন্যান্য মাইক্রো-নিউট্রিয়েন্ট থাকে। মাছের মধ্যে শিং মাছেই সর্বোচ্চ পরিমাণে ফসফরাস পাওয়া যায়। শিং মাছে আমিষের পরিমাণ ২২.৮%, ক্যালসিয়াম ০.৬৭% এবং ফসফরাস ০.৬৫%।

শিং মাছের সাধারণ পরিচিতি ও জীববিদ্যা

- শিং মাছের এর বৈজ্ঞানিক নাম *Heteropneustes fossilis* এবং ইংরেজি নাম Stinging Cat fish;
- শিং মাছ এক বছরেই পরিপক্বতা লাভ করে এবং প্রজননক্ষম হয়। স্ত্রী মাছ পুরুষ অপেক্ষা আকারে বড় হয়;
- শিং মাছ বছরে একবার প্রজনন করে। এ মাছের প্রজনন মৌসুম মে থেকে সেপ্টেম্বর তবে জুন-জুলাই মাসে সর্বোচ্চ মাত্রায় প্রজনন করে থাকে;
- এরা প্রাকৃতিক পরিবেশে অগভীর ঝোঁপ-ঝাড় জাতীয় উদ্ভিদযুক্ত এলাকা, ধানক্ষেত, পাটক্ষেত ইত্যাদি এলাকায় প্রজনন করে;
- এ মাছের নিষিক্ত ডিম আঠালো হয় এবং নিমজ্জিত আগাছা, তৃণ, ডাল-পালা ইত্যাদিতে লেগে থাকে;
- সাধারণতঃ ৪০ থেকে ১০০ গ্রাম ওজনের একটি শিং মাছের ডিম ধারণ ক্ষমতা ৮০০০-১০০০০টি।

আবাসস্থল

- শিং মাছের প্রধান আবাসস্থল হচ্ছে খাল-বিল, হাওর-বাওড় ও নিমজ্জিত ধানক্ষেত;
- এ মাছ কর্দমাক্ত মাটির তলায়, গর্তে, নিমজ্জিত গাছের গুড়ির তলায় বা সুড়ুঙ্গে বসবাস করে থাকে;
- শিং মাছ আগাছা, দল, কচুরিপানা, পঁচা লতা-পাতা, ডাল-পালা যুক্ত জলাশয়ে স্বাচ্ছন্দে বসবাস করতে পারে;

সাধারণ বৈশিষ্ট্য

- এ মাছের দেহ লম্বা, সামনের দিক নলাকার, পেছনের দিক চাপা, আঁইশবিহীন এবং মাথার অংশ উপর-নিচে চ্যাপ্টা;
- দেহের রং ছোট অবস্থায় বাদামী লাল এবং বড় অবস্থায় ধূসর কালচে;
- মুখে চার জোড়া গোঁফ ও মাথার দুই পাশে বিষাক্ত দুটি কাঁটা থাকে;
- পৃষ্ঠ পাখনা ছোট ও গোলাকৃতি, পায়ু পাখনা বেশ লম্বা, পুচ্ছ পাখনা গোলাকৃতি বিশিষ্ট;
- এ মাছের এক জোড়া অতিরিক্ত শ্বাসযন্ত্র রয়েছে, যা দ্বারা প্রতিকুল পরিবেশে বাতাস হতে অক্সিজেন গ্রহণ করে শ্বসন কাজ চালাতে পারে;
- এরা সাধারণত: ২০-৩০ সেমি. লম্বা হয় এবং ৩০০ গ্রাম পর্যন্ত ওজনের হয়ে থাকে।

খাদ্য ও খাদ্যাভ্যাস

শিং মাছ নিশাচর (Nocturnal) প্রাণী এরা রাত্রে খাবার গ্রহণের জন্য বিচরণ করে। এ মাছ সর্বভূক, প্রাকৃতিক উৎসে সাধারণত জলাশয়ের তলদেশের খাদ্য খায়। এছাড়া শিং মাছ তাদের জীবনচক্রের সকল পর্যায়ে তৈরী খাবারও খেয়ে থাকে। তবে তাদের জীবনচক্রের বিভিন্ন পর্যায়ে খাদ্য গ্রহণে কিছুটা পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। যেমন-

- ❖ রেণু পর্যায়েঃ ক্ষুদ্র জলজ প্রাণিকণা (জুপ্ল্যাঙ্কটন) ও পোকা-মাকড়, আর্টেমিয়া, টিউবিফেক্স ইত্যাদিও এদের আকর্ষণীয় খাদ্য;
- ❖ কিশোর পর্যায়েঃ জুপ্ল্যাঙ্কটন ও ক্ষুদ্র জলজ পোকা-মাকড়, আর্টেমিয়া, টিউবিফেক্স ইত্যাদি;
- ❖ বয়োপাপ্ত অবস্থায়ঃ জলজ পোকা-মাকড়, বেনথোস, ক্ষুদ্র চিংড়ি ও মাছ, পঁচা জৈব দ্রব্যাদি।

শিং মাছ চাষের সুবিধা

আমাদের দেশেরে মানুষের খাদ্য ও পুষ্টি চাহিদা পূরণ এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে মাছের ভূমিকা অপরিসীম। সে কারণে কার্পজাতীয় মাছের পাশাপাশি শিং মাছসহ অন্যান্য মাছের বিজ্ঞান ভিত্তিক চাষ করার গুরুত্ব অপরিসীম। আরো যে সব কারণে শিং মাছ চাষ গুরুত্বপূর্ণ তা নিম্নে উল্লেখ করা হলঃ

- ❖ ছোট-বড় সকল জলাশয়ে অধিক ঘনত্বে একক ও মিশ্রচাষ পদ্ধতিতে এ মাছ চাষ করা যায়;
- ❖ অতিরিক্ত শ্বসন অঙ্গ থাকায় এ মাছ বাতাস হতে অক্সিজেন নিয়ে অনেক সময় ধরে বেচে থাকতে পারে;
- ❖ এমাছ অত্যন্ত পুষ্টিকর ও সুস্বাদু হওয়ায় এর বাজার চাহিদা এবং বাজার মূল্য অনেক বেশি;
- ❖ শিং মাছ ৪-৭ মাস চাষে খাবার উপযোগী ও বাজারজাতকরণ করা যায়;
- ❖ জীবন্ত অবস্থায় দীর্ঘ সময় পর্যন্ত বাজারজাত করা যায় ফলে নিশ্চিতভাবে উত্তম মূল্য পাওয়া যায়;
- ❖ মাছটি রাক্ষুসে নয় বলে অন্য প্রজাতি মাছের সাথে মিশ্র চাষ করা যায়।

শিং মাছ চাষের পুকুরের উল্লেখযোগ্য ভৌত ও রাসায়নিক গুণাবলি

গভীরতাঃ শিং মাছের পানির গভীরতা ১.৫-৩.০ মিটার পর্যন্ত হতে পারে তবে ২.০ মিটার গভীরতায় শিং মাছ চাষ ভাল হয়;

পানির স্বচ্ছতাঃ শিং মাছের পুকুরের পানির স্বচ্ছতা ২০-৩০ সে.মি. হতে পারে তবে ২৫ সে.মি. স্বচ্ছতার পানিতে শিং মাছ চাষ ভালো হয়;

তাপমাত্রাঃ পুকুরের পানির তাপমাত্রা ২৫-৩২ ডিগ্রি সেলসিয়াসে শিং মাছ চাষ করা যায় তবে ২৮-৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াস চাষের জন্য উত্তম;

পিএইচঃ পুকুরের পানির পিএইচ ৬.৫.০-৯.০ এর মধ্যে থাকলে শিং মাছ চাষ করা যায়। তবে ৭.৫-৮.৫ মাত্রার পিএইচ চাষের জন্য উত্তম;

খরতা (Hardness)ঃ ৮০-২০০ মি.গ্রা/লিটার খরতায় শিং মাছ চাষ করা যায় তবে পানির খরতা ৭০-১০০ মি.গ্রা/লিটার শিং মাছ চাষের জন্য উত্তম;

দ্রবনীয় অক্সিজেন (DO)ঃ পুকুরের পানির দ্রবনীয় অক্সিজেন মাত্রা ৩-৮ মি.গ্রা./লি. এ শিং মাছ চাষ করা যায় তবে দ্রবনীয় অক্সিজেন এর মাত্রা ৫ মি.গ্রা./লি. শিং মাছ চাষের জন্য উত্তম;

কার্বন ডাই অক্সাইড(CO2)ঃ পুকুরের পানির কার্বন ডাই অক্সাইড মাত্রা ৫-১০ মি.গ্রা./লি. এ শিং মাছ চাষ করা যায় তবে কার্বন ডাই অক্সাইড ৫ মি.গ্রা./লি. শিং মাছ চাষের জন্য উত্তম;

অ্যামোনিয়া (NH3)ঃ পুকুরের পানিতে ০.০৫মি.গ্রা./লি. এর বেশী অ্যামোনিয়া থাকলে শিং মাছের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর ০.১ মি.গ্রা./লি. এর বেশী অ্যামোনিয়া হলে মাছ মারা যেতে পারে;

নাইট্রাইট নাইট্রোজেনঃ পানিতে ০.১ মি.গ্রা./লি. এর যত কম হয় তত ভাল;

নাইট্রেড নাইট্রোজেনঃ পানিতে ২০ মি.গ্রা./লি. এর যত কম হয় তত ভাল;

হাইড্রোজন সালফাইড গ্যাস (H2S)ঃ পানিতে ০.০৫ মি.গ্রা./লি. এর যত কম হয় তত ভাল;

আয়রণঃ পানিতে ০.২ মি.গ্রা./লি. এর যত কম হয় তত ভাল;

ফসফরাসঃ পানিতে ০.২ মি.গ্রা./লি. এর যত বেশী হয় তত ভাল;

লবনাক্ততাঃ পানিতে ৩ পিপিটি এর চেয়ে যত কম লবনাক্ততা থাকবে তত ভাল।

মজুদ-পূর্ব ব্যবস্থাপনা

পুকুর প্রস্তুতি

পুকুর নির্বাচনের ওপর শিং মাছ চাষের সফলতা অনেকাংশে নির্ভর করে। লাভজনকভাবে শিং মাছ চাষ করতে হলে পুকুর নির্বাচনের ক্ষেত্রে অন্যান্য মাছ চাষের পুকুর নির্বাচনের ন্যায় সাধারণ প্রতি খেয়াল রাখতে হবে। তবে পানির গভীরতা কমে গেলে সূর্যের আলো পুকুরের তলদেশে পৌছিলে শিং মাছ অস্বস্তিতে পড়ে এবং রোগে আক্রান্ত হতে পারে। এজন্য পুকরের পানির গভীরতা ন্যুনতম ১.৫মিটার হতে হবে এবং প্রয়োজনে পানি সরবরাহের ব্যবস্থা থাকলে ভাল হয়। শিং মাছের পুকুরে তলায় কিছুটা কাদা (১০-১৫ সে.মি) থাকা প্রয়োজন তবে অধিক কাদা ভাল নয়। একারণে পুরাতন পুকুরে শিং মাছ চাষ সুবিধাজনক তবে নতুন পুকুরের তলদেশে জৈব পদার্থ বৃদ্ধির জন্য সরিষার খৈল প্রয়োগ করে চাষ দিয়ে মাটি নরম করে দিলে ভাল ফল পাওয়া যায়।

শিং মাছ চাষ ব্যবস্থাপনায় পুকুর প্রস্তুতকালীন সময়ে পুকুর সংস্কার করা অত্যন্ত জরুরী। মাছ চাষের সফলতা অনেকাংশে এর ওপর নির্ভর করে। পুকুর সংস্কারের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত কাজগুলো করতে হবে:

পাড় মেরামত: পুকরের পাড় এমন উচু করতে হবে যাতে স্বাভাবিক বর্ষায় ডুবে না যায়। পাড় ভাংগা থকলে শক্ত করে বেঁধে দিতে হবে। যাতে বাহিরের রাক্ষুসে ও অবাঞ্চিত মাছ পুকুরে প্রবেশ করতে না পারে। পাড়ে গর্ত থাকলে তা ভরে দিতে হবে। যাতে বাহিরের পানি চুঁয়ে পাড় ভেঙ্গে ফেলতে না পারে।

পাড়ের ঢাল মেরামত: পুকুর পাড়ের ঢাল ভাঙ্গা থাকলে বা ঢালের গায়ে গর্ত থাকলে মেরামত করতে হবে তা হলে পাড় সহজে ভাঙ্গবে না। পাড়ের ঢাল ১:২ অনুপাতে রাখা দরকার।

তলার অতিরিক্ত কাদা অপসারণ: পুকুরের তলায় ১০-১৫ সে.মি. এর বেশি কাদা থাকলে তা তুলে ফেলতে হবে। তলায় অতিরিক্ত জৈব পদার্থ থাকলে বিষাক্ত গ্যাস সৃষ্টি হতে পারে, সহজে হররা টানা যায় না ও অক্সিজেন সমস্যা হতে পারে।

মাছ আহরণের জন্য গভীর অংশ(Fish Catch Pit)তৈরি: শিং মাছ সহজে ধরার জন্য পুকুরের তলদেশ একদিকে ঢালু হতে হবে এবং পুকরের আয়তনের উপর নির্ভর করে (১০ x ১০ বর্গফুট আকারের) যেদিকে পুকুরটি ঢালু সেদিকে একটি তুলনামূলক গভীর অংশ সৃষ্টি করতে হবে।

পাড়ের বড় গাছের ডালপালা ছাটাই: যদি পুকুরের পাড়ে বড় গাছ থাকে এবং পুকুরের পানিতে ছায়া সৃষ্টি করে তবে, গাছের ডালপালা কেটে ফেলতে হবে।

পুকুর পাড়ের ঝোঁপঝাড় পরিস্কার করা: পুকুর পাড়ের ঝোঁপঝাড় কেটে পরিস্কার করতে হয়। এতে মৎস্যভূক প্রাণী যেখানে সেখানে লুকিয়ে থাকতে পারবে না।

পুকুর শুকানো: শিং মাছ চাষ সফলভাবে করার জন্য অবশ্যই পুকুর শুকাতে হবে। পুকুর শুকালে পুকরের তলদেশ উন্নয়ন করা যাবে এবং সকল ধরনের মাছ অপসারণ ঘটবে। পুকুরের তলদেশে জমে থাকা সকল ধরনের ক্ষতিকর গ্যাস দূর হবে এবং রোগজীবাণু ধবংশ হবে।

ব্লিচিং পাউডার: শিং মাছ চাষে ব্যাক্টেরিয়ার উপস্থিতি নানা প্রকার সমস্যার সৃষ্টি করে, এ জন্য পুকুর প্রস্তুতির সময় ব্লিচিং পাউডার (৩০% ক্লোরিন) প্রতি শতাংশে ২০০ গ্রাম হারে প্রয়োগ করে পুকুরের তলদেশ দূষণ মুক্ত করা প্রয়োজন। ব্লিচিং পাউডার প্রয়োগ করলে পুকুরে জলজ পরিবেশের বা পুকুরের তলদেশের মাটির সকল ক্ষতিকর ব্যাক্টেরিয়াকে ধবংশ করা যায়। পুকুর যদি শুকিয়ে প্রস্তত করা হয় তবে ব্লিচিং না দিলেও চলবে। তবে পুকুর শুকালে তলদেশ চাষ দিয়ে আলগা করে দিতে হবে।

চুন প্রয়োগ: মাছচাষে চুন প্রয়োগ অত্যাবশ্যক। চুন ক্যালশিয়াম সমৃদ্ধ অজৈব যৌগ যা এসিড মাধ্যমকে ক্ষারীয় বা নিরপেক্ষ করে মাছ চাষের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করে।

চুনের মাত্রা: পুকুর প্রস্তুতের সময় পুকুরের বিদ্যমান পিএইচ (Ph) মাত্রার ওপর বা তলদেশের কাদার পরিমাণের ওপর ভিত্তি করে শতাংশে ১-২ কেজি চুন প্রয়োগ করতে হবে। চুনের কার্যকারীতা ভাল পেতে সাদা চাকা পোড়া চুন (CaO) প্রয়োগ করতে হবে। পাউডার চুন বা কলি চুন (Ca (OH**2**) এর কার্যকারীতা কম।

চুন প্রয়োগ পদ্ধতি: শুকনা পুকুরের তলায় এবং পুকুরের ঢালে যে পর্যন্ত পানি উঠবে সে পর্যন্ত এবং পুকুরের তলদেশে পানিতে গুলানো চুন ভাল ভাবে ছিটিয়ে দিতে হবে। এ কাজটি বেলা ১১-১২ টার মধ্যে করতে হবে। মনে রাখতে হবে চুন বেশি সময় ধরে ভিজিয়ে রাখা যাবে না। এতে চুনের কার্যক্ষমতা কমে যেতে পারে। পুকুরের তলদেশে কাদা থাকলে মই দিয়ে বা কাঠের মোটা ডাল দিয়ে পকুরের তলদেশ নাড়িয়ে দিতে হবে যাতে চুন কাদার নীচে প্রবেশ করতে পারে।

সার প্রয়োগ: শিং মাছ চাষে সাধারণত: পুকুরে সার প্রয়োগ করার প্রয়োজন হয় না। তবে যেহেতু শিং মাছ সূর্যের আলো সহ্য করতে পারে না সে জন্য অগভীর তথা ৩-৪ ফুট গভীরতার পুকুরের ক্ষেত্রে সার প্রয়োগের মাধ্যমে প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদন করে শিং মাছের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করা যেতে পারে। সারের মাত্রা পুকুর ভেদে প্রতি শতাংশে ইউরিয়া ১০০-১৫০ গ্রাম এবং টিএসপি ১০০-১৫০ গ্রাম হারে প্রয়োগ করা যেতে পারে। পুকুরের পানির স্বচ্ছতা কমানোর জন্য বা প্রাকৃতিক খাদ্য তৈরির জন্য অনেক চাষি শিং মাছের পাউডার নার্সারি খাবার কিছুটা বেশি মাত্রায় পানিতে গুলে পুকুরে প্রয়োগ করে থাকেন। আবার শতাংশে ২০০-২৫০ গ্রাম হারে সরিষার খৈল ২-৩ দিন ভিজিয়ে জৈব সারে পরিণত করে পুকুরে প্রয়োগ করলে একই ভাবে প্রাকৃতিক খাবার তৈরি হবে।

পুকুরের চারিদিকে নিরাপত্তা বেষ্টনী স্থাপন: শিং মাছ চাষের ক্ষেত্রে পুকুর প্রস্তুতির গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল পুকুরের চারিদিকে নিরাপত্তা বেষ্টনী তৈরি বা ঘের দেওয়া। সাধারণত: ঘন ফাঁসের নাইলন জাল বা বাঁশের বানা দিয়ে বেড়া তৈরি করা যেতে পারে। বেষ্টনী তৈরি করার প্রধান উদ্দেশ্য হল অবাঞ্চিত মাছ, শিকারী ক্ষতিকর প্রাণী সাপ, ব্যাঙ, শিয়াল প্রভৃতিসহ অন্যান্য প্রাণীর প্রবেশ বন্ধ করা এবং বর্ষার সময় পরিপক্ক মাছ পাড় বেয়ে বেরিয়া যাওয়া বন্ধ করা। বেস্টনী স্থাপনের জন্য পুকুরের পাড়ের ওপর চতুর্দিকে ৬ ইঞ্চি গভীর গর্ত করে গর্তের মধ্যে ৮-১০ ফুট পর পর বাঁশের খুটি বা গাছের ডাল শক্ত করে

পুতে দিতে হবে। এর পর নাইলনের জাল দিয়ে পুকুর পাড়ের চতুর্দিকে ঘিরে দিতে হবে। পুকুরে পানি প্রবেশের আগে অথবা পানি প্রবেশের সাথে সাথে এ বেষ্টনী তৈরী করতে হবে।

পুকুরের ওপর বড় ফাঁসের জাল স্থাপন: শিং মাছ পুকুরে অধিক ঘনত্বে চাষ করা হয় এবং এদের সাধারণ বৈশিষ্ট্য হল পানির উপরের স্তরে এসে বাতাস থেকে অক্সিজেন গ্রহণ করা। মাছের এ ধরনের বৈশিষ্ট্যের কারণে সহজে শিকারী পাখির নজরে পড়ে। শিকারী পাখির হাত থেকে মাছ রক্ষার জন্য সমস্ত পুকুরের ওপর বড় ফাঁসের জাল স্থাপন করতে হয়। জাল ছাড়াও লম্বা শক্ত সুতা পুকুরে আড়াআড়ি জালের মত টেনে দিয়েও এ উদ্দেশ্য সাধন করা যেতে পারে। অন্যথায় প্রতিদিন শিকারী পাখি অনেক পরিমাণ মাছ খেয়ে ফেলবে এবং মাছ উৎপাদনে নেতিবাচক (Negative) প্রভাব ফেলবে এবং চাষি অধিক লাভ থেকে বঞ্চিত হবে।

মজুদকালীন ব্যবস্থাপনা

মাছ চাষের ধারাবাহিক কার্যক্রমের এ পর্যায়ে লাভজনক চাষ নিশ্চিত করার জন্য বিশেষ কিছু কার্যক্রম গ্রহণ করতে হয় যা নিম্নে আলোচনা করা হল।

পোনা সংগ্রহ ও পরিবহন

শিং ও মাগুর মাছের পোনা পরিবহন রুই জাতীয় মাছের পোনা পরিবহনের মত হলেও কিছুটা ভিন্নতা রয়েছে। এসব মাছ কাটাযুক্ত হওয়ায় বড় আকারের পোনা অক্সিজেন ব্যাগে পরিবহনের ক্ষেত্রে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়। শিং ও মাগুরের ছোট পোনা অক্সিজেন ব্যাগে পরিবহন করা উত্তম। শিং মাছের পোনার বয়স ৩০-৪০ দিন হলে তা মজুদ পুকুরে স্থানান্তর যোগ্য হয়। গুণগতমানসম্পন্ন পোনা নিশ্চিত করার জন্য পোনার উৎসের বিষয়ে ভালভাবে খোজ খবর নিতে হবে এবং ভাল জাতের সুস্থ-সবল পোনা সংগ্রহ করতে হবে। পোনা পরিবহনের ক্ষেত্রে প্রধানত এলুমিনিয়ামের পাতিল বা প্লাষ্টিকের ড্রাম ব্যবহার করা যেতে পারে। অনেক সময় প্লাষ্টিকের ড্রামে পরিমাণ মত পোনা অর্থাৎ ৫০ লিটার পানিতে ৫০০০ পোনা (৫-৬ ঘন্টা পরিবহনে) নিয়ে ড্রামের মুখ বন্ধ করে দেয়া হয়, এক্ষেত্রে ড্রামের মুখের ঢাকনি ছিদ্র করে বাতাস প্রবেশের ব্যবস্থা রাখা হয়। পোনা ভর্তি ড্রাম দূরে পরিবহনের সময় বাসের লাগেজ রাখার স্থানে রেখে পরিবহন করা যায়। কারণ শিং এবং মাগুর মাছের পোনা পরিবহনের সময় বাড়তি অক্সিজেন বা পানি আলোড়িত করার প্রয়োজন হয় না। পোনার ড্রামে কি পরিমাণ পোনা পরিবহন করা যাবে সেটা নির্ভর করে পোনার আকার এবং কতদূরে পোনা পরিবহন করা হবে তার উপর। অনেক বেশি সময় ধরে পোনা পরিবহনের ক্ষেত্রে পোনার সংখ্যা কমিয়ে নিতে হবে।

শিং মাছের পোনা পরিবহনে সতর্কতা

১) পুকুর থেকে পোনা পরিবহনের আগের দিন পুকুরে কোন খাদ্য দেয়া যাবে না। পোনা পরিবহনের পূর্বে অবশ্যই পোনা টেকসই করে নিতে হবে। এ জন্য পোনা পরিবহনের কয়েক ঘন্টা আগে পানির ফোয়ারা যুক্ত হাউজে রাখতে হবে। এ ভাবে পোনার পেট সম্পূর্ণ খাদ্যমুক্ত করা যায়। এ কাজটি পুকুরে হাপায় রেখেও করা যেতে পারে। পোনার পেট খালি না করলে পরিবহন পাত্রে মল ত্যাগ করে পাত্রের পানি দূষিত করে ফেলে এবং পোনার পরিবহন জনিত ধকল বেড়ে যেতে পারে এবং পোনার মৃত্যু হারও বেড়ে যেতে পারে। পোনা পরিবহনের সময় একই আকারের পোনা পরিবহন করা উত্তম।

২) শিং মাছের পোনা নার্সারি পুকুর থেকে ধরা বা কন্ডিশনিং হাউজ (Cistern) থেকে ধরার সময় বিশেষ সর্তকতা অবলম্বন করতে হবে কারণ এদের শরীরের ত্বক খুবই পাতলা। এজন্য এ পোনা নাড়া চাড়া (Handling) করার সময় কোন পর্যায়ে প্লাষ্টিকের ছিদ্র যুক্ত ঝাকা ব্যবহার করা যাবে না। এ ধরনের ঝাকা বেশ খস খসে এতে পোনা নাড়া চাড়া (Handling) করলে পোনার শরীরে ক্ষত সৃষ্টি হতে পারে। পরবর্তীতে সেখানে ব্যাক্টেরিয়া সংক্রমিত (Infection) হয়ে পোনার মৃত্যুহার বেড়ে যেতে পারে। শিং মাছের ক্ষেত্রে ব্যাক্টেরিয়া সংক্রমণ দ্রুত অন্যান্য মাছে ছড়িয়ে পড়ে। এ ক্ষত্রে মসৃন নাইলনের হাপা বা ষ্টিলের মসৃন গামলা ব্যবহার সব চেয়ে উত্তম।

৩) পোনা পরিবহনের সময় অধিক ঘনত্ব অবশ্যই পরিহার করতে হবে। পাত্রের পানি পরিবর্তনের সময় ক্রমান্বয়ে নতুন পানি যুক্ত করে পুরাতন পানি ফেলে দিতে হবে।

পোনা টেকসইকরণ:

শিং মাছের পোনা পুকুরে মজুদের উদ্দেশ্যে পরিবহণের পূর্বেই টেকসই করে নিতে হয়। সরবরাহের উদ্দেশ্যে পোনা ধরার আগের শেষরাত্র থেকে খাদ্য প্রদান বন্ধ রাখা দরকার। আহরণকৃত পোনাগুলো ট্যাংক বা সিস্টার্নে ৮-১২ ঘণ্টা ঝরণাধারায় রেখে টেকসই করা যায়।

মজুদ ঘনত্ব:

মাছ চাষের সফলতার অন্যতম প্রধান একটি নিয়ামক হচ্ছে মজুদ ঘনত্ব। মজুদ ঘনত্বের ওপর মাছের খাদ্য প্রয়োগের পরিমাণসহ অনান্য খরচ নির্ভরশীল। তাই অধিক পরিমাণে পোনা মাছ পুকুরে মজুদ করা হলে চাষের সামগ্রিক উৎপাদন ব্যয় বেড়ে যায়। অধিক ঘনত্বে মাছ চাষ করলে আরো সমস্যা হল প্রদত্ত খাদ্যের FCR (Food Conversion Ratio) এর মান ভাল হয় না। এ ছাড়া জলাশয়ের একটি নির্দিষ্ট ধারণ ক্ষমতা (Carrying Capacity)

থাকে। ধারণ ক্ষমতার অতিরিক্ত মাছ মজুদ করা হলে প্রত্যাশিত মাত্রায় উৎপাদন পাওয়া যাবে না, বহুবিধ সমস্যা দেখা দিবে। মাছের মজুদ ঘনত্ব নির্ভর করে চাষের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, পুকুরের মাটি ও পানির গুণাগুণ, পোনার আকার, চাষ ব্যবস্থাপনা, খাদ্যের ধরণ ও পানি ব্যবস্থাপনা এবং চাষির মাছ চাষের অভিজ্ঞতা ও আর্থিক সামর্থের উপর। পুকুরের পানির গভীরতার ওপরও পোনা ছাড়ার মজুদ ঘনত্ব অনেকাংশে নির্ভর করে। পুকুরের গভীরতা ৩-৪ ফুট হলে যে পরিমাণ পোনা ছাড়া যাবে ৫-৬ ফুট হলে তার থেকে বেশি পোনা মাছ ছাড়া যাবে।

পোনা মজুদ:

মাঠ পর্যায়ে শিং মাছ একক চাষের পাশাপাশি অত্যন্ত সফলভাবে অন্যান্য প্রজাতির মাছের সাথে বিভিন্ন ঘনত্বে চাষ করা হচ্ছে। এখানে শিং মাছ বাণিজ্যিকভাবে চাষে অধিক প্রচলিত কয়েকটি লাভজনক মডেল উল্লেখ করা হল। শিং মাছের পোনার আকার কেজিতে ১৫০০-২৫০০টি হলে চাষের পুকুরে ছাড়া যেতে পারে।

(প্রতি শতাংশে পোনা ছাড়ার সংখ্যা)

প্রজাতির নাম	মডেল ১	মডেল ২	মডেল ৩	মডেল ৪	মডেল ৫	মডেল ৬
শিং	১০০০-১২০০	৮০০-১০০০	৫০০-৮০০	৫০০-৭০০	৭০০-৯০০	৬০০-৮০০
কার্পজাতীয়	৫-৮	-	৫-৮	৫-৮		২০-৪০
মাগুর	-	৫০-১০০	-	-	-	-
তেলাপিয়া	-	১০-৫০	-	-	-	-
পাবদা	-	-	৪০০-৬০০	-	-	-
গুলসা	-	-	-	৫০০-৬০০	-	-
কৈ	-	-	-	-	৫০০-৮০০	-

পোনা অভ্যস্থকরণ

পরিবহন পাত্রের পানির তাপমাত্রা ও রাসায়নিক গুণাগুণ পুকুরের পানির তাপমাত্রা ও রাসায়নিক গুণাগুণের পার্থক্য থাকে। এজন্য পোনা পরিবহন পাত্র থেকে পুকুরে ছাড়ার আগে পুকুরের পানির সাথে অভ্যস্থ করে নিতে হবে।

পোনা অবমুক্তকরণ

পোনা ছাড়ার আগে পুকুরের পানিতে তাৎক্ষনিক অক্সিজেন সরবরাহের জন্য সোডিয়াম পারকার্বনেট ৩০ শতকে ০.৫ কেজি হারে পানিতে ছিটিয়ে দিতে হবে। এর পাশাপাশি জীবাণু নাশক পরিমাণমত পানিতে ভালভাবে গুলিয়ে পুকুরে ছিটিয়ে দিলে পোনার বাঁচার হার ভাল হবে। এ কাজটি পোনা ছাড়ার পরও করা যেতে পারে। পোনা অভ্যস্থ করার পর পাত্রের মুখ কাত করে ধরে বাহিরের থেকে ভিতরের দিকে শ্রতের ব্যবস্থা করলে পোনা স্রোতের বিপরীতে ধীরে ধীরে পুকুরে চলে যাবে। পোনা পুকুরে ছাড়ার ১২ ঘন্টা পরেও আর একবার সোডিয়াম পারকার্বনেটর ডোজ দেয়া যেতে পারে।

মজুদ পরবর্তী ব্যবস্থাপনা

খাদ্য ব্যবস্থাপনা

শিং মাছ বা মাছ চাষে অধিক ফলন নিশ্চিত করার জন্য পুকুরে সুষম ভাল মানের সম্পূরক খাবার প্রয়োগ করতে হবে। শিং মাছ সাধারণত কিট পতঙ্গ জাতীয় খাবার খেয়ে বড় হয়। সম্পূরক খাবার দিয়ে চাষের জন্য অধিক আমিষ সমৃদ্ধ (৩০% এর অধিক) খাবার সরবরাহ করতে হয়। শিং মাছের বিভিন্ন বয়সে বিভিন্ন মাত্রার আমিষ সমৃদ্ধ খাবার প্রয়োজন হয়।

ক) খাদ্য তৈরী: শিং মাছের খাবার দুই ভাবে তৈরি করা যেতে পারে।

i) নিজস্ব খামারে তৈরি (Supplementary): শিং মাছ চাষের জন্য নিজস্ব খামারে বা বাড়িতে সম্পূরক খাদ্য প্রস্তুত করা যায়। নিজস্ব খামারে খাবার তৈরি করে শিং মাছ চাষের ক্ষেত্রে পুকুরে মজুদ ঘনত্ব কিছুটা কম দিতে হবে।

ii)বাণিজ্যিক খাবার (Patent Feed): অধিকাংশ চাষি শিং মাছ চাষে বাজার থেকে বিভিন্ন ব্রান্ডের বাণিজ্যিক খাদ্য ব্যবহার করে থাকেন। বাজারে সুষম পুষ্টিসমৃদ্ধ বিভিন্ন ব্রান্ডের উন্নত মানের শিং মাছের খাদ্য পাওয়া যায়। শিং মাছের বয়সের চাহিদার সাথে, মুখের আকার ও আমিষের প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন ক্যাটাগরির খাদ্য রয়েছে। এ ধরনের খাবারের এফসিআর এর মান বেশ ভাল। বাণিজ্যিক খাবার আবার দুই ধরনের: ক) ডুবন্ত ও খ) ভাসমান।

শিং মাছের খাদ্য সাধারণত দিনে দুইবার প্রয়োগ করতে হয়। খুব ভোরে একবার এবং সন্ধ্যার পরে একবার। মোট খাদ্যের ৬০% সন্ধ্যায় এবং ৪০% ভোরে দিতে হবে।

খ) খাদ্য প্রয়োগ: পুকুরে পোনা মজুদের পর নার্সারি খাবার ০.৫ মিমি. (মাছের ওজনের ২৫-৩০% হারে) পানিতে ভাসিয়ে দিতে হবে। মোট খাবার ভোরে এবং সন্ধ্যায় বিভক্ত করে পুকুরের এক পাড় বরাবর ছিটিয়ে দিতে হবে। বড় পুকুর হলে সকল পাড় বারাবর দিতে হবে। তবে খেয়াল রাখতে হবে মাছে খাবার সব খাচ্ছে কি না। সব খাবার না খেলে খাবারের পরিমাণ কমিয়ে দিতে হবে। এভাবে ১০ থেকে ১৫ দিন পর পোনার আকার বড় হলে ০.৮ মিমি. এর দানাদার ভাসমান নার্সারি খাবার দিতে হবে। ক্রমান্বয়ে মাছ বড় হওয়ার সাথে সাথে খাবারের আকারও বড় হবে। মাছের আকারের সথে খাবারের আকার কি হবে তা নিম্নের স্মারণীতে দেখানো হল:

মাছের আকার (প্রতি কেজিতে পোনার সংখ্যা)	খাদ্যের আকার (মিমি)		মাছের আকার (প্রতি কেজিতে পোনার সংখ্যা)	খাদ্যের আকার (মিমি)
৮০০-৬০০	০.৫		১০০-৬০	২.০
৬০০-৩০০	০.৮		৬০-৩০	২.৫
৩০০-২০০	১.০		৩০-১৫	৩.০
২০০-১০০	১.৫			

নার্সারি খাবারের পর, প্রি-স্টার্টার, স্টার্টার, গ্রোয়ার এবং শেষে ফিনিসার এভাবে মাছ চাষ চলা কালে ক্রমন্বয়ে খাবার পরিবর্তন করতে হবে। মাছের দৈহিক ওজনের ভিত্তিতে নিম্নরূপ হারে পুকুরে খাদ্য প্রয়োগ করা যেতে পারে।

মাছের আকার (প্রতি কেজিতে পোনার সংখ্যা)	খাদ্য প্রয়োগের হার (%)		মাছের আকার (প্রতি কেজিতে পোনার সংখ্যা)	খাদ্য প্রয়োগের হার (%)
৩০০০-২০০০	৫০-৪০		১১০-৮০	১৪-১২
২০০০-১২০০	৪০-৩০		৮০-৬০	১২-১০
১২০০-৮০০	৩০-২৫		৬০-৪৫	১০-৮
৮০০-৪৫০	২৫-২০		৪৫-৩৫	৮-৭
৪৫০-৩০০	২০-১৮		৩৫-২৮	৭-৬
৩০০-২২০	১৮-১৬		২৮-২০	৬-৫
২২০-১৬০	১৬-১৫		২০-১৫	৫-৪
১৬০-১১০	১৫-১৪		১৫-১০	৪-৩

গ) নমুনায়ন (Sampling)ও খাবারের পরিমাণ নির্ধারণ: চাষের মাছের থেকে কিছু মাছ ধরে মাছের গড় ওজন পরিমাপ করে সমস্ত মাছের ওজন (Biomass) বের করে খাবারে পরিমাণ সমন্বয় করতে হয়। এ কাজ শিং মাছের ক্ষেত্রে প্রতি ১৫-২০ দিন অন্তর করা যেতে পারে। সঠিকভাবে

নমুনায়নের জন্য মোট মাছের ১০% মাছ ধরে নমুনায়ন করতে হবে এবং মোট ওজন বের করার ক্ষেত্রে পুকুরে অবমুক্তকৃত মোট মাছের ৯০% বাঁচার পরিমাণ ধরতে হবে। মজুদকৃত মাছ থেকে ৫০-১০০টি মাছ ধরেও নমুনায়ন করা যেতে পারে।

ঘ) খাবার প্রদানের কৌশল: নির্ধারিত সমস্ত খাবার একবারে পুকুরে ছিটিয়ে না দিয়ে কয়েক বারে প্রয়োগ করতে হবে এবং খাবার প্রদানে একটু সময় নিয়ে খাবার দিতে হবে। প্রতি বারের খাবার কয়েক ভাগে বিভক্ত করে প্রয়াগ করতে হবে। মাছের খাবার গ্রহণের হার পর্যবেক্ষণ করে পরের খাবার দিতে হবে। আর মাছে সবসময় সমান খাবার খায় না। এজন্য সার্বিকভাবে মাছের খাবার গ্রহণ আচারণ পর্যবেক্ষণ করে খাবার সমন্বয় করতে হবে।

আহরণ ও বাজারজাতকরণ

ওপরে বর্ণিত পদ্ধতিতে নিয়মিত খাদ্য এবং পরিচর্যা চালিয়ে গেলে ৪-৬ মাস বয়সে গড়ে মাছের আকার ৭০ গ্রাম হয়ে যাবে। এ আকারের মাছ বাজারজাত করার জন্য উপযুক্ত হয়। মাছ আহরণের আগের দিনে কোন প্রকার খাদ্য প্রয়োগ করা যাবে না। শিং মাছ আহরণ করার উপযুক্ত সময় হলো রাত্রে বেড় জাল দিয়ে টেনে মাছ ধরে হাউজে মজুদ করে রাখা। তবে পূর্ণ আহরণের জন্য পুকুর সেচে সম্পূর্ণ পানি অপসারণ করতে হয়। শিং মাছ বিশাক্ত কাটা ওয়ালা মাছ এজন্য এ মাছ ধরার সময় বিশেষ পন্থা অবলম্বন করতে হবে। সাধারণত পুকুরের পানি সম্পূর্ণ সেচার পরে এক হাতে মাছ রাখার পাত্র অন্য হাতে ছোট একটি বাটি দ্বারা মাছ কাদার ভিতর থেকে ধরে হাতে ধরা পাত্রে মজুদ করতে হয়। হাতে ধরা পাত্রটি মসৃন এবং ছিদ্র যুক্ত হওয়া ভাল। শিং মাছের বিষাক্ত কাটার কারণে মাছ সরাসরি হাত দিয়ে ধরা যায় না। মাছ বাটি দ্বারা ধরে প্লাষ্টিকের হাপা বা ব্যারেলে রাখতে হবে। ক্যারেটে বা খসখসে পাত্রে না রাখাই ভাল। আহরিত মাছ বাজার পাঠানোর আগ পর্যন্ত পানির ফোয়ারাযুক্ত হাইজে বা হাপাতে রাখতে হবে। পুকুর থেকে মাছ আহরণ শুরু করলে ২-৩ দিনের ভিতরে শেষ করতে হবে এবং এ সময় কোন প্রকার খাবার ব্যবহার করা উচিৎ হবে না।

শিং মাছের একক চাষের আয় ব্যায়ের নমুনা হিসাব (জলায়তন ৩০ শতাংশ):

ক্র. নং	উপকরণের বিবরণ	পরিমাণ	একক দর	মোট খরচ	মন্তব্য
১.	সংস্কার			১০,০০০.০০	
২.	চুন	৬০ কেজি	২০/-	১২০০.০০	
৩.	টিএসপি	৬ কেজি	২০/-	১২০.০০	
৪.	ইউরিয়া	৬ কেজি	৩০/-	১৮০.০০	
৫.	মাছের পোনা শিং	৩০,০০০টি	১.৫০	৪৫,০০০.০০	কেজিতে ২০০০-২৫০০ আকারের
৬.	কার্প	১৫০টি	৫/-	৭৫০.০০	
৭.	খাদ্য	২৪০০ কেজি	৬৫/-	১,৫৬,০০০.০০	খাদ্যের এফসিআর ২:১ ধরে হিসেব করা হয়েছে
৮.	বিবিধ			২০,০০০.০০	
			মোট খরচ	**২,৩৩,২৫০.০০**	

উৎপাদন: শিং মাছ (বাঁচার হার ৭০%, ২০টিতে কেজি) = ১০৫০ কেজি, মোট মূল্য ১০৫০ x ৩৫০ = ৩,৬৭,৫০০.০০

কার্প জাতীয় মাছ (৯০ % বাচার হার) = ১৩৫ কেজি, মোট মূল্য ১৩৫ x ১৫০ = ২০,২৫০.০০

সর্বমোট = ৩,৮৭,৭৫০.০০

নীট লাভ: (মোট আয় - মোট খরচ) = ৩,৮৭,৭৫০.০০ - ২,৩৩,২৫০.০০ = ১,৫৪,৫০০.০০ টাকা।

পাবদা মাছের চাষ ব্যবস্থাপনা

ভূমিকা

দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছের মধ্যে পাবদা খুবই সুস্বাদু ও জনপ্রিয় মাছ। উচ্চ বাজারমূল্য বিবেচনায় চাষযোগ্য ও বাণিজ্যিকভাবে লাভজনক মাছসমূহের মধ্যে পাবদা অন্যতম। দেশের প্রায় সব ধরনের পুকুর-দিঘি ও বদ্ধ জলাশয়ে এ মাছ চাষ করা যায়। লাগসই প্রযুক্তির সম্প্রসারণের মাধ্যমে চাহিদাসম্পন্ন ও উচ্চমূল্যের এ সুস্বাদু মাছটির উৎপাদন বৃদ্ধি করে বাজারে প্রাচুর্য নিশ্চিত করা যায়।

পাবদা মাছের সাধারণ পরিচিতি ও জীববিদ্যা

পাবদা মাছ দেশীয় প্রজাতির ছোটমাছ (Small Indigenous Species- SIS) এর অন্তর্ভূক্ত। দেশে ৩ প্রজাতির পাবদা পাওয়া যায়; যথা- বোয়ালি পাবদা *(Ompok bimaculatus)*, মধু পাবদা *(Ompok pabda)* ও কালি পাবদা *(Ompok pabo)*। বর্তমানে বদ্ধ জলাশয়ে মধু পাবদার চাষ প্রচলিত।

বৈজ্ঞানিক নাম	-	*Ompok pabda* (Hamilton)
স্থানীয় নাম	-	পাবদা বা মধু পাবদা
ইংরেজি নাম	-	Butter Catfish

আবাসস্থল

পাবদা স্বাদু পানির মাছ । বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, নেপাল সহ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অনেক দেশেই পাবদা মাছ বিস্তৃত। বর্তমানে বদ্ধ জলাশয় তথা পুকুর/দিঘিতে চাষিরা মধু পাবদা মাছের চাষ করতে আগ্রহী হয়ে উঠেছে। উন্মুক্ত জলাশয়ের মধ্যে হাকালুকি হাওর, টাঙ্গুয়ার হাওর, হাইল হাওর, বাইক্কা বিল, চলন বিল, হালতি বিল, মেঘনা নদী সংলগ্ন প্লাবনভূমি সহ দেশের অন্যান্য হাওর-বাঁওড় ও বিলে পাবদা মাছ পাওয়া যায়। বৃহত্তর ময়মনসিংহ, নরসিংদী, বৃহত্তর যশোর, বগুড়া অঞ্চলে পাবদা মাছ ব্যাপকভাবে চাষ হচ্ছে।

সাধারণ বৈশিষ্ট্য

- পাবদা মাছের দেহ আঁইশবিহীন, চকচকে, উজ্জ্বল রূপালী বর্ণের। দেহের উপরিভাগ ধূসর রূপালী ও পেটের দিক রূপালী বর্ণের;
- মুখ তুলনামূলকভাবে বড়, নিচের চোয়াল বড় ও দাঁতযুক্ত;
- পাবদার দুই জোড়া গোঁফ আছে, এটি ক্যাটফিশ শ্রেণিভুক্ত;
- পৃষ্ঠ-পাখনা ছোট, পায়ু পাখনা তুলনামূলকভাবে লম্বা (পায়ুছিদ্র থেকে লেজ পর্যন্ত বিস্তৃত);
- পার্শ্বীয় রেখা বরাবর স্বর্ণালী বর্ণের ডোরা দাগ দেখা যায়। পুরুষ মাছের পার্শ্বীয় রেখার উপরে ও নিচে খাঁজকাটা দাগগুলো খুবই স্পষ্ট এবং স্ত্রী মাছের ক্ষেত্রে এ দাগগুলো অস্পষ্ট;
- এ মাছের দৈর্ঘ্য পরিপক্ব অবস্থায় ১৫-২৫ সে.মি. হয়, স্ত্রী মাছ একই বয়সী পুরুষ মাছের তুলনায় আকারে বড় হয়ে থাকে;
- পাবদা মাছ এক বছরেই পরিপক্বতা লাভ করে, তবে দুই বছর বয়সী ব্রুড মাছের কৃত্রিম প্রজননে বেশি উপযোগী; এবং
- প্রজনন মৌসুম বেশ দীর্ঘ (ফেব্রুয়ারি-সেপ্টেম্বর), তবে এপ্রিল-আগস্ট এই মাছের সর্বোত্তম প্রজনন মৌসুম।

খাদ্য ও খাদ্যাভ্যাস

- রেণু পোনার খাদ্যঃ হাঁসের সিদ্ধ ডিমের কুসুম, রটিফেরা গ্রুপের জুও-প্ল্যাংকটন, কাইরোনমিড লার্ভা, টিউবিফেক্স ওয়ার্ম।
- ধানী থেকে চারা পোনার খাদ্য: কাইরোনমিড লার্ভা, টিউবিফেক্স ওয়ার্ম, রটিফেরা ও সাইক্লপস গ্রুপের জুও-প্ল্যাংকটন, ক্ষুদ্র জলজ পোকা, মাছের রেনু ও ধানী পোনা, কানপোনা ও দারকিনার পোনা, ইত্যাদি।
- চারা পোনা থেকে বিক্রয় উপযোগি পাবদার খাদ্যঃ কাইরোনমিড লার্ভা, টিউবিফেক্স ওয়ার্ম, কুচো চিংড়ি, কেঁচো, জলজ পোকা-মাকড়, শ্যাওলা ও পাতার নরম অংশ।
- পাবদা সর্বভূক, বটম ফিডার (Bottom Feeder), আর্টিফিসিয়াল ফিড দিয়ে বাণিজ্যিক চাষ করা যায়।

পাবদা মাছ চাষের সুবিধা

- ছোট-মাঝারি-বড়, বাৎসরিক/ষান্মাষিক/মৌসুমি ইত্যাদি প্রায় সব ধরণের পুকুরেই চাষ করা যায়;
- একক চাষের পাশাপাশি শিং-গুলশা-টেংরা-কার্পজাতীয় মাছের সাথেও মিশ্রচাষ করা যায়;
- চাহিদা ও বাজারমূল্য বেশি থাকায় এই মাছ চাষে বেশি আয় করা সম্ভব;
- চাষকালীন সময় (Culture Period) সংক্ষিপ্ত। ৪-৬ মাসেই বিক্রয় উপযোগী হয়;
- অক্সিজেনযুক্ত ব্যাগে পরিবহন করে জীবন্ত অবস্থায়ও বাজারজাত করা যায়, ফলে অধিক মুনাফা হয়;
- পোনা ও অন্যান্য চাষ-উপকরণ সহজলভ্য;
- এ দেশের পরিবেশ ও জলবায়ু পাবদা চাষের উপযোগি; এবং
- অবাঞ্চিত মাছের পোনা খেয়ে পুকুর পরিষ্কার রাখে।

পাবদা মাছচাষের পুকুরে উল্লেখযোগ্য ভৌত ও রাসায়নিক গুণাবলি

- **পিএইচ:** পুকুরের পানির পিএইচ ৭.০-৮.৫ এর মধ্যে থাকলে পাবদা মাছ চাষ করা যায়। তবে ৭.৫-৮.০ মাত্রার পিএইচ পাবদা চাষের জন্য উত্তম।
- **পানির স্বচ্ছতা:** প্রাকৃতিক খাদ্যের উপস্থিতির পরিমাণ ২৫-৩০ সে.মি. স্বচ্ছতার মধ্যে থাকলে ভালো হয়।
- **খরতা**(Hardness): ৮০-২০০ মি.গ্রা/লিটার খরতা পাবদা উৎপাদনের জন্য উপযোগী। পানির খরতা ২০-৩০ মি.গ্রা/লিটার থাকলে সহজে প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদন হয় না।
- **তাপমাত্রা:** ২৫-৩১ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা পাবদা মাছ চাষের জন্য উত্তম।
- **আয়রন:** পানিতে আয়রনের মাত্রা ০-১ পিপিএম এর মধ্যে থাকা প্রয়োজন। পানিতে ১ পিপিএম এর চেয়ে বেশি মাত্রার আয়রন থাকা পাবদা মাছ চাষের জন্য ক্ষতিকর।

মজুদপূর্ব ব্যবস্থাপনা

পুকুর প্রস্তুতি

পাবদা, গুলশা, টেংরা, শিং, মাগুর, ইত্যাদি ক্যাটফিশ জাতীয় মাছ চাষের জন্য পুকুর প্রস্তুতি অত্যন্ত গুরুত্ব বহন করে। পাবদা মাছ চাষের ক্ষেত্রে নার্সারি পুকুর ও একক/মিশ্রচাষের পুকুর প্রস্তুতির প্রক্রিয়াসমূহ প্রায় একই রকম।

পুকুর প্রস্তুতির ধাপসমূহ নিম্নে বর্ণিত হলো:

- পুকুর শুকানো, তলদেশের কাদা, জৈব অবশেষ অপসারণ।
- পাড় পরিষ্কার, মেরামত ও সংস্কার।
- পাবদা মাছের পুকুরে ১:২ ঢাল সর্বোত্তম।
- পুকুরের তলা মই দিয়ে সমান করে দেওয়া ভালো।
- পুকুরে পানি ঢুকানো ও বের করে দেওয়ার জন্য ইনলেট ও আউটলেট থাকা উত্তম। পুকুরের তলদেশ সংলগ্ন পানি ও উপরের স্তরে মৃত শ্যাওলাযুক্ত পানি বের করার জন্য পৃথক আউটলেটে পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন।
- পুকুরের পাড়ের চারপাশে নাইলন নেটের বেড়া দেওয়া হলে সাপ, ব্যাঙ, গুইসাপ, ইত্যাদি শিকারী সরীসৃপসহ অন্যান্য প্রাণির অবাঞ্চিত অনুপ্রবেশ হ্রাস করা যায়। কাজেই পাবদার পুকুরের চারপাশে নাইলন নেটের বেড়া থাকা উত্তম।
- বাজপাখি, পানকৌড়ি, বক, ইত্যাদি শিকারি পাখির আক্রমণ থেকে পাবদা মাছকে রক্ষা করার জন্য পুকুরের উপরে নেটের ঢাকনি অথবা আড়াআড়িভাবে এক হাত পর পর পণ্ডাস্টিকের ফিতা স্থাপন করা যেতে পারে।
- পুকুর শুকানো সম্ভব না হলে রোটেনন প্রয়োগ করে রাক্ষুসে ও অবাঞ্চিত মাছ দূর করা যায়।
- পুকুরে শামুক থাকলে তা দূর করা প্রয়োজন। কেননা শামুক বিভিন্ন রোগের জীবাণুর পোষক হিসাবে কাজ করে এবং পানির দ্রবীভূত অক্সিজেন ও অন্যান্য পুষ্টি উপাদানে ভাগ বসায়।
- **ব্লিচিং পাউডার প্রয়োগ:** শামুক দূর করার জন্য ব্লিচিং পাউডার ব্যবহার করা হলে পুনরায় পুকুর প্রস্তুতিতে ব্লিচিং পাউডার প্রয়োগের প্রয়োজন নাই। যদি কোন পুকুরে শামুক না থাকে তবে পুকুর প্রস্তুতির সময় বিঘা প্রতি ৪-৫ কেজি ব্লিচিং পাউডার দিয়ে ৮-১০ দিন শুকিয়ে রোগ-জীবাণু মুক্ত করা উত্তম।
- **চুন প্রয়োগ:** পুকুরের তলদেশের মাটি ও বিদ্যমান পানির pH অনুসারে চুন দিতে হয়। সাধারণত দোআঁশ ও পলি-দোআঁশ মাটির চেয়ে লাল মাটি, এটেল মাটি, কালচে কাদামাটি অধিক অম্লধর্মী হওয়ায় শেষোক্ত মাটির পুকুরে পূর্বোক্ত মাটির পুকুরের চেয়ে বেশি মাত্রায় চুন প্রয়োগের প্রয়োজন

হয়। মাছচাষের পুকুরে পাথুরে চুন (CaCO3) ব্যবহার করা ভালো। পুকুর প্রস্তুতির সময় ব্লিচিং পাউডার প্রয়োগের ২-৩ দিন পর প্রতি শতাংশে ১ কেজি হারে চুন প্রয়োগ করা যেতে পারে।

- পাবদা মাছ চাষের জন্য পুকুরের পানির গভীরতা ৪-৬ ফুট হলে ভালো হয়।
- **সার প্রয়োগঃ** খৈল- ২০০-২৫০ গ্রাম/শতাংশ ইউরিয়া- ৫০-১০০ গ্রাম/শতাংশ
  টিএসপি- ৫০-১০০ গ্রাম/শতাংশ এমপি- ২০-২৫ গ্রাম/শতাংশ
- সার প্রয়োগের পরেও যদি পুকুরে প্রাকৃতিক খাদ্য তৈরি না হয় তাহলে নিম্নোক্ত পদ্ধতিসমূহের যে কোন একটি উপায় অবলম্বন করা যেতে পারে:

নমুনা-১

<table>
<tr><th>প্রয়োজনীয় উপাদান</th><th>মাত্রা</th><td rowspan="4">একত্রে ৩ গুণ পানিতে ২৪ ঘন্টা ভিজিয়ে রেখে ছেঁকে নির্যাসটুকু পুকুরের পানিতে ছিটিয়ে দিতে হবে। ঐ ছাঁকনিতে থাকা অবশিষ্ট উপাদানগুলো ২৪ ঘন্টা ভিজিয়ে রেখে পুনরায় প্রয়োগ করতে হবে। এভাবে পর পর ৩ দিন প্রয়োগ করলে পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদিত হয়।</td></tr>
<tr><td>চাউলের মিহি কুড়া</td><td>২০০ গ্রাম/শতাংশ</td></tr>
<tr><td>চিটা গুড়</td><td>২০০ গ্রাম/শতাংশ</td></tr>
<tr><td>ইস্ট</td><td>৫ গ্রাম/শতাংশ</td></tr>
</table>

নমুনা-২

<table>
<tr><th>প্রয়োজনীয় উপাদান</th><th>মাত্রা</th><td rowspan="3">একত্রে ৩ গুণ পানিতে ২৪ ঘন্টা ভিজিয়ে রেখে ছেঁকে রস পুকুরের পানিতে ছিটিয়ে দিতে হবে।</td></tr>
<tr><td>সরিষার খৈল</td><td>৭০ গ্রাম/শতাংশ</td></tr>
<tr><td>চিটাগুড়</td><td>৭০ গ্রাম/শতাংশ</td></tr>
</table>

নমুনা-৩

<table>
<tr><th>প্রয়োজনীয় উপাদান</th><th>মাত্রা</th><td rowspan="3">একত্রে ৩ গুণ পানিতে ২৪ ঘন্টা ভিজিয়ে রেখে ছেঁকে রস পুকুরের পানিতে ছিটিয়ে দিতে হবে।</td></tr>
<tr><td>৩৫-৪০% প্রোটিনসমৃদ্ধ নার্সারী-১ ফিড (পাউডার)</td><td>৩০০ গ্রাম/শতাংশ</td></tr>
<tr><td>চিটাগুড়</td><td>২০০ গ্রাম/শতাংশ</td></tr>
</table>

নমুনা-৪

<table>
<tr><th>প্রয়োজনীয় উপাদান</th><th>মাত্রা</th><td rowspan="3">আটা/ময়দা হালকা সিদ্ধ করে আঠালো অবস্থায় এনে এর সাথে চিটাগুড় মিশিয়ে পানিতে পর পর ৩ দিন প্রয়োগ করতে হবে</td></tr>
<tr><td>আটা/ময়দা</td><td>৫০ গ্রাম/শতাংশ</td></tr>
<tr><td>চিটাগুড়</td><td>১০০ গ্রাম/শতাংশ</td></tr>
</table>

মজুদকালীন ব্যবস্থাপনা

পাবদা মাছের ভালো উৎপাদন পাওয়ার জন্য চাষের উদ্দেশ্যে সরাসরি মজুদ পুকুরে পোনা মজুদ না করে পূর্বে যত্নসহকারে নার্সারি পুকুরে প্রতিপালন করে নেওয়া প্রয়োজন।

■সুস্থ-সবল পাবদা মাছের পোনার বৈশিষ্ট্য:

* গাত্রোবরণ উজ্জ্বল ও চকচকে, পিঠের দিকে কালচে বর্ণের।
* স্রোতের বিপরীতে ঝাঁক বেঁধে দ্রুত চলাচলে সক্ষম।
* পোনার গা পিচ্ছিল, গায়ে কোন প্রকার ক্ষতচিহ্ন থাকবে না।
* লেজ এবং অন্যান্য পাখনা অক্ষত থাকবে।

পোনা পরিবহন:

পাবদা মাছের পোনা ড্রামে পরিবহণ করা যায়। আধুনিক পদ্ধতিতে অক্সিজেনযুক্ত ব্যাগে চাষির পুকুর পর্যন্ত পোনা পরিবহণ করাই উত্তম। ২-৪ সে.মি. আকারের পোনা অক্সিজেনযুক্ত ব্যাগে (৩৬”×২২”-২৪”) ব্যাগ প্রতি ১০০০টি হারে ৪-৬ ঘণ্টার দূরত্বে পরিবহণ করা যায়। পোনার আকার ৪-৫ সে.মি. হলে একই সময়ের দূরত্বে ৫০০টি পোনা একই আকারের ব্যাগে পরিবহণ করা যায়। পাবদার পোনা সাধারণত রাতে পরিবহণ করা ভালো। এ সময় পরিবেশের তাপমাত্রা কম থাকায় পোনার পরিবহণজনিত পীড়ন কম হয়। পলিথিন ব্যাগে ৪-৫ লিটার পানি নিয়ে প্রতি ২০ টি ব্যাগে ১০ গ্রাম অক্সিজেন পাউডার, ১ টি ওরস্যালাইন ও মাল্টিভিটামিন বা ভিটামিন সি ১০ গ্রাম হারে ব্যবহার করলে মাছগুলো সতেজ থাকে।

পোনা টেকসইকরণ:

পাবদা মাছের পোনা পুকুরে মজুদের উদ্দেশ্যে পরিবহণের পূর্বেই টেকসই করে নিতে হয়। সরবরাহের উদ্দেশ্যে পোনা ধরার আগের শেষরাত থেকে খাদ্য প্রদান বন্ধ রাখা দরকার। আহরণকৃত পোনাগুলো ট্যাংক ও সিস্টার্নে ৮-১২ ঘণ্টা ঝরণার পানির স্রোতে রেখে টেকসই করা যায়।

মজুদ ঘনত্ব:

পাবদা মাছ চাষের জন্য ৩-৫ সে.মি আকারের বা ১৫০০-২০০০টি/কেজি আকারের পোনা মজুদ করা উত্তম। মজুদকৃত পোনাগুলো প্রায় সম-আকারের হওয়া উত্তম।

মজুদ পরবর্তী ব্যবস্থাপনা

খাদ্য ব্যবস্থাপনা

মডেল-১

কেজিতে পোনার সংখ্যা	খাদ্য প্রয়োগের হার (দেহের ওজনের %)	খাদ্যের ধরণ	৩৩ শতাংশে ৪০,০০০ টি মাছের জন্য সম্ভাব্য দৈনিক খাদ্যের পরিমাণ (কেজি)
২০০০-৩০০০	৩০-৩৫%	উন্নত নার্সারি ফিড (পাউডার)	৪-৫
১২০০-২০০০	২৫-৩০%	উন্নত নার্সারি ফিড (পাউডার)	৬-৭
৪৫০-৮০০	২০-২৫%	উন্নত নার্সারি ফিড (পাউডার) + নার্সারি-২ ফিড (০.৫মি.মি. ভাসমান পিলেট)	১২-১৪
৪৫০-৩০০	২০-১৫	নার্সারি-২ ফিড (০.৫মি.মি. ভাসমান পিলেট)	১৫-১৮
৩০০-২২০	১৫-১২	স্টার্টার-১ (০.৮মি.মি. ভাসমান পিলেট)	১৭-২০
২২০-১৬০	১২-১০	স্টার্টার-১ (০.৮মি.মি. ভাসমান পিলেট)	১৯-২৩
১৬০-১১০	১০-৮	স্টার্টার-১ (০.৮মি.মি. ভাসমান পিলেট) + স্টার্টার-১ (১.০মি.মি. ভাসমান পিলেট)	২২-২৬

১১০-৮০	৮-৭	স্টার্টার-১ (১.০মি.মি. ভাসমান পিলেট)	২৬-৩১
৮০-৬০	৭-৬	স্টার্টার-১ (১.০মি.মি. ভাসমান পিলেট) + স্টার্টার-১ (১.৫মি.মি. ভাসমান পিলেট)	৩০-৩৭
৬০-৪৫	৬-৫	স্টার্টার-১ (১.৫মি.মি. ভাসমান পিলেট)	৩৪-৪২
৪৫-৩০	৫-৪	স্টার্টার-১ (১.৫মি.মি. ভাসমান পিলেট)	৪০-৪৮

খাদ্য ব্যবস্থাপনা (মডেল-২ ও মডেল-৩)

মডেল-২ ও মডেল-৩ এর ক্ষেত্রে খাদ্য ব্যবস্থাপনা প্রায় মডেল-১ এর মতই। তবে যেহেতু কার্প জাতীয় মাছের পরিমাণ মডেল-২ ও মডেল-৩ এ তুলনামূলকভাবে মডেল-১ অপেক্ষা বেশি তাই সেক্ষেত্রে দুপুরে একবার কার্পজাতীয় মাছের দেহের ওজনের ২-৩% হারে ডুবন্ত খাদ্য প্রয়োগ করা প্রয়োজন।

বাণিজ্যিক খাদ্য ছাড়াও চাষিরা উন্নতমানের সম্পূরক খাদ্য প্রস্তুত করে পাবদা মাছ চাষে ব্যবহার করতে পারেন। নিচে সম্পূরক খাদ্য তৈরির একটি মডেল দেয়া হলো:

উপকরণ	ব্যবহার মাত্রা (%)	সরবরাহকৃত আমিষ (%)
ফিশ মিল	২০	১২
মিট এন্ড বোন মিল	১৫	৭.৫
সয়াবিন মিল	১৫	৬
সরিষার/তিলের খৈল	১৫	৫.২৫
চালের কুঁড়া/গমের ভূষি	৩০	৩.৬
আটা (গম)	৪.৮	০.৬
ভিটামিন ও খনিজ	০.২	-
	১০০	৩৫

সার ব্যবস্থাপনা:

চাষের পুকুরে পানির স্বচ্ছতা ২০-২৫ সে.মি. এর বেশি থাকলে ও প্রাকৃতিক খাবারের উপস্থিতি কম থাকলে সাময়িকভাবে প্রতি শতাংশে ৭০ গ্রাম খৈল, ৫০ গ্রাম ইউরিয়া, ২৫ গ্রাম টিএসপি ২৪ ঘণ্টা ভিজিয়ে রেখে পুকুরে প্রয়োগ করতে হবে। এভাবে একদিন পর পর মোট তিনবার প্রয়োগ করলে পুকুরে প্রাকৃতিক খাদ্যের প্রাচুর্য আসবে। তবে প্রথম বার সার প্রয়োগের পর পানি বাদামী-সবুজ বর্ণ ধারণ করলে পরবর্তীতে সার প্রয়োগের প্রয়োজন নেই।

পানি ব্যবস্থাপনা:

- পাবদা মাছের চাষের ক্ষেত্রে পানির ভৌত ও রাসায়নিক গুণাগুণ বজায় রাখা জরুরি। পুকুরের পরিবেশ ভালো রাখার জন্য নিয়মিত পানি পরিবর্তন করা দরকার।
- পানিতে এমোনিয়া গ্যাসের প্রাদুর্ভাব (>০.০২৫ mg/L) পরিলক্ষিত হলে বা অন্যান্য ক্ষতিকারক গ্যাস (H_2S, CH_4, CO_2 ইত্যাদি) বৃদ্ধি পেলে ইউকা প্লণ্ড্যান্ট এক্সট্রাক্ট সমৃদ্ধ গ্যাসনিবারক প্রয়োগ করা যেতে পারে। প্রয়োগমাত্রা ৩-৪ মি.লি/শতাংশ/৩-৪ ফুট গভীরতা। ইউকা প্লণ্ড্যান্ট

এক্সট্রাক্ট বাজারে সহজলভ্য না হলে ইউকা সমৃদ্ধ জিওলাইট ব্যবহার করা যেতে পারে। জিওলাইটের প্রয়োগমাত্রা ২৩০-২৫০ গ্রাম/শতাংশ/৩-4 গভীরতা।

- দ্রবীভূত অক্সিজেন ৫ পিপিএম এর চেয়ে কম থাকলে মাছের সাধারণ বৃদ্ধি ও খাদ্য গ্রহণে ব্যাঘাত ঘটে। দ্রবীভূত অক্সিজেন ৩ পিপিএম এর নিচে নেমে এলে পাবদা মারা যেতে পারে। দ্রবীভূত অক্সিজেন বৃদ্ধির জন্য প্রতি ৩৩ শতাংশে ০.৫ কেজি অক্সিজেন পাউডার পানিতে গুলে ছিটিয়ে দিতে হবে।
- তলদেশের জৈব পচনের জন্য যদি অক্সিজেন ঘাটতি হয় অথবা পানি ঘোলা হয়ে যায় তাহলে ইউকা সমৃদ্ধ জিওলাইট ২৫০ গ্রাম/শতাংশ হারে ব্যবহার করা যায়।
- পানিতে ফাইটোপ্লণ্ডাংকটনিক ব্লুম নিয়ন্ত্রণে গাজনকৃত সামুদ্রিক আগাছার নির্যাস (Farmented biomass of seaweed extract) ব্যবহার করা যায়। ৩-4 ফুট গভীর পানির জন্য প্রয়োগমাত্রা একর প্রতি ৩-৪ কেজি।
- পানির গুণাগুণ রক্ষায় প্রতি ১৫ দিন অন্তর প্রো-বায়োটিক উপযুক্ত মাত্রায় ব্যবহার করা যায়। উপযুক্ত প্রো-বায়োটিক ব্যবহারের মাধ্যমে পানির এমোনিয়া, তলানির জৈব পচনজনিত গ্যাস, টিডিএস, ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করে পানির পরিবেশ চাষ-উপযোগী রাখা যায়।

আহরণ ও বাজারজাতকরণ

- সাধারণত ৪-৬ মাসে ৩০-৩৫টি পাবদা মাছে ১ কেজি হয়। এ আকারের পাবদা মাছ বাজারজাত করা যায়।
- জীবন্ত অবস্থায় বাজারজাত করলে পাবদা মাছের বাজারমূল্য বেশি পাওয়া যায়।
- জীবন্ত অবস্থায় বাজারজাত করার জন্য পাবদা মাছ আহরণের পর হাউজ বা ট্যাংকে ৮-১২ ঘণ্টা পানির ধারায় রাখতে হয়।
- অক্সিজেনযুক্ত পলিথিন ব্যাগে (৩৬”×২৪”) ১.০ কেজি পর্যন্ত জীবন্ত মাছ ৩-৬ ঘণ্টা সময়ের ব্যবধানের দূরত্বে পরিবহণ করা যায়।
- পলিথিন ব্যাগে 4-৫ লিটার পানি নিয়ে প্রতি ব্যাগে ০.৫ গ্রাম অক্সিজেন পাউডার ও ১.০ গ্রাম ওরস্যালাইন ব্যবহার করলে মাছগুলো সতেজ থাকে।

সম্ভাব্য আয়-ব্যয়ের হিসাব

৩৩ শতাংশ পুকুরে পাবদা চাষের জন্য সম্ভাব্য ব্যয়:

১.	পুকুর সেচ ও সংস্কার:	২,০০০.০০
২.	তলার কাদা অপসারণ ও পাড় মেরামত:	২,০০০.০০
৩.	পাড়ে নাইলন নেটের বেড়া ও পণ্ডাস্টিক ফিতা বাবদ ব্যয়:	২,০০০.০০
৪.	চুন, ব্লিচিং পাউডার ও অন্যান্য:	১,০০০.০০
●	পোনা ক্রয়- ৪০,০০০ টি পোনা (পরিবহনসহ):	৪০,০০০.০০
●	খাদ্য বাবদ ব্যয় (৪০,০০০ টি মাছের হিসাবে):	১,৪৮,০০০.০০
●	পানি ব্যবস্থাপনা বাবদ ব্যয়:	৭,০০০.০০
●	ঔষধ ও অন্যান্য বাবদ ব্যয়:	৮,০০০.০০
●	আহরণ ও বাজারজাতকরণ বাবদ ব্যয়:	১০,০০০.০০
	সর্বমোট ব্যয়:	**২,২০,০০০.০০**

৩৩ শতাংশ পুকুরে ৪০,০০০ টি মাছ চাষ থেকে সম্ভাব্য আয়:

মোট উৎপাদন: মডেল-১ অনুযায়ী ৪০,০০০ টি পাবদা মাছের ১০% মৃত্যুহার বিবেচনা করলে ৩৬,০০০ টি মাছ ৩৫ টায় কেজি হিসাবে মোট উৎপাদন হয় প্রায় ১০২৮ কেজি। রুই ও কাতলা মাছের মোট উৎপাদন ৭×৩৩×১ = ২৩১ কেজি।

মোট আয়- প্রতি কেজি পাবদা ৩৫০.০০ দরে ১০২৮ কেজির মূল্য-	৩,৫৯,৮০০.০০
প্রতি কেজি রুই-কাতলা ১৮০.০০ দরে ২৩১ কেজির মূল্য-	৪১,৫৮০.০০
সর্বমোট আয়:	**৪,০১,৩৮০.০০**
মুনাফা:	**১,৮১,৩৮০.০০**

গুলশা মাছের চাষ ব্যবস্থাপনা

ভূমিকা

দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছের মধ্যে গুলশা খুবই সুস্বাদু মাছ। এই মাছে কাঁটা কম। এ জন্য ছোট-বড় সকল বয়সের মানুষের কাছে এই মাছ প্রিয়। গুলশার বাজারমূল্য বেশি বলে চাষিরা গুলশা চাষে আগ্রহী হচ্ছেন। কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে বিভিন্ন হ্যাচারিতে এই মাছের পোনা উৎপাদিত হচ্ছে। দেশের প্রায় সকল ধরণের পুকুর, দিঘি ও অন্যান্য বদ্ধ জলাশয়ে এ মাছ চাষ করা যায়। এক সময় দেশের নদ-নদী, খাল-বিল, প্লণ্ঢাবনভূমিতে প্রচুর পরিমাণে গুলশা মাছ পাওয়া যেত। বর্তমানে ধানক্ষেতে কীটনাশকের ব্যবহার, সেচের মাধ্যমে জলাশয় শুকিয়ে মাছ ধরা, অপরিকল্পিত বাঁধ নির্মাণ ও অপরিমিত সার ব্যবহারের কারণে প্রাকৃতিক প্রজননক্ষেত্র ধ্বংস হওয়ায় এ মাছের প্রাপ্যতা উল্লেণ্ঢখযোগ্য হারে হ্রাস পাচ্ছে। লাগসই প্রযুক্তি সম্প্রসারণের মাধ্যমে এ মাছটির প্রাপ্যতা বৃদ্ধি করা যায়।

গুলশা মাছের সাধারণ পরিচিতি ও জীববিদ্যা

বৈজ্ঞানিক নাম - *Mystus Cavasius*(Hamilton)

স্থানীয় নাম - গুলশা।

ইংরেজি নাম - Gangetic Mystus

আবাসস্থল

গুলশা স্বাদু পানির মাছ। বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলংকা, নেপাল, ইন্দো-চায়না, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, মিয়ানমার, সিরিয়া ও পশ্চিম-আফ্রিকায় গুলশা মাছ বিস্তৃত। দেশের নদ-নদী, খাল-বিল, প্লণ্ঢাবনভূমি এবং ধানক্ষেতে এই মাছ পাওয়া যায়। বর্তমানে বদ্ধ জলাশয় তথা পুকুর ও দিঘিতে গুলশা মাছের চাষ করা হচ্ছে। বিশেষতঃ বৃহত্তর ময়মনসিংহ, নরসিংদী, বৃহত্তর যশোর, বগুড়া অঞ্চলে গুলশা মাছ ব্যাপকভাবে চাষ হচ্ছে।

সাধারণ বৈশিষ্ট্য

- গুলশা মাছের দেহ আঁইশ-বিহীন, চকচকে, উজ্জ্বল রূপালী বর্ণের;
- দেহ মধ্যম আকৃতির চাপানো ও পিঠের অংশ বাঁকানো;
- মুখ তুলনামূলকভাবে ছোট, উপরের চোয়াল সামান্য বড়;
- গুলশা ক্যাটফিশ শ্রেণির মাছ, এর চার জোড়া গোঁফ আছে;
- পৃষ্ঠপাখনা ও বক্ষপাখনা লম্বা কাঁটাযুক্ত;
- পৃষ্ঠপাখনা থেকে লেজ পর্যন্ত নরম মাংসল পৃষ্ঠপাখনা (adipose fin) রয়েছে এবং এর লেজ দুই ভাগে বিভক্ত;
- পরিপক্ক অবস্থায় গুলশার দৈর্ঘ্য ১৫-২৩ সে.মি.। স্ত্রী মাছ একই বয়সী পুরুষ মাছের তুলনায় আকারে বড়;
- গুলশা মাছ সবর্ভূক; এবং
- গুলশা মাছের প্রজনন মৌসুম বেশ দীর্ঘ (মধ্য ফেব্রুয়ারী-সেপ্টেম্বর), তবে এপ্রিল-আগস্ট মাস এই মাছের প্রজননের সর্বোত্তম মৌসুম।

খাদ্য ও খাদ্যাভ্যাস

- রেণু পোনার খাদ্যঃ হাঁসের সিদ্ধ ডিমের কুসুম, রটিফেরা গ্রুপের জুও-প্লণ্ঢাংকটন, কাইরোনমিড লার্ভা, টিউবিফেক্স ওয়ার্ম;
- ধানী থেকে চারা পোনার খাদ্যঃ কাইরোনমিড লার্ভা, টিউবিফেক্স ওয়ার্ম, রটিফেরা ও সাইক্লপস গ্রুপের জুও- প- ্যাংকটন, ক্ষুদ্র জলজ পোকা, কীট-পতঙ্গ, ইত্যাদি;
- চারা পোনা থেকে বিক্রয় উপযোগি গুলশার খাদ্যঃ কাইরোনমিড লার্ভা, টিউবিফেক্স ওয়ার্ম, কুচোচিংড়ি, কেঁচো, জলজ পোকা-মাকড়, শ্যাওলা ও পাতার নরম অংশ;
- গুলশা সবর্ভূক, বটম ফিডার (Bottom Feeder)। আর্টিফিসিয়াল ফিড দিয়ে বাণিজ্যিক চাষ করা যায় যদিও সম্পূরক খাদ্য

হিসেবে এরা সরিষার খৈল, চালের কুড়া, ফিসমিল খায়।

গুলশা মাছ চাষের সুবিধা

- গুলশা মাছ ছোট-মাঝারি-বড় বাৎসরিক/ষান্মাষিক/মৌসুমি ইত্যাদি প্রায় সব ধরনের পুকুরেই চাষ করা যায়;
- একক চাষের পাশাপাশি শিং-পাবদা-টেংরা-কার্পজাতীয় মাছের সাথেও মিশ্রচাষ করা যায়;
- চাহিদা ও বাজারমূল্য বেশি থাকায় এই মাছ চাষে বেশি আয় করা সম্ভব;
- চাষকালীন সময় (Culture Period) ছোট, ৪-৬ মাসেই বিক্রয় উপযোগী হয়; এবং
- অক্সিজেনযুক্ত ব্যাগে পরিবহণ করে জীবন্ত অবস্থায় বাজারজাত করা যায় ফলে অধিক মুনাফা হয়।

গুলশা মাছ চাষের অসুবিধা

- সময়মত গুণগতমানের সঠিক আকারের পোনা না পাওয়া।
- গুলশা চাষ করতে অধিক মাত্রায় অক্সিজেন (৫-৭ মি.লি. গ্রাম/লিটার হারে) চাষের পুকুরে প্রয়োজন।
- অধিক ঘনত্বে চাষ করার ক্ষেত্রে এ্যারেটর/প্যাডেল হুইলের ব্যবস্থা রাখতে হয়। পুকুর পাড়ে বিদ্যুৎ বা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা রাখতে হয়, যা প্রান্তিক চাষিদের জন্য অনেক ক্ষেত্রে কষ্টসাধ্য।
- গুলশা মাছকে রাত্রে খাবার প্রয়োগ করতে হয়। পোনা এবং মাছ পর্যবেক্ষণও রাত্রে করতে হয় যা চাষির জন্য অনেক ক্ষেত্রে অসুবিধাজনক ।

গুলশা মাছ চাষের পুকুরে উল্লেখযোগ্য ভৌত ও রাসায়নিক গুণাবলি

- **পিএইচঃ** পুকুরের পানির পিএইচ ৭.০-৮.৫ এর মধ্যে থাকলে গুলশা মাছ চাষ করা যায়। তবে ৭.৫-৮.০ মাত্রার পিএইচ গুলশা চাষের জন্য উত্তম।
- **পানির স্বচ্ছতাঃ** ২৪-২৬ সে.মি. স্বচ্ছতার পানিতে গুলশা উৎপাদন ভালো হয়।
- **খরতা**(Hardness): ৮০-২০০ মি.গ্রা/লিটার খরতা গুলশা উৎপাদনের জন্য উপযোগী। পানির Hardness ২০-৩০ মি.গ্রা/লিটার থাকলে সহজে প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদন কম হয়।
- **তাপমাত্রাঃ** ২৫-৩১ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা গুলশা মাছ চাষের জন্য উত্তম।
- **আয়রণঃ** পানিতে আয়রনের মাত্রা ০-১ পিপিএম এর মধ্যে থাকা প্রয়োজন। পানিতে ১ পিপিএম এর চেয়ে বেশি মাত্রার আয়রণ থাকা গুলশা মাছ চাষের জন্য ক্ষতিকর।

মজুদপূর্ব ব্যবস্থাপনা

পুকুর প্রস্তুতি

গুলশা, ট্যাংরা, পাবদা, শিং, মাগুর ইত্যাদি ক্যাটফিশ জাতীয় মাছ চাষের জন্য পুকুর প্রস্তুতি অত্যন্ত গুরুত্ব বহন করে। গুলশা মাছ চাষের ক্ষেত্রে নার্সারি পুকুর ও চাষের পুকুর প্রস্তুতির প্রক্রিয়াসমূহ প্রায় একই রকম। প্রস্তুতির ধাপসমূহ নিম্নে বর্ণিত হলোঃ

- পুকুর শুকানো, তলদেশের কাদা, জৈব অবশেষ অপসারণ।
- পাড় পরিষ্কার, মেরামত ও সংস্কার।
- গুলশা মাছের পুকুরে ১:২ ঢাল সর্বোত্তম।
- পুকুরের তলা মই দিয়ে সমান করে দেওয়া ভাল।
- পুকুরে পানি ঢুকানো ও বের করে দেওয়ার জন্য ইনলেট ও আউটলেট থাকা উত্তম।
- পুকুরের পাড়ের চারপাশে নাইলন নেটের বেড়া দিয়ে সাপ, ব্যাঙ, গুইসাপ, ইত্যাদি শিকারী সরীসৃপসহ অন্যান্য প্রাণির অবাঞ্চিত অনুপ্রবেশ হ্রাস করা যায়। কাজেই গুলশা মাছের পুকুরের চারপাশে নাইলন নেটের বেড়া থাকা উত্তম।
- বাজ, পানকৌড়ি, বক, ইত্যাদি শিকারী পাখির আক্রমণ থেকে গুলশা মাছকে রক্ষা করার জন্য পুকুরের উপরে নেটের ঢাকনি অথবা আড়াআড়িভাবে এক হাত পর পর প্লাস্টিকের ফিতা স্থাপন করা যেতে পারে।
- পুকুর শুকানো সম্ভব না হলে রোটেনন প্রয়োগ করে রাক্ষুসে ও অবাঞ্চিত মাছ দূর করা যায়।
- পুকুরে শামুক থাকলে তা দূর করা প্রয়োজন। কেননা শামুক বিভিন্ন রোগের জীবাণুর পোষক হিসাবে কাজ করে এবং পানির দ্রবীভূত অক্সিজেন ও অন্যান্য পুষ্টি উপাদানে ভাগ বসায়।

- **ব্লিণ্ঢচিং পাউডার প্রয়োগঃ** শামুক দূর করার জন্য ব্লিণ্ঢচিং পাউডার ব্যবহার করা হলে পূনরায় পুকুর প্রস্তুতিতে ব্লিচিং পাউডার প্রয়োগের প্রয়োজন নাই। যদি কোন পুকুরে শামুক না থাকে তবে পুকুর প্রস্তুতির সময় প্রতি ৩৩ শতাংশে ৪-৫ কেজি ব্লিণ্ঢচিং পাউডার দিয়ে ৮-১০ দিন শুকিয়ে রোগ-জীবাণু মুক্ত করা উত্তম।
- **চুন প্রয়োগঃ** পুকুরের তলদেশের মাটি ও বিদ্যমান পানির অনুসারে চুন দিতে হয়। সাধারণত দো-আঁশ ও পলি-দো-আঁশ মাটির চেয়ে লাল মাটি, এটেল মাটি, কালচে কাদামাটি অধিক অম্লণ্ঢধর্মী হয়। অম্লণ্ঢধর্মী মাটির পুকুরে অধিক মাত্রায় চুন প্রয়োগের প্রয়োজন হয়। মাছ চাষের পুকুরে পাথুরে চুন ($CaCO_3$) ব্যবহার করা ভালো। পুকুর প্রস্তুতির সময় ব্লিণ্ঢচিং পাউডার প্রয়োগের ২-৩ দিন পর প্রতি শতাংশে ১ কেজি হারে চুন প্রয়োগ করা যেতে পারে।
- গুলশা মাছ চাষের জন্য পুকুরের পানির গভীরতা ৪-৬ ফুট হলে ভালো হয়।
- **সার প্রয়োগঃ** খৈল : ১৫০-২০০ গ্রাম/শতাংশ ইউরিয়া : ৫০-৭০ গ্রাম/শতাংশ
  টিএসপি : ৫০-৭০ গ্রাম/শতাংশ এমপি : ২০-২৫ গ্রাম/শতাংশ

- গুলশা মাছ চাষের ক্ষেত্রে সাধারণত কোন সার প্রয়োগের প্রয়োজন হয় না। যদি পুকুরে প্রাকৃতিক খাদ্যের অভাব ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হয় তখন নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে প্রকৃতিক খাদ্য তৈরি করা যেতে পারেঃ

নমুনা-১

প্রয়োজনীয় উপাদান	মাত্রা	
চাউলের মিহি কুড়া	২০০ গ্রাম/শতাংশ	একত্রে ৩ গুণ পানিতে ২৪ ঘন্টা ভিজিয়ে রেখে ছেঁকে নির্যাসটুকু পুকুরের পানিতে ছিটিয়ে দিতে হবে। ঐ ছাকনিতে থাকা অবশিষ্ট উপাদানগুলো ২৪ ঘন্টা ভিজিয়ে রেখে পুনরায় প্রয়োগ করতে হবে। এভাবে পর পর ৩ দিন প্রয়োগ করলে পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদিত হয়।
চিটাগুড়	২০০ গ্রাম/শতাংশ	
ইস্ট	৫-১০ গ্রাম/শতাংশ	

নমুনা-২

প্রয়োজনীয় উপাদান	মাত্রা	
সরিষার খৈল	৭০ গ্রাম/শতাংশ	একত্রে ৩ গুণ পানিতে ২৪ ঘন্টা ভিজিয়ে রেখে ছেঁকে রস পুকুরের পানিতে ছিটিয়ে দিতে হবে।
চিটাগুড়	৭০ গ্রাম/শতাংশ	
ইস্ট	৫-১০ গ্রাম/শতাংশ	

নমুনা-৩

প্রয়োজনীয় উপাদান	মাত্রা	
৩৫-৪০% প্রোটিনসমৃদ্ধ	৩০০ গ্রাম/শতাংশ	একত্রে ৩ গুণ পানিতে ২৪ ঘন্টা ভিজিয়ে রেখে ছেঁকে রস পুকুরের পানিতে ছিটিয়ে দিতে হবে।
নার্সারি-১ ফিড (পাউডার)		

নমুনা-৪

প্রয়োজনীয় উপাদান	মাত্রা	
আটা/ময়দা	৫০ গ্রাম/শতাংশ	আটা/ময়দা হালকা সিদ্ধ করে আঠালো অবস্থায় এনে এর সাথে পানি মিশিয়ে পুকুরে পর পর ৩ দিন প্রয়োগ করতে হবে

মজুদকালীন ব্যবস্থাপনা

সুস্থ্য-সবল গুলশা মাছের পোনার বৈশিষ্ট্য:

- গাত্রবরণ উজ্জ্বল ও চকচকে, পিঠের দিকে কালচে বর্ণের;
- স্রোতের বিপরীতে ঝাঁক বেঁধে দ্রুত চলাচলে সক্ষম;
- পোনার গা পিচ্ছিল, লেজ, বক্ষপাখনার কাঁটা ও অন্যান্য পাখনা অক্ষত থাকবে; এবং
- গায়ে কোন প্রকার ক্ষতচিহ্ন থাকবে না;

পোনা পরিবহন:

গুলশা মাছের পোনা ড্রামে পরিবহণ করা যায়। আধুনিক পদ্ধতিতে অক্সিজেনযুক্ত ব্যাগে চাষির পুকুর পর্যন্ত পোনা পরিবহণ করাই উত্তম। ২-৪ সে.মি. আকারের পোনা অক্সিজেনযুক্ত ব্যাগে (৩৬"×২২"-২৪") ব্যাগ প্রতি ১০০০টি হারে ৪-৬ ঘণ্টার দূরত্বে পরিবহণ করা যায়। পোনার আকার ৪-৫ সে.মি. হলে একই সময়ের দূরত্বে ৫০০টি পোনা একই আকারের ব্যাগে পরিবহণ করা যায়। গুলশার পোনা সাধারণত রাতে পরিবহণ করা ভালো। এ সময় পরিবেশের তাপমাত্রা কম থাকায় পোনার পরিবহণজনিত পীড়ন কম হয়। পলিথিন ব্যাগে ৪-৫ লিটার পানি নিয়ে প্রতি ২০ টি ব্যাগে ১০ গ্রাম অক্সিজেন পাউডার, ১ টি ওরস্যালাইন ও মাল্টিভিটামিন বা ভিটামিন সি ১০ গ্রাম হারে ব্যবহার করলে মাছগুলো সতেজ থাকে।

পোনা টেকসইকরণ

গুলশা মাছের পোনা পুকুরে মজুদের উদ্দেশ্যে পরিবহণের পূর্বেই টেকসই করে নিতে হয়। সরবরাহের উদ্দেশ্যে পোনা ধরার আগের শেষরাত্র থেকে খাদ্য প্রদান বন্ধ রাখা দরকার। আহরণকৃত পোনাগুলো ট্যাংক বা সিস্টার্নে ৮-১২ ঘণ্টা ঝরণাধারায় রেখে টেকসই করা যায়।

মজুদ ঘনত্ব

গুলশা মাছ চাষের জন্য ৩-৫ সে.মি. আকারের বা ১৫০০-২০০০টি/কেজি আকারের পোনা মজুদ করা উত্তম। মজুদকৃত পোনাগুলো প্রায় সম-আকারের হওয়া উত্তম।

গুলশা মাছের পোনার মজুদ ঘনত্ব (প্রতি শতাংশে)

প্রজাতি	মডেল-১ (সংখ্যা)	মডেল-২ (সংখ্যা)	মডেল-৩ (সংখ্যা)	মডেল-৪ (সংখ্যা)
গুলশা	১০০০-১২০০	৬০০-৭০০	৭০০-৮০০	৭০০-৮০০
পাবদা	-	৩০০-৪০০	-	২০০-২৫০
রুই	৩-৫	৮-১০	৮-১০	৮-১০
কাতলা	১-২	২-৩	২-৩	৫-৮
শিং	-	১৫০-২০০	৩০০-৪০০	১০০-২০০
টেংরা	৫০-১০০	-	-	-
মোট=	১০৫৪-১৩০৭	১০৬০-১৩১৩	১০১০-১২১৩	১০১৩-১২৬৮

মজুদ পরবর্তী ব্যবস্থাপনা

খাদ্য ব্যবস্থাপনা

মডেল-১

কেজিতে পোনার সংখ্যা	খাদ্য প্রয়োগের হার (দেহের ওজনের শতকরা)	খাদ্যের ধরণ	৩৩ শতাংশে ৩৩,০০০-৪০,০০০ টি মাছের জন্য সম্ভাব্য দৈনিক খাদ্যের পরিমাণ (কেজি)

২০০০-২৫০০	৩০-৩৫	উন্নত নার্সারি ফিড (পাউডার)	৪.৫-৫.৫
১৫০০-২০০০	২৫-৩০	উন্নত নার্সারি ফিড (পাউডার)	৬-৭
৪৫০-৮০০	২০-২৫	উন্নত নার্সারি ফিড (পাউডার) + নার্সারি-২ ফিড (০.৫মি.মি. ভাসমান পিলেট)	১২-১৪
৪৫০-৩০০	২০-১৫	নার্সারি-২ ফিড (০.৫মি.মি. ভাসমান পিলেট)	১৫-১৮
৩০০-২২০	১৫-১২	স্টার্টার-১ (০.৮মি.মি. ভাসমান পিলেট)	১৭-২০
২২০-১৬০	১২-১০	স্টার্টার-১ (০.৮মি.মি. ভাসমান পিলেট)	১৯-২৩
১৬০-১১০	১০-৮	স্টার্টার-১ (০.৮মি.মি. ভাসমান পিলেট) + স্টার্টার-১ (১.০মি.মি. ভাসমান পিলেট)	২২-২৬
১১০-৮০	৮-৭	স্টার্টার-১ (১.০মি.মি. ভাসমান পিলেট)	২৬-৩১
৮০-৬০	৭-৬	স্টার্টার-১ (১.০মি.মি. ভাসমান পিলেট) +	৩০-৩৭
৬০-৪৫	৬-৫	স্টার্টার-১ (১.৫মি.মি. ভাসমান পিলেট)	৩৪-৪২
৪৫-৩০	৫-৪	স্টার্টার-১ (১.৫মি.মি. ভাসমান পিলেট)	৪০-৪৮

খাদ্য ব্যবস্থাপনা (মডেল-২, মডেল-৩ ও মডেল-৪)

মডেল-২, মডেল-৩ ও মডেল-৪ এর ক্ষেত্রে খাদ্য ব্যবস্থাপনা প্রায় মডেল-১ এর মতই। তবে যেহেতু কার্প জাতীয় মাছের পরিমাণ মডেল-২, মডেল-৩ ও মডেল-৪ এ তুলনামূলকভাবে মডেল-১ অপেক্ষা বেশি তাই সেক্ষেত্রে দুপুরে একবার কার্পজাতীয় মাছের দেহের ওজনের ২-৩% হারে ডুবন্ত খাদ্য প্রয়োগ করা প্রয়োজন।

বাণিজ্যিক খাদ্য ছাড়াও চাষিবৃন্দ উন্নতমানের সম্পূরক খাদ্য প্রস্তুত করে গুলশা মাছ চাষে ব্যবহার করতে পারেন। সম্পূরক খাদ্য তৈরির মডেল পাবদা মাছচাষ অংশে দ্রষ্টব্য।

সার ব্যবস্থাপনা

গুলশা মাছ চাষের ক্ষেত্রে সাধারণত প্রাকৃতিক খাদ্য সৃষ্টির জন্য সার ব্যবহারের প্রয়োজন নেই। কারণ সার ব্যবহারের কোন কারণে পানিতে ফাইটোপ্লাংকটন ব্লুম সৃষ্টি হলে বা পুকুরে পানির স্বচ্ছতা ১৫-২০ সে.মি. তে থাকলে গুলশা চাষের ক্ষেত্রে অক্সিজেন স্বল্পতা পরিলক্ষিত হতে পারে।

পানি ব্যবস্থাপনা: পাবদা মাছচাষ অংশে পানি ব্যবস্থাপনা দ্রষ্টব্য।

আহরণ ও বাজারজাতকরণ

- গুলশা মাছ সাধারণত ৪-৬ মাসে কেজিতে ৩৫-৪০ টি পর্যন্ত হয়ে যায়। এই সময়েই গুলশা মাছ বাজারজাত করা যায়।
- গুলশা মাছ জাল টেনে আহরণ করে পুরোপুরি ধরা যায় না। জাল টেনে মাছ কমানোর পর পুকুর সেচে আহরণ করতে হয়।
- জীবন্ত অবস্থায় বাজারজাত করলে গুলশা মাছের বাজারমূল্য বেশি পাওয়া যায়।
- জীবন্ত অবস্থায় বাজারজাত করার জন্য গুলশা মাছ আহরণের পর হাউজ বা ট্যাংকে ৮-১২ ঘণ্টা পানির ঝরণাধারায় রাখতে হয়।
- ১৬”×৩০” আকারের অক্সিজেনযুক্ত প্লাস্টিক ব্যাগে ৩৫-৪০ টি/কেজি আকারের গুলশা মাছ ব্যাগ প্রতি ১ কেজি হারে ৬-৭ ঘণ্টা জীবন্ত পরিবহণ করা যায়।

গলদা চিংড়ি চাষ ব্যবস্থাপনা

ভূমিকা

বাংলাদেশে স্বাদু পানিতে যে সকল প্রজাতির চিংড়ি পাওয়া যায় তার মধ্যে গলদা চিংড়ির অর্থনৈতিক গুরুত্ব অত্যধিক। বাংলাদেশে প্রায় ২৭ প্রজাতির স্বাদু পানির চিংড়ি পাওয়া যায় যার মধ্যে গলদার আকার-আকৃতি সর্ববৃহৎ। প্রকৃতিতে প্রাপ্ত গলদার ওজন সর্বোচ্চ ৪০০-৪৫০ গ্রাম এবং চাষ ক্ষেত্রে ১৫০-২০০ গ্রাম হতে পারে। প্রাকৃতিকভাবে গলদার পিএল, জুভেনাইল এবং পরিপক্ক গলদা সাধারণতঃ দেশের দক্ষিণাঞ্চলে আধা লবনাক্ত পানিতে পাওয়া যায়। প্রাকৃতিক নিয়মেই এরা খালে, বিলে, প্লাবণভূমিতে বা প্লণ্ঢাবিত ধানক্ষেতে প্রবেশ করে এবং সেখানেই বড় হয়। কিন্তু পরিবেশের বিপর্যয়ের কারণে বর্তমানে দেশের নদ-নদীতে তেমন আর গলদা বা গলদার পোনা পাওয়া যায় না। এছাড়া দেশের উপকূলীয় এলাকায় বাগদা চিংড়ির ঘেরে গলদা চিংড়ি একত্রে চাষ হচ্ছে। রপ্তানীকৃত চিংড়ির মধ্যে স্বাদু পানির চিংড়ির অবদান প্রায় ২৫% এবং এ পরিমাণ অনেকাংশে বৃদ্ধি করা সম্ভব।

গলদা চিংড়ি স্বাদু পানির চিংড়ি হওয়ায় এর চাষ সারা দেশের বদ্ধ ও মুক্ত উভয় জলাশয়ে করা সম্ভব। সাধারণভাবে বলা যায় সব এলাকায় চিংড়ি চাষ দ্রুত বৃদ্ধি পাচেছ। একই সাথে বৃদ্ধি পেয়েছে উৎপাদন। উল্লেখিত তথ্য থেকে দেখা যায়, চিংড়ির শতকরা প্রায় ১৮% ভাগ উৎপাদন গলদা চিংড়ি থেকে পাওয়া যায়।

গলদা চিংড়ির জীববিদ্যা

স্বাদু পানির চিংড়িসমূহের একটি প্রজাতি গলদা চিংড়ি নামে পরিচিত যার বৈজ্ঞানিক নাম *Macrobrachium rosenbergii*

চিত্রঃ *Macrobrachium rosenbergii*

আবাসস্থল

গলদা চিংড়ি ভারত-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের গ্রীষ্মমন্ডল ও ক্রান্তিয়মন্ডলের কাছাকাছি বেশী পাওয়া যায়। এ সমস্ত অঞ্চলের মধ্যে বাংলাদেশ, ভারত, শ্রীলংকা, মায়ানমার, থাইল্যান্ড, লাওস, কাম্পুচিয়া, মালয়েশিয়া, ইন্দোশিয়া, ভিয়েতনাম, ফিলিপাইন গুরুত্বপূর্ণ। এ সমস্ত দেশের নদী,হ্রদ, প্লণ্ঢাবনভূমি, হাওড়-বাওড় ইত্যাদি এদের প্রাকৃতিক বাসস্থান। এরা নদী মোহনা হতে প্রায় ৩০০ কিলোমিটার উজান পর্যন্ত পরিভ্রমণে সক্ষম। আধালবণাক্ত পানির মোহনাঞ্চল এবং নদী,হ্রদ, খাল, সেচখাল, পুকুর, ইত্যাদি স্বাদুপানির জলাশয় গলদা চিংড়ির প্রাকৃতিক বাসস্থান।

গলদা চিংড়ির পছন্দনীয় প্রাকৃতিক পানির গুণাবলীঃ

লবণাক্ততা	ঃ ০-১৫‰।	তাপমাত্রা	ঃ ২৬-৩২°সে.।
পি.এইচ	ঃ ৬.৫-৮.৫।	খরতা	ঃ ৬০-১৫০।
এলকালিনিটি	ঃ ৪০-১০০ পিপিএম।	এমোনিয়া	ঃ < ১.০ পিপিএম।
ঘোলাত্ব	ঃ ৩০-৪০ সে.মি. দৃশ্যমানতা।		

গলদা চিংড়ির বৈশিষ্ট্য ও খাদ্যাভ্যাস

গলদা চিংড়ি পানির তলদেশে বিচরণ করে এবং সেখানকার জীবিত ও মৃত বিভিন্ন প্রাণীজ ও উদ্ভিজ বস্তু এরা ভক্ষণ করে। এ কারণে খাদ্য স্বভাবে এরা সর্বভূক, স্বগোত্রভোজী এবং মাংসাসী স্বভাবের। প্রাকৃতিক পরিবেশে পাওয়া যায় এমন ছোট ছোট অমেরুদন্ডী প্রাণী, কুঁচো চিংড়ি, ছোট শামুক, পোকা-মাকড় ও লার্ভা, কৃমি, শেওলা, উদ্ভিদের টুক্রা এদের প্রিয় খাদ্য। এরা খাদ্য সংগ্রহ করে বড় পায়ের চিমটার সাহায্যে এবং খাদ্যের উপস্থিতি অনুভব করে এ্যান্টিনার সাহায্যে। পানিতে স্বাভাবিক খাদ্যের অভাব থাকলে সবল চিংড়ি দূর্বল চিংড়িকে খেয়ে ফেলতে পারে। বিশেষ করে খোলস বদলের সময় স্বজাতিভোজিতা বেশী দেখা যায়। প্রাকৃতিক খাদ্য ছাড়াও এরা কুড়া, ভূষি, দানাদার শস্য, খৈল, ফলের টুকরা, মাছের গুঁড়া, গবাদী পশুর রক্ত, শামুক-ঝিনুকের মাংস খেতে পছন্দ করে।

বৃদ্ধি ও খোলস ছাড়া

গলদার বৃদ্ধি নিরবিচ্ছিন্ন নয়। দেহ শক্ত খোলসে ঢাকা থাকে ফলে যখন খোলস বদলায় তখনই কেবল দৈহিক বৃদ্ধি ঘটে। খোলস পাল্টানোর অবস্থা নির্ভর করে খাদ্য, তাপমাত্রা, পানির গুণাগুণ, দেহের অবস্থা এবং কিছু হরমোনের কর্মকান্ডের উপর। খোলস পাল্টানোর পর এদের দেহ দূর্বল ও নরম থাকে। সে সময়ে এদের নিরাপদ আশ্রয়স্থল প্রয়োজন হয়। লার্ভা থেকে পোষ্ট-লার্ভায় পৌঁছুতে এরা ১১ বার খোলস পরিবর্তন করে। তবে এরা যত বড় হতে থাকে, খোলস পাল্টানোর হার ততই কমতে থাকে। দৈহিক ওজন ৫০ গ্রামের ওপর হলে এ হার ১৮-২১ দিনে একবার হতে পারে। স্ত্রী গলদার চেয়ে পুরুষ গলদার বৃদ্ধির হার বেশী।

স্ত্রী ও পুরুষ গলদা

স্ত্রী গলদার চেয়ে পুরুষ গলদা চিংড়ি বেশী বাড়ে, তাই একই বয়সের পুরুষ চিংড়ি স্ত্রী চিংড়ির চেয়ে আকারে খানিকটা বড় হয়। শিরোবক্ষ (Cephalothorax) আকারে মোটা এবং বড় হয় আর নিম্নোদর (Abdomen) অপেক্ষাকৃত সরু দেখায়। পুরুষ চিংড়ির সহজেই নজরে পড়ে এমন একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর দ্বিতীয় ভ্রমণপদ লম্বা, মোটা এবং চিমটি বিশিষ্ট। এই দ্বিতীয় বাহুর দ্বারা পুরুষ চিংড়ি স্ত্রী চিংড়িকে সঙ্গমকালে দৃঢ়ভাবে আলিঙ্গনে আবদ্ধ রাখে। পুরুষ চিংড়ির আরো কিছু বৈশিষ্ট্য আছে যেমন, প্রথম উদর খন্ডের তলার খোলসের মাঝখানে একটা ছোট কাঁটার মত দেখা যায় আর দ্বিতীয় সাঁতারের পায়ের ভেতরের দিকের পত্রের (Endopodite) গোড়ায় লোমের মত এ্যাপেন্ডিক্স ম্যাসকুলিনা (Appendix masculina) থাকে। জুভেনাইল অবস্থায় পুরুষ চিংড়ি চেনার উপায় এই এ্যাপেন্ডিক্স ম্যাসকুলিনা দেখেই করতে হয়। কারণ তখন অন্যান্য বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে না। স্ত্রী চিংড়ির মাথা ও দ্বিতীয় বাহু অপেক্ষাকৃত ছোট থাকে এবং নিম্নোদরের তলারদিকে ডিম ধারণের জন্য নিম্নোদর অপেক্ষাকৃত চওড়া হয়। পিঠের খোলসগুলি বড় হয় এবং উভয় দিকে নেমে এসে ডিমগুলি ঢেকে রাখতে সাহায্য করে। পুরুষের জনন অংগ পঞ্চম ভ্রমণ পদের গোড়ায়, আর স্ত্রীর যৌন অংগ তৃতীয় ভ্রমণ পদের গোড়ায় অবস্থিত। পরিপক্ক স্ত্রীর মাথার নীচে ও পার্শ্বে গোলাপী রং/কমলা রং এর আভা দেখা যায়।

বাহ্যিক গঠন

গলদা চিংড়ি মেরুদন্ডহীন প্রাণী। এদের দেহ শক্ত কাইটিনের আবরণে ঢাকা, যাকে বহি:কংকাল বলে। গলদা চিংড়ির দেহ ১৯টি অংশে বিভক্ত। এর মধ্যে ৫টি অংশ মাথায়, ৮টি বুকে এবং ৬টি নিম্নাঙ্গে অবস্থিত। মাথার উপাঙ্গসমূহ খাদ্য খুঁজতে, বুকের উপাঙ্গসমূহ চলাফেরায় এবং নিম্নাঙ্গের উপাঙ্গসমূহ সাঁতার কাটার কাজে ব্যবহৃত হয়। এদের মাথা ও বুকের খোলস মিশে একটি মাত্র আবরণ তৈরী করেছে। যাকে শিরোবক্ষ বলে এবং শক্ত আবরণটিকে ক্যারাপ্যান বলে। উর্ধাঙ্গের উপাঙ্গগুলোকে ভ্রমণপদ এবং নিম্নাঙ্গের উপাঙ্গগুলোকে সন্তরণপদ বলে। শিরোবক্ষের সামনে একটি করাত আছে, যা খাঁজ কাটা। এর মাধ্যমে চিংড়ির জাত বুঝা যায়।

জীবন চক্র

জীবনের পর্যায়- গলদার জীবন চক্রে ৪টি অবস্থাই প্রধান। যেমন- ডিম, লার্ভা, পোষ্ট লার্ভা এবং বড় চিংড়ি।

প্রজননকাল

গলদা চিংড়ি প্রায় সারা বছর প্রজননে সক্ষম হলেও ডিসেম্বর থেকে জুলাই মাসই গলদার প্রধান প্রজননকাল। মে-জুন মাসে উপকূলীয় নদীগুলোতে বেশী পোনা পাওয়া যায়।

মিলন ও ডিম পাড়া

গলদা চিংড়ি ৫-৬ মাসের মধ্যেই পরিপক্ক হয়। অনুকূল পরিবেশ ও খাদ্যের উপর পরিপক্কতা নির্ভরশীল। স্ত্রী চিংড়ির জননতন্ত্র কেরাপেসের তলায় থাকে ও ডিম পাড়ার ২-৩ দিন আগে দেখতে কমলা রং এর মতো হয়। চিংড়ি নিশাচর প্রাণী। অধিকাংশ মূল কর্মকান্ড রাতে ঘটে, যেমন -খাদ্য গ্রহণ, খোলস পাল্টানো, সংগম এবং ডিম পাড়া । একটি পুরুষ চিংড়ি ৩-৪ টি স্ত্রী চিংড়ির সাথে সঙ্গমে সক্ষম।

চিংড়ির পুষ্টিগুন

চিংড়ি মূলত মনুষ্য খাদ্যে প্রোটিন সরবরাহ করে থাকে, তবে প্রটিনের পাশাপাশি অন্যন্য পুষ্টি উপাদান ও ভিটামিন সরবরাহ করে থাকে প্রতি ১০০ গ্রাম ওজনের তাজা চিংড়িতে নিম্নের সারণীতে প্রদত্ত উপাদানসমূহ পাওয়া যায়:

গলদা চিংড়ি (তাজা)	আহার উপযোগী (%)	জলীয় অংশ (গ্রাম)	আমিষ (গ্রাম)	স্নেহ (গ্রাম)	খনিজ পদার্থ (গ্রাম)	শর্করা (গ্রাম)	খাদ্য শক্তি (ক্যালরি)	ক্যালসিয়াম (মিঃগ্রাম)	ফসফরাস (মিঃগ্রাম)	লোহা (মিঃগ্রাম)	ভিটামিন (মিঃ গ্রাম)		
											বি১	বি২	নায়াসিন

	৭৫	৭৭.৪	১৯.১	১.০	১.৭	০.৮	৮৯	৩২৩	২৭.৮	৫.৩	০.০১	০.১০	৪.৮

গলদা চিংড়ি চাষ পদ্ধতি

আমাদের দেশে ২ টি পদ্ধতিতে গলদা চিংড়ি চাষ করা হয়। একক চাষ পদ্ধতি ও মিশ্র চাষ পদ্ধতি।

একক চাষ পদ্ধতি:

এ পদ্ধতির ক্ষেত্রে শুধুমাত্র গলদা চিংড়ির জুভেনাইল (কিশোর চিংড়ি) ঘের/পুকুরে ছাড়া হয়। এর সাথে অন্য কোন প্রজাতির মাছ বা চিংড়ি ছাড়া হয় না। বর্তমান সময়ে একক চাষ পদ্ধতিতে কেবলমাত্র পুরুষ চিংড়ি চাষের প্রচলন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। পুরুষ চিংড়ি স্ত্রী চিংড়ির চেয়ে বড় হয় এবং চাষ লাভজনক। শুধুমাত্র পুরুষ চিংড়ি আলাদাভাবে চাষ করলে উৎপাদন বেশী হয়।

সুবিধা:

- এ পদ্ধতিতে চিংড়ি দ্রুত বৃদ্ধি পায়।
- একসাথে একই আকারের অধিক চিংড়ি আহরণ করা যায়
- অধিক ঘনত্বে চাষ করা যায়।
- ভালভাবে পরিচর্যা করা যায়।
- খাদ্য প্রয়োগ সহজ হয়।
- আর্থিকভাবে বেশী লাভবান হওয়া যায়।

এ পদ্ধতিতে পুকুরের সকল স্তরের খাদ্য ব্যবহৃত হয় না। এ অসুবিধা নিরসনের জন্য উপরের স্তরে অবশ্যই স্বল্প পরিমাণ কার্পজাতীয় মাছের পোনা মজুদ করতে হবে।

মিশ্র চাষ পদ্ধতি

এ জাতীয় চাষ পদ্ধতিতে জলাশয়ের খাদ্য ও বাসস্থানের ব্যাপারে অন্য প্রজাতির মাছের সাথে প্রতিযোগিতা হয় না। বর্তমানে উপকূলীয় জেলাসমূহে বাগদা-গলদা-কার্প জাতীয় মাছ একই পুকুরে পর্যায়ক্রমে চাষ করে ভাল উৎপাদন পাওয়া যাচ্ছে।

সুবিধা: পুকুরের সর্বস্তরের খাবারের ব্যবহার নিশ্চিত হয়। তুলনামুলকভাবে লাভজনক। রোগ ব্যাধি কম হয়। তবে গলদার সাথে চাষযোগ্য কার্পের প্রজাতি নির্বাচন সঠিক না হলে কাঙ্খিত লাভ নাও হতে পারে। মজুত পরবর্তী ব্যবস্থাপনায় অধিক মনোযোগী হতে হয় বিধায় সব চাষির জন্য সম্ভব নাও হতে পারে।

মিশ্র চাষ প্রজাতি নির্বাচন:

গলদা চিংড়ির সাথে সিলভার কার্প, গ্রাস কার্প ও কাতলা মিশ্র চাষে ব্যবহার করা যায়।

গলদা চিংড়ি খামারের জন্য উপযুক্ত স্থান নির্বাচনে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ বিবেচনা করা অত্যন্ত জরুরী:

১) **দূষণমুক্ত এলাকা:** শহর বা শিল্প এলাকা যেখানকার বর্জ্য পদার্থ পার্শ্ববর্তী নদী/খালে পড়ে সে সব এলাকায় চিংড়ি খামার স্থাপন করা ঝুঁকিপূর্ণ। এ ছাড়া কৃষিকাজে ব্যবহৃত কীটনাশক সার ইত্যাদি এলাকায় চিংড়ি খামার স্থাপন ঝুঁকিপূর্ণ। অতএব এ সব এলাকায় চিংড়ি খামার স্থাপন না করাই উত্তম, মানগ্রোভ ও জীববৈচিত্র্য নষ্ট করে চিংড়ি চাষ করা যাবে না।

২) **প্লাবন ও অতি বৃষ্টিজনিত ঢলমুক্ত এলাকা:** এ সকল এলাকায় পানির বিভিন্ন গুণাগুন হঠাৎ পরিবর্তনের ফলে চিংড়ি চাষ ব্যাহত হয়। তাছাড়া এ সকল এলাকায় বাঁধ নির্মাণ ব্যয় বহুল ও পানিতে জৈব পদার্থের পরিমাণ অনেক বেশী থাকে যা ক্ষতির কারণ। অতএব, এ সব এলাকায় চিংড়ি খামার স্থাপন না করাই উত্তম।

৩) **পানির উৎস:** চিংড়ি খামার এমন স্থানে স্থাপন করতে হবে যেখানে স্বাদু পানির উৎস্য থেকে সহজেই পানি খামারে ঢুকানো ও বের করা যায় এবং পানি দূষণমুক্ত হয়।

৪) **পোনা ও চাষ উপকরাণাদির প্রাপ্যতা:** খামার এমন স্থানে স্থাপন করতে হবে যেখানে চিংড়ি পোনা সহজে সংগ্রহ করা যায় এবং চাষ উপকরণাদি যেমন-চুন, সার, খাদ্য ইত্যাদি সহজে সংগ্রহ ও ব্যবহার করা যায়।

৫) **অবকাঠামোগত সুবিধাদি:** খামার স্থাপন কালে এলাকায় অবকাঠামোগত সুবিধা যেমন-বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ, সড়ক যোগাযোগ, বিপনন ইত্যাদির সুবিধা থাকা বাঞ্ছনীয়

৬) **অন্যান্য:** নিরাপত্তা, সামাজিক পরিবেশ, চিকিৎসা সুবিধা ইত্যাদি বিষয়াদি খামার স্থাপন কালে বিবেচনা করা উচিত।

লবনাক্ততা:

গলদা চিংড়ি স্বাদু পানির চিংড়ি তবে স্বল্প লবনাক্ততায় গলদা চিংড়ির চাষ হয়। চাষের ক্ষেত্রে পানির লবনাক্ততা ০-৪ পিপিটি হওয়া উত্তম।

পুকুর প্রস্তুতি

(ক) চাষ এলাকার তলদেশ শুকানো: বাগদা চিংড়ি চাষ অংশ দ্রষ্টব্য;

(খ) পাড় মেরামত ও কালো কাদা অপসারণ: বাগদা চিংড়ি চাষ অংশ দ্রষ্টব্য;

(গ) চাষ দেয়া: বাগদা চিংড়ি চাষ অংশ দ্রষ্টব্য;

(ঘ) তলদেশ ধৌত করা: বাগদা চিংড়ি চাষ অংশ দ্রষ্টব্য।

রাক্ষুসে ও অবাঞ্চিত মাছ দূরীকরণ: বাগদা চিংড়ি চাষ অংশ দ্রষ্টব্য;

চুন প্রয়োগ: বাগদা চিংড়ি চাষ অংশ দ্রষ্টব্য;

চাষক্ষেত্রে ধাপে ধাপে পানি উত্তোলন: বাগদা চিংড়ি চাষ অংশ দ্রষ্টব্য;

পুকুর পাড়ে নেট দিয়ে বেষ্টনি নির্মাণ

বৃষ্টির সময়, অমাবশ্যা ও পূর্ণিমায় গলদা চিংড়ি পুকুর থেকে উঠে আসার সম্ভাবনা থাকে। এছাড়া অবাঞ্চিত প্রাণী, গৃহপালিত প্রাণী চিংড়ি চাষের পুকুরে যাতে না আসতে পারে বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য পুকুর প্রস্তুতির পূর্বে পুকুরের/ ঘেরের পাড় দিয়ে ৩ (তিন) ফুট উচু মশারীর নেট/ জাল দিয়ে বেষ্টনী (Fencing) নির্মাণ করা প্রয়োজন। উল্লেণ্খ্য মশারীর নেট পাড়ের মাটি ৩”- ৪” গর্ত করে পুতে দেয়া উচিত। এছাড়া পুকুরের পাড়ে পাখি বসতে পারে এমন বড় গাছ রাখা যাবে না এবং পুকুরে যাতে পাখি ঢুকতে না পারে সেটা নিশ্চিত করার জন্য পুকুরের উপর বার্ড ফেন্সিং রাখা উচিত।

আশ্রয়স্থল স্থাপন

খোলস বদলের সময় চিংড়ি দূর্বল থাকে। তখন এদের জন্য নিরাপদ আশ্রয়স্থলের প্রয়োজন হয়। কারণ সব চিংড়ি একই সময়ে খোলস বদলায় না। এ সময় সবল চিংড়ি অর্থাৎ যে গুলো খোলস বদলায় না সেগুলো দূর্বলগুলোকে ধরে খেয়ে ফেলতে পারে। পুকুর/ঘেরের তলায় কিছু জলজ উদ্ভিদ থাকলে (হাইড্রিলা, নাজাস) তা চিংড়ির আশ্রয়স্থল হিসেবে কাজ করে। এছাড়াও তাল বা নারিকেলের শুকনা পাতা, বাঁশের কঞ্চি, ভাঙ্গা প্লাষ্টিকের পাইপ, ভাঙ্গা কলসের টুকরা, গাছের ডাল (হিজলের শুকনা ডাল উত্তম) ব্যবহার করে চিংড়ির আশ্রয়স্থল তৈরী করে দেয়া যায়।

আশ্রয়স্থল স্থাপনের গুরুত্ব

- চুরির হাত হতে চিংড়িকে রক্ষা করে এবং উচ্চ তাপমাত্রা থেকে চিংড়িকে রক্ষা করে;
- খোলস পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট বিরূপ পরিবেশ থেকে চিংড়িকে রক্ষা করে;
- সাবষ্টেটাম হিসেবে প্রাকৃতিক খাদ্য (পেরিফাইটন) জন্মাতে সাহায্য করে; এবং
- উকুন বা ঘা রোগে ক্ষতস্থান ঘষাঘষিতে কার্যকরী ভূমিকা রাখে।

আশ্রয়স্থল স্থাপন কৌশল

শুকনো তাল বা নারিকেলের পাতা ঘেরের তলায় সমান্তরালভাবে অথবা কাত করে মাটিতে পুঁতে দিতে হবে যাতে পাতার অংশ মাটি থেকে একটু উপরে থাকে। বাঁশের কঞ্চি অনেকগুলো একত্রে আটি বেঁধে অথবা প্লাষ্টিকের পাইপের খন্ড বা মাটির তৈরী ছোট কলস পুকুরের তলায় মাটির উপর রেখে দিতে হবে। শুকনো তাল বা নারিকেলের পাতা প্রতি ২ শতাংশে ১-২ টি হিসেবে স্থাপন করতে হবে। অন্যান্য বস্তুগুলো আনুপাতিক হারে ব্যবহার করতে হবে। পিএল বা জুভেনাইল মজুদের ১-২ দিন আগে আশ্রয়স্থল স্থাপন করতে হবে।

আশ্রয়স্থল স্থাপনের সতর্কতা

- কোন অবস্থাতেই কাঁচা পাতাসহ ডাল বা কঞ্চি পুকুরে দেয়া যাবে না।
- কয়েক মাস পর পর ডাল বা কঞ্চি তুলে শুকিয়ে পুনরায় ঘের/পুকুরে দিতে হবে।

প্রাকৃতিক খাদ্য তৈরী

প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদনের জন্য খামারে নিয়মিত ও পরিমিত সার প্রয়োগ করতে হয়।

- একর প্রতি ১ কেজি ইউরিয়া ও ১ কেজি টিএসপি পানিতে ছিটিয়ে দিতে হবে। টিএসপি ২৪ ঘন্টা ভিজিয়ে রাখতে হবে। সার প্রয়োগের সময় টিএসপি পানিতে গুলে এবং ইউরিয়া ঘেরে/খামারে প্রয়োগ করতে হবে।
- সার রৌদ্রকরোজ্জ্বল দিনে প্রদান করতে হবে;
- সার প্রয়োগের সাথে সাথে পানির গভীরতা ৬০ সেঃ মিঃ থেকে ক্রমান্বয়ে গড়ে ১.০০-১.২০ মিটার করতে হবে;
- সার প্রয়োগের পর পানি পরিবর্তন করা যাবে না;
- পানির রং সবুজ/বাদামী হলে ধরে নেয়া যায় পানিতে প্লন্টাংকটন (প্রাকৃতিক খাদ্য) তৈরি হয়েছে যা পোনা ছাড়ার জন্য উপযুক্ত;
- সার প্রয়োগে পানির রং সবুজাভ না হলে অন্য জলাশয় থেকে উদ্ভিদকণা (ফাইটোপ্লন্টাংকটন) এনে চাষ ক্ষেত্রে দিতে হবে এবং পুনরায় একই পরিমাণে সার একইভাবে প্রয়োগ করতে হবে।

তাছাড়া পানি পোনা ছাড়ার উপযোগী বা পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক খাদ্য তৈরী করতে একর প্রতি ৫ কেজি চালের কুড়া ও ৫ কেজি চিটাগুড় ৫০ গ্রাম ইষ্ট সহযোগে ২৪-৪৮ ঘন্টা ভিজিয়ে রেখে ব্যবহার করলে ভাল ফল পাওয়া যায়।

পোনা মজুদ

ভাল মানের পিএল সনাক্ত ও সংগ্রহ

শুধু সঠিক সংখ্যায় পিএল বা জুভেনাইল মজুদ করলেই ভাল উৎপাদন পাওয়া যাবে না। বেশী উৎপাদন পাওয়ার জন্যে সঠিক মজুদ ঘনত্বের পাশাপাশি ভাল মানসম্পন্ন সুস্থ সবল পিএল বা জুভেনাইল মজুদ করতে হবে। পিএল বা জুভেনাইলের উৎস এবং হ্যান্ডেলিং গুণগতমানকে প্রভাবিত করে। যে কোন কারণেই উহাদের গুণগতমান খারাপ হোক না কেন ঐ সমস্ত পোনা ও পিএল বা জুভেনাইল মজুদ করা হলে চাষি বিরাট ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে। যথাযথ মানসম্পন্ন পোনা ও পিএল বা জুভেনাইল মজুদ না করা হলে:

- মজুদের পর ব্যাপক হারে মারা যেতে পারে;
- বৃদ্ধির হার কম হয় এবং সময়মত বিক্রয়যোগ্য না হওয়ায় বাজার মূল্য কম পাওয়া যেতে পারে।

সেকারণে পুকুরে মজুদের পূর্বে পোনার যথাযথ গুণগতমান সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে। ভাল ও খারাপ জুভেনাইল সনাক্তকরণের বৈশিষ্ট্য:

চিংড়ির জুভেনাইল

- ভাল জুভেনাইলের দেহ নীলাভ-সাদা/ছাই রংয়ের, খারাপ জুভেনাইল লালচে/ কালচে রংয়ের হয়;
- ভাল জুভেনাইলের এন্টেনা ও উপাঙ্গসমূহ ভাঙ্গা থাকে না;
- ভাল জুভেনাইলের খোলস পরিস্কার কিন্তু খারাপ জুভেনাইলের খোলস কালচে ও শেওলাযুক্ত; এবং
- ভাল জুভেনাইলের খাদ্য থলি পরিপূর্ণ, খারাপ জুভেনাইলে খাদ্য থলি আংশিক পরিপূর্ণ বা খালি থাকে।

মজুদ ঘনত্ব

পুকুরে শুধুমাত্র সার ব্যবহারে মজুদ ঘনত্ব কিছু কম এবং সার ও খাদ্য দুই-ই ব্যবহারে মজুদ ঘনত্ব কিছু বেশী হতে পারে। আবার জলাশয়ে আংশিক পানি বদল ও বায়ু সঞ্চালন ব্যবস্থা থাকলে আরও অধিক ঘনত্বে মজুদ করা যেতে পারে। কোন পুকুরে পোনার মজুদ ঘনত্ব ও মজুদ হার প্রকৃতই উহার ভৌত রাসায়নিক গুণাবলী ও চাষ ব্যবস্থাপনার উপর নির্ভরশীল।

উন্নত সনাতন পদ্ধতিতে মজুদ ঘনত্ব (১.০০ একর জলাশয়ের জন্য):

প্রজাতি	নমুনা-১	নমুনা-২
গলদা জুভেনাইল (৩-৪ গ্রাম)	৫০০০	৬০
সিলভার কার্প	১৫০	২

কাতলা	৫০	১
গ্রাসকার্প	১০০-২০০	১-২

বাণিজ্যিক পদ্ধতিতে মজুদ ঘনত্ব (১.০০ একর জলাশয়ের জন্য):

প্রজাতি	নমুনা-১	নমুনা-২	মন্তব্য
গলদা জুভেনাইল (৩-৪ গ্রাম)	১০০০০	১১০০০	১ হেঃ জলাশয়ে ১ অশ্বক্ষমতার ৪টি এ্যায়রেটর ব্যবহার করলে মজুদ ঘনত্ব প্রতি শতাংশে ১৬০-২৪০ টি করা যেতে পারে। পুরুষ ও স্ত্রী জুভেনাইল আলাদা পুকুরে মজুদ করলে ভাল ফল পাওয়া যায়।
সিলভার কার্প	১০০-২০০	২০০-৩০০	
কাতলা	৫০	১০০	

কার্প-গলদা মিশ্র চাষ (১.০০ একর জলাশয়ের জন্য):

প্রজাতির নাম	পোনা/ জুভেনাইল এর আকার	মজুদ ঘনত্ব/শতাংশ
কাতলা	১২-১৫ সে.মি	৫০০
সিলভার কার্প	১২-১৫ সে.মি	১৫০০
রুই	১২-১৫ সে.মি	১০০০
গ্রাসকার্প	১২-১৫ সে.মি	১০০
মৃগেল	১২-১৫ সে.মি	৮০০
কমন কার্প	১২-১৫ সে.মি	১০০
গলদা জুভেনাইল	৫-৭ সে.মি	১৫০০
	সর্বমোট	**৫৫০০**

পিএল/জুভেনাইল ও মাছের পোনা পরিবহন

আমাদের দেশে বর্তমানে আধুনিক পদ্ধতিতে পলিথিন ব্যাগে কার্প জাতীয় মাছের রেণু ও চিংড়ির পিএল এবং সনাতন পদ্ধতিতে ড্রাম বা এলুমিনিয়ামের হাড়িতে চিংড়ির জুভেনাইল ও মাছের চারা পোনা পরিবহন করা হয়ে থাকে। তবে সুযোগ থাকলে আধুনিক পদ্ধতিতে চারা পোনা ও জুভেনাইল পরিবহনও অধিক নিরাপদ। সনাতন পদ্ধতিতে পরিবহনকালে ড্রাম বা এলুমিনিয়ামের হাড়ির গায়ে ধাক্কা লেগে পোনার দেহে ক্ষতের সৃষ্টি হতে পারে এবং পাত্রের পানিতে অক্সিজেন স্বল্পতা দেখা দিতে পারে, এমন কি ব্যাপক হারে পোনা মারা যেতে পারে। পক্ষান্তরে অক্সিজেন ব্যাগে পরিবহনকালে অক্সিজেনের অভাব হয় না ও পোনার শারীরিক ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে না। সেকারণে সনাতন পদ্ধতিতে পোনা ও জুভেনাইল পরিবহনে অধিক সতর্কতা ও প্রস্তুতির প্রয়োজন হয়।

পোনা পরিবহন ঘনত্ব

পরিবহন ঘনত্ব মূলতঃ নির্ভর করে পিএল, জুভেনাইল ও চারা পোনার আকার, ওজন এবং পরিবহন দূরত্বের উপর। সাধারণভাবে ৩৬" x ২০" আকারের পলিথিন ব্যাগ পিএল বা পোনা পরিবহনে ব্যবহৃত হয়।

চিংড়ির পোনার আকার ও দুরত্বের ওপর ভিত্তি করে পরিবহন ঘনত্ব :

পোনার আকার/ধরন	পরিবহন ঘনত্ব/লিটার	পরিবহন সময় (ঘন্টা)	পরিবহন পদ্ধতি
পোষ্ট লার্ভা-২০	৫০০-১০০০	১২-১৬	অক্সিজেনসহ পলি ব্যাগ
পোষ্ট লার্ভা-৩০-৩৫	৩৫০-৫০০	৬	অক্সিজেনসহ পলি ব্যাগ
জুভেনাইল (৫-৭ সে:মি:)	১০-২০	৩-৬	অক্সিজেনসহ পলি ব্যাগ

পিএল/জুভেনাইল ও মাছের পোনা খাপ খাওয়ানো এবং অবমুক্তি: বাগদা চিংড়ি চাষ অংশ দ্রষ্টব্য;

খাদ্য ব্যবস্থাপনা

মাছ ও চিংড়ির পুষ্টি চাহিদা

সুস্থ সবলভাবে বেঁচে থাকা ও দ্রুত দৈহিক বৃদ্ধির জন্য মাছের খাদ্যেও সুষম খাবারের সবগুলো উপাদান অপরিহার্য। কিন্তু এ সব খাদ্য উপাদানের মধ্যে আমিষ সবচেয়ে বেশী মাত্রায় প্রয়োজন। সেকারণে মাছ ও চিংড়ির পুষ্টি চাহিদা বলতে সাধারণভাবে আমিষের চাহিদাকে বোঝানো হয়। মাছের খাদ্য তৈরীতে যে সব উপকরণ ব্যবহার করা হয় সেগুলোর প্রত্যেকটিতে খাদ্যের অন্যান্য উপাদান যেমন শর্করা, চর্বি ও খনিজ লবণ বিদ্যমান থাকে। সেকারণে আমিষের চাহিদা পূরণ হলে অন্যান্য পুষ্টি উপাদানগুলোর খুব একটা অভাব হয় না। মাছ ও চিংড়ির পুষ্টি চাহিদা এদের বয়স ও প্রজাতির উপর নির্ভর করে। চিংড়ির খাদ্যে আমিষের পরিমান ৩০% এর বেশী হওয়া বাঞ্চনীয়।

খাদ্য তৈরী

মাছ বা চিংড়ির খাদ্যের পুষ্টিমান নির্ণয়ে শুধুমাত্র আমিষের মাত্রা হিসেব করা হয়। সাধারণ ঐকিক নিয়মে একাধিক উপকরণ ব্যবহার করে তৈরী খাদ্যের পুষ্টিমান সহজেই নিরূপণ করা যায়। নীচে একটি উদাহরণের সাহায্যে খাদ্যে আমিষের মাত্রা নিরূপণ পদ্ধতি দেখানো হলো। ধরা যাক ফিশমিল, সরিষার খৈল, গমের ভুষি এবং বাইন্ডার হিসেবে আটা ব্যবহার করে ১ কেজি খাদ্য তৈরী করা হবে। এ ক্ষেত্রে ব্যবহৃত উপকরণসমূহের অনুপাত হবে ফিসমিল ২৫%, সরিষার খৈল ২৫%, গমের ভুষি ৪০% এবং আটা ১০%। তাহলে এ সমস্ত উপকরণগুলো ব্যবহার করে তৈরী খাদ্যে আমিষের মাত্রা হবে:

উপকরণ	বিদ্যমান আমিষের পরিমান (%)	ব্যবহার মাত্রা (%)	প্রয়োজনীয় পরিমান (গ্রাম)	সরবরাহকৃত আমিষ (%)
ফিসমিল	৫৬.৬১	২৫	২৫০	১৪.১৫
সরিষার খৈল	৩০.৩৩	২৫	২৫০	৮.৩৩
গমের ভুষি	১৪.১৭	৪০	৪০০	৫.৮২
আটা	১৭.৭৮	১০	১০০	১.৭৮
খনিজ লবণ	-	-	১ চা চামচ	-
ভিটামিন প্রিমিক্স			১০০ কেজিতে ১ চা চামচ	-

মোট		১০০	১০০০	৩০.০৮

খাদ্য তৈরীতে উপকরণ ব্যবহারের অনুপাত

মাছ ও চিংড়ির খাদ্য তৈরীর জন্য কম মূল্যের উৎকৃষ্টমানের খাদ্য উপকরণ এমনভাবে বেছে নিতে হবে যাতে এদের পুষ্টি চাহিদা পূরণ হয়, খাদ্যের মান বজায় থাকে এবং খাদ্য প্রয়োগ বাবদ পুঁজি বিনিয়োগ কম হয়। আমাদের দেশে প্রচলিত খাদ্য উপকরণ যেমন- খৈল, কুড়া, গমের ভুষি, ফিসমিল, আটা, চিটাগুড় ইত্যাদি ব্যবহার করেই মাছ ও চিংড়ির পুষ্টি চাহিদা পূরণে সক্ষম এমন সম্পূরক খাদ্য তৈরী করা যেতে পারে। নীচে চাষির আর্থিক সামর্থ্য ও পুষ্টি চাহিদা বিবেচনা করে কার্প-চিংড়ি মিশ্রচাষের পুকুরে প্রয়োগের জন্য খাদ্য তৈরীতে উপকরণ ব্যবহারের নমুনা উল্লেণ্ঢখ করা হলো:

উপাদানের নাম	নমুনা-১		নমুনা-২	
	ব্যবহার মাত্রা(%)	গ্রাম/কেজি খাদ্য	ব্যবহার মাত্রা(%)	গ্রাম/কেজি খাদ্য
ফিসমিল	৩০	৩০০	৩০	৩০০
সরিষার খৈল	৪০	৪০০	৩০	৩০০
হাড়ের গুড়া	-	-	৫	৫০
পলিস কুড়া/গমের ভুষি	২০	২০০	২০	২০০
আটা	৯	৯০	১০	১০০
চিটাগুড়	১	১০	৫	৫০
খনিজ লবণ	-	১ চা চামচ	-	১ চা চামচ
ভিটামিন প্রিমিক্স	-	১ চা চামচ	-	১ চা চামচ
মোট	১০০	১০০০	১০০	১০০০

খাদ্যের প্রয়োগ মাত্রা

মাছ ও চিংড়ি চাষের পুকুরে খাদ্য প্রয়োগের হার নির্ভর করে মূলতঃ পুকুরের প্রাথমিক উৎপাদনশীলতা, চাষ ব্যবস্থাপনা, খাদ্যের অবস্থা ও পুষ্টিমান ইত্যাদি বিষয়ের ওপর। বড় মাছ ও চিংড়ির চেয়ে ছোট অবস্থায় এদের খাদ্য চাহিদা অনেক বেশী। সেকারণে মজুদ পুকুরে প্রথম দিকে বেশী মাত্রায় খাবার প্রয়োগ করতে হয়। তবে মাছ ও চিংড়ি বড় হওয়ার সাথে সাথে খাদ্য প্রয়োগ হার কমে গেলেও মোট খাদ্যের পরিমান তুলনামূলকভাবে বেড়ে যায়। নীচের সারণীতে উন্নত ব্যাপক পদ্ধতির চাষ ব্যবস্থাপনায় মাছ ও চিংড়ি চাষের পুকুরে দৈনিক খাদ্য প্রয়োগের নমুনা মাত্রা উল্লেণ্ঢখ করা হলো:

- জুভেনাইল মজুদ করা হলে চিংড়ির দেহ ওজনের ১০-৫%;
- পিএল মজুদ করা হলে ৪ সপ্তাহ পর্যন্ত স্টার্টার ফিড।

স্টার্টার ফিডের সুপারিশকৃত মাত্রা

১ম সপ্তাহ ২০ গ্রাম/১০০০ পিএল   ২য় সপ্তাহ ৪০ গ্রাম/১০০০ পিএল

৩য় সপ্তাহ ৬০ গ্রাম/১০০০ পিএল   ৪র্থ সপ্তাহ ৮০ গ্রাম/১০০০ পিএল।

তবে ব্রান্ডভেদে খাদ্য প্রয়োগ মাত্রায় তারতম্য হতে পারে। সেক্ষেত্রে খাদ্যের প্যাকেটে রক্ষিত নির্দেশনাবলী অনুসরণ করা প্রয়োজন।

সম্পূরক খাদ্য তৈরী

বিভিন্ন ধরনের উপকরণ ব্যবহার করে খুব সহজেই মাছ ও গলদা চিংড়ির খাদ্য তৈরী করা যায়। চাষি নিজের হাতেই তা করতে পারেন। সম্ভব হলে মিনসিং মেশিন ব্যবহার করেও খাদ্য তৈরী করা যেতে পারে। নীচে মাছ ও চিংড়ি চাষের পুকুরে প্রয়োগের জন্য মিশ্র খাদ্য তৈরীর পদ্ধতি সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো:

- খৈল কমপক্ষে ১২ ঘণ্টা পূর্বে দ্বিগুণ পানিতে ভিজিয়ে রেখে উপর থেকে ভাসমান তৈলযুক্ত পানি ফেলে দিতে হবে;
- চালের কুঁড়া, ভূষি ও ফিসমিল ভালভাবে চালুনি দ্বারা চেলে নিতে হবে;
- চালের খুদ ব্যবহার করা হলে সিদ্ধ করে নিতে হবে;
- সমস্ত উপকরণগুলো একটি পাত্রে নিয়ে ভালভাবে মেশাতে হবে;
- আটা পরিমান মত পানিতে ফুটিয়ে আঠালো পদার্থ তৈরী করতে হবে;
- উপকরণগুলো আঁঠালো পদার্থ দ্বারা মেখে কাঁই তৈরী করে ছোট ছোট বল বানাতে হবে;

খেয়াল রাখতে হবে বাসি বা পচাঁ কোন উপকরণ যেন খাদ্যে না ঢোকে।

সম্পূরক খাদ্য ক্রয়ের সময় বিবেচ্য বিষয়ঃ

- ➢ খাদ্য বিক্রেতার মৎস্য অধিদপ্তরের হাল নাগাদ লাইসেন্স;
- ➢ খাবারের প্যাকেটের গায়ে খাদ্য সংক্রান্ত তথ্যাবলী আছে কিনা;
- ➢ খাদ্যের উৎপাদন ও মেয়াদ উর্ত্তীণ তারিখ ঠিক আছে কিনা।

সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগ

গলদা চিংড়ি নিশাচর। দিনের আলোর চেয়ে এরা অন্ধকারে চলাচল ও খাদ্য গ্রহণ করতে পছন্দ করে। সেজন্য কার্প-চিংড়ি মিশ্রচাষের পুকুরে প্রতি দিনের প্রয়োজনীয় খাবার দু'ভাগে ভাগ করে এক ভাগ সকাল ৬ টার আগে এবং আরেকবার সন্ধ্যা ৬ টার পরে প্রয়োগ করতে হয়। এক্ষেত্রে প্রত্যেকবার প্রয়োগের পূর্বে খাবারকে আবার দু'ভাগ করে অর্ধেক খাদ্যদানীতে এবং বাকী অর্ধেক পুকুরের কয়েকটি জায়গা পাটকাঠি দ্বারা চিহ্নিত করে সেখানে দিতে হবে। উল্লেখ্য যে চিংড়ির জন্য খাদ্য দেয়ার সময় পুকুরের তলদেশ থেকে এক ফুট ওপরে খাদ্যদানী স্থাপন করতে হবে।

খাদ্য প্রয়োগের সতর্কতা

- প্রতিদিন একই সময়ে একই জায়গায় খাদ্য প্রয়োগ করতে হবে;
- মাঝে মাঝে খাদ্য দানী উঠিয়ে খাবার গ্রহণের পরিমাণ যাচাইপূর্বক প্রয়োগ মাত্রা পূনরায় নির্ধারণ করতে হবে; এবং
- পানি অতিরিক্ত সবুজ হলে খাদ্য প্রয়োগ মাত্রা কমিয়ে দিতে হবে বা সাময়িকভাবে বন্ধ রাখতে হবে।

পানি ব্যবস্থাপনা:

পানি ব্যবস্থাপনা বলতে খামারের পানির ক্ষতিকর গুনাবলী সহনীয় মাত্রায় রাখা এবং পানি যেন চিংড়ির জন্য ক্ষতিকর না হয় এ জাতীয় ব্যবস্থাপনা বুঝায়।

পানির গুনাগুনের ওপর প্রভাব বিস্তারকারী কিছু ভৌত ও রাসায়নিক প্রভাবসমূহ : বাগদা চিংড়ি চাষ অংশ দ্রষ্টব্য;

আহরণ, আহরণোত্তর পরিচর্যা, গ্রেডিং, বাজারজাতকরণ এবং রেকর্ড সংরক্ষণ

লাভজনকভাবে মাছ ও চিংড়ি চাষের জন্য সঠিক সময় ও সঠিক পদ্ধতিতে আহরণ অপরিহার্য। পুকুর হতে দু'ভাবে মাছ আহরণ করা যায়। যেমন: ১. আংশিক আহরণ ২. সম্পূর্ণ আহরণ। প্রত্যেক পুকুরের একটি নিদির্ষ্ট ধারণক্ষমতা থাকে। পুকুরের ধারণক্ষমতা পূর্ণ হওয়ার আগেই যদি বড় মাছ ও চিংড়িগুলো ধরে ফেলা হয় তবে বাকিগুলো বড় হওয়ার সুযোগ পায় এবং এতে সার্বিক উৎপাদনও বেশী হয়। সেকারণে সুযোগ থাকলে মাছ ও চিংড়ির আংশিক আহরণই সবচেয়ে যুক্তিযুক্ত। এ ছাড়াও আংশিক আহরণে চুরি ও প্রাকৃতিক দূর্যোগের ঝুঁকি অনেক কমে যায় এবং সময় মত বিক্রি করে ভাল বাজার মূল্যও পাওয়া যায়। তবে আংশিক বা সম্পূর্ণ যে কোন পদ্ধতিতেই আহরণ করা হোক না কেন মাছ ও চিংড়ি আহরণের সাধারণ বিবেচ্য বিষয়গুলো হচ্ছে:

● মাছ ও চিংড়ির আকার এবং ওজন	● মাছ ও চিংড়ির মোট জীবভর	● ঋতু ভিত্তিক ঝুঁকি	● চুরি
● বাজার মূল্য	● ঝুঁকি	● পূন:মজুদের জন্য পোনার প্রাপ্যতা	

চিংড়ি আহরণের আগে চাষির প্রস্তুতি ও আহরণকালীন সাবধানতা

- উপযুক্ত পরিবহনযানসহ চিংড়ির ক্রেতা পূর্বেই নির্ধারিত রাখা;
- ধৃত চিংড়ি ভালভাবে ধোয়ার জন্য পরিষ্কার পানির সরবরাহ রাখা;
- অমাবস্যা বা পূর্ণিমার সময় এবং তারপর দু'দিন গলদা চিংড়ি না ধরা;
- ধরার সময় চিংড়ি যাতে আঘাতপ্রাপ্ত না হয় সে জন্য যথাসম্ভব সাবধানতা অবলম্বন করা;
- চিংড়ি ধরেই তা ছায়ায় রাখার জন্য খামারে উপযুক্ত ছাউনির ব্যবস্থা করা;
- মাটি, ঘাস, বাঁশের ঝুড়ি ও চাটাই, হোগলার পাটি, পাটের চট ইত্যাদির উপর চিংড়ি না রেখে মসৃণ পাকা প্লাষ্টিক সিটের উপর রাখা;
- বরফ পানিতে চিংড়ি রেখে ঠান্ডা করে ১ঃ১ অথবা ১ঃ২ আনুপাতিক হারে চিংড়ি ও স্বাস্থ্য সম্মত বরফ দিয়ে পরিবহন করতে হবে;
- চিংড়ি ধরার কমপক্ষে ২৪ ঘন্টা পূর্বে খাবার প্রয়োগ বন্ধ রাখতে হবে এবং ১ সপ্তাহ আগে থেকে সার প্রয়োগ বন্ধ রাখতে এবং
- এন্টিবায়োটিক প্রয়োগের অন্ততঃ ২১ দিন পর চিংড়ি বা মাছ আহরণ করতে হবে।

আহরণের সময়

ঠান্ডা এবং পরিষ্কার আবহাওয়ায় মাছ ও চিংড়ি ধরা উচিত। বিশেষ করে ভোর বেলা মাছ ও চিংড়ি ধরার উত্তম সময়। এ ছাড়াও স্থানীয় বাজারের সময়ও বিবেচনায় রাখতে হবে।

গলদা চিংড়ির গ্রেডিং

মাথা সহ		মাথা ছাড়া	
গ্রেড	প্রতি কেজিতে সংখ্যা	গ্রেড	প্রতি ৫০০ গ্রামে সংখ্যা
৫	৫ পর্যন্ত	৫	৫ পর্যন্ত
১০	৬ - ১০	৮	৬ - ৮
২০	১১ - ২০	১২	৯ - ১২
৩০	২১ - ৩০	২০	১৩ - ২০
৫০	৩১ - ৫০	৩০	২১ -৩০

মাছ ও গলদা চিংড়ির বাজারজাতকরণ

মাছ ও চিংড়ি বাজারজাতকরণের প্রধান বিবেচ্য বিষয় হলো উৎপাদিত/আহরণকৃত মাছ ও চিংড়ির গুণগতমান অক্ষুন্ন রাখা। এ লক্ষ্যে যা যা করণীয় অর্থাৎ আহরণের সময় কাল থেকে শুরু করে বরফ দেয়া, স্বাস্থ্যকর পাত্রে সংরক্ষণ ও পরিবহণ ইত্যাদি বিষয়ে নজর রাখা জরুরী। বিশেষতঃ চিংড়ি বাজারজাতকরণের বিষয়টি অতীব গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে। চিংড়ি কোন ফড়িয়ার নিকট বিক্রি করা যাবে না। লাইসেন্স প্রাপ্ত ডিপো, আড়ত বা ফ্যাক্টরীতে বিক্রি করতে হবে।

চিংড়ি বাজারজাতকরণ পদ্ধতি

আকার ও গুণগতমান অনুযায়ী বাছাইকৃত চিংড়ি বাজারজাতকরণের জন্য সুবিধাজনক পরিবহন পাত্রে বরফ ও চিংড়ি স্তরে স্তরে সাজাতে হবে। আহরণ ও বাজারজাতকরণের মধ্যবর্তী সময়ে চিংড়িকে ছায়াযুক্ত স্থানে রাখার ব্যবস্থা করা উচিত। পরিবহন বাক্সে বা পাত্রের তলায় এক স্তর বরফ দিয়ে তার উপর এক স্তর চিংড়ি সাজাতে হবে। এভাবে পর্যায়ক্রমে বরফ ও চিংড়ি সাজানোর পরে সবার উপরে পুরু করে এক স্তর বরফ দিয়ে প্যাকিং করতে হবে। এভাবে চিংড়ি সাজানোর সময় খেয়াল রাখা উচিৎ যেন পাত্রে ২ ফুট এর বেশি উচ্চতায় চিংড়ি সাজানা না হয়। কারণ এতে উপরের চিংড়ি ও বরফের চাপে নিচের চিংড়ির দৈহিক বা আকৃতিগত ক্ষতির আশংকা থাকে।

আহরণের পর চিংড়ি টাট্কা রাখার জন্য করণীয় কাজ

- ধরার পর চিংড়ি রোদে না রেখে অবশ্যই ঘরের মধ্যে বা কোন চালের নীচে ছায়াযুক্ত ঠান্ডা জায়গায় রাখা;
- পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত মসৃণ পাকা জায়গা অথবা প্লণ্ঢাস্টিক সিটের উপর রাখা;
- পরিষ্কার ও শীতল পানিতে চিংড়ি ভালভাবে ধুয়ে শীতল করা;
- পরিষ্কার চিংড়ি বরফ/ঠান্ডা পানির ট্যাংকে সর্বোচ্চ ১ মিনিট ডুবিয়ে রাখা, যাতে করে চিংড়ির শরীরের সব জায়গা বরফের মত ঠান্ডা হয়ে যায়।

চিংড়ি পরিবহনকালীন বিবেচ্য বিষয়

- বরফের পানিতে ঠান্ডা করা আস্ত চিংড়ি কুচি বরফের মধ্যে প্লণ্ঢাস্টিকের বাক্সে তাপ নিরোধক ট্রাক বা ভ্যানে পরিবহন করা;
- দিনের বেলায় সূর্যের আলো ও তাপের মধ্যে খোলা নৌকা, ভ্যানগাড়ী, রিকশা বা সাইকেলে চিংড়ি পরিবহন না করা;
- সব সময় চিংড়ির বাক্স ছায়াযুক্ত ঠান্ডা জায়গায় রাখা;
- পরিবহনে কত সময় লাগবে তা বিবেচনা করে বরফ ও চিংড়ির অনুপাত নির্ধারণ করা। সাধারণতঃ চিংড়ি ও বরফের অনুপাত ১:১ হয়। দিনের তাপমাত্রাও এ ক্ষেত্রে একটি বিবেচ্য বিষয়;
- পরিবহনের সময় চিংড়িতে যেন তাপ না লাগে সে ব্যাপারে সতর্ক থাকা;
- প্যাকিং সামগ্রী হিসেবে ফুড গ্রেডেড প্লণ্ঢাষ্টিকের বাস্কেট ব্যবহার করতে হবে;
- ধরার পর যথাসম্ভব অল্প সময়ের মধ্যে চিংড়ি কারখানায় পৌঁছানো; এবং
- পরিবহনের পর পরিবহন যান ও বাক্স উপযুক্ত সাবান, ডিটারজেন্ট ও জীবাণুনাশক ঔষধ দিয়ে ভাল ভাবে ধুয়ে শুকিয়ে ফেলা।

পূন: মজুদ

বেশী উৎপাদন পেতে হলে পুকুরের চিংড়ি চাষ ব্যবস্থাপনা চক্র সারা বছর ধরে চালু রাখতে হবে। উৎপাদন চক্র চালু রাখার জন্যে যখনই চিংড়ি আহরণ করা হবে তখন যদি মৌসুম থাকে তবে ১০-১৫% অতিরিক্ত জুভেনাইল মজুদ করা যেতে পারে।

রেকর্ড সংরক্ষণ

প্রত্যেক চাষির একটি করে রেকর্ড বই থাকা একান্তই দরকার। এই রেকর্ড বইয়ে চাষির নাম, ঠিকানা, পুকুরের অবস্থা, আয়তন ও বৈশিষ্ট, চুন, সার, শত্রু প্রাণী বিনষ্টকারী বিষ প্রয়োগের মাত্রা, মজুতকৃত পোনার সংখ্যা, আকার, মজুদের তারিখ, চাষকালীন সার ও খাদ্য প্রয়োগের তারিখ ও মাত্রা, ক্রয়মূল্য ও চিংড়ি ও মাছের শারিরীক বৃদ্ধির হার, আহরণ, বিক্রয়মূল্য ইত্যাদি তথ্য নিয়মিত লিপিবদ্ধ করতে হবে। এসব তথ্য মৎস্য সম্প্রসারণকারীকে দেখালে তিনি আগামী মৌসুমে কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করলে চিংড়ির উৎপাদন, গুণগতমান এবং লাভের পরিমাণ আরও বাড়ানো যায় সে বিষয়ে পরামর্শ দিতে পারবেন। এসব তথ্য লিপিবদ্ধ করে না রাখলে কারো পক্ষেই চিংড়ি চাষিকে ভাল উপদেশ দেওয়া সম্ভব নয়।

গলদা চিংড়ি চাষের আয়-ব্যয়ের হিসাব

১.০০ একর পুকুরে গলদা চিংড়ি একক চাষে আয়-ব্যয়ের হিসাব:

ক্রমিক নং	ব্যয়ের খাত ও কাজের বিবরণ	ব্যয়ের টাকা
১.	পুকুর সংস্কার (পাড় মেরামত, তলার কাঁদা উত্তোলন)	১৫০০০.০০

২.	আগাছা, রাক্ষুসে ও অবাঞ্চিত মাছ অপসারণ	৫০০০.০০
৩.	পুকুর প্রস্তুতকালীন ও পরবর্তী সময়ে ২০০ কেজি চুন ক্রয়	২৫০০.০০
৪.	পুকুর প্রস্তুতকালীন ও পরবর্তী সময়ে ইউরিয়া ১৩০ কেজি	১৫৬০.০০
৫.	পুকুর প্রস্তুতকালীন ও পরবর্তী সময়ে টিএসপি ৭০ কেজি	২০০০.০০
৬.	জুভেনাইল ক্রয় ১০০০০টি	১০০০০০.০০
৭.	সিলভারকার্প ও কাতলা মাছের পোনা (১০-১৫ সে.মি) ক্রয় ৩০০টি	১৫০০.০০
৮.	বিভিন্ন প্রকারের মোট ৩০০০ কেজি সম্পূরক খাদ্য ক্রয় বাবদ	১৫০০০০.০০
৯.	মাছ ধরা ও বাজারজাতকরণ	৩০০০০.০০
১০.	পুকুর বেষ্টনী নির্মাণের জন্য নেট ক্রয় বাবদ	১০০০০.০০
১১.	বিবিধ	১০০০০.০০
	সর্বমোট	**৩,২৭,৫৬০.০০**

আয়ের হিসাবঃ

ক্রমিক নং	আয়ের খাত ও বিবরণ	আয়ের পরিমাণ (টাকা)
১.	মাছ উৎপাদন-৩০০.০০ কেজি	৫৪,০০০.০০
২.	গলদা চিংড়ি উৎপাদন ৬৫০ কেজি	৩,৯০,০০০.০০
	সর্বমোট	**৪,৪৪,০০০.০০**

মোট আয়: ৪,৪৪,০০০.০০ ৳

মোট ব্যয় : ৩,২৭,৫৬০.০০ ৳

নীট লাভ : ১,১৬,৪৪০.০০ ৳

বাগদা চিংড়ি চাষ

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে চিংড়ি সম্পদের ভূমিকা

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে চিংড়ি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বর্ধিত জনগোষ্ঠীর প্রাণীজ আমিষের চাহিদা পূরণ, উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর বিপুল কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে চিংড়ি সম্পদের ভূমিকা আজ সর্বজনবিদিত এবং স্বীকৃত। আমাদের দেশে আশির দশকে ক্ষুদ্র পরিসরে চিংড়ি চাষ শুরু হয়ে বিগত তিন দশকে বাংলাদেশে চিংড়ি চাষ এলাকা ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত হলেও বাগদা চিংড়ির গড় উৎপাদন ২০০-২৫০ কেজি/ হেক্টর/বছর, যা বিশ্বের অন্যান্য চিংড়ি উৎপাদনকারী দেশের তুলনায় খুবই কম। বাংলাদেশের বাগদা চাষ এখনও সনাতন পদ্ধতিতে রয়ে গেছে। বর্তমান চাহিদার আলোকে চাষ ব্যবস্থাপনার ধরন ও কৌশল পরিবর্তন করতে হবে। জলবায়ুর পরিবর্তন, বাগদা চাষের উপকরণের মূল্য বৃদ্ধি, জনসংখ্যার বৃদ্ধিজনিত চাপ ইত্যাদি কারণে হেক্টর প্রতি উৎপাদন বৃদ্ধি করা ব্যতিত অন্য কোন বিকল্প নেই। চাষ পদ্ধতির উন্নয়ন ব্যতিত বাগদা খাতে কাংখিত উৎপাদন সম্ভব নয়।

পরিচিতি:

বাগদা চিংড়ি একটি অমেরুদন্ডী, জোড়া পা ও খোলস বিশিষ্ট জলজ প্রাণী। বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে চিংড়ি মাছ নয় তবে সাধারণের কাছে তা মাছ হিসেবেই সুপরিচিত। সামুদ্রিক চিংড়ির মধ্যে বাগদা চিংড়ি সবচেয়ে বড় এবং বাণিজ্যিক গুরুত্ব সম্পন্ন। বাগদা চিংড়ি ৫-২৫ পিপিটি লবণাক্ত পানিতে বড় হয় এবং উপযুক্ত পরিবেশে ৩-৪ মাসে ৩০-৪০ গ্রাম ওজনের হয়। স্ত্রী বাগদা পুরুষ বাগদা থেকে তুলনামূলকভাবে আকারে বড় হয় এবং বেশী দিন বেঁচে থাকে।

চিত্র: *Penaeus monodon*

খাদ্য ও খাদ্যাভ্যাস

বাগদা চিংড়ি মূলতঃ নিশাচর প্রাণী এবং অন্ধকার পছন্দ করে। এরা মাংসাশী এবং প্রাকৃতিক পরিবেশে ছোট চিংড়ি, ক্ষুদ্র প্রাণী এবং শ্যাওলা খেয়ে থাকে। চিংড়ি পানির তলায় বিচরণশীল মন্থর গতিসম্পন্ন প্রাণী শিকার করে। এরা খুব ধীরে ধীরে খাদ্য গ্রহণ করে এবং খাদ্য হজম হতে ৪-৫ ঘন্টা সময় লাগে। বয়স, ঋতু এবং স্থান পরিবর্তনের সাথে সাথে খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তিত হয়।

বাগদা চিংড়ি চাষের উপযোগী পরিবেশ ও স্থান এবং মাটি ও পানির গুণাগুন

চিংড়ি চাষের জন্য স্থান নির্বাচন:

বাগদা চিংড়ি খামারের জন্য উপযুক্ত স্থান নির্বাচনে নিম্নলিখিত বিষয় সমূহ বিবেচনা করা অত্যন্ত জরুরী:

১) **দূষণমুক্ত এলাকা:** শহর বা শিল্প এলাকা, যেখানকার বর্জ্য পদার্থ পার্শ্ববর্তী নদী/খালে পড়ে সেসব এলাকায় চিংড়ি খামার স্থাপন করা ঝুঁকিপূর্ণ। এছাড়া কৃষিকাজে ব্যবহৃত কীটনাশক, সার ইত্যাদি এলাকায় চিংড়ি খামার স্থাপন ঝুঁকিপূর্ণ। অতএব এসব এলাকায় চিংড়ি খামার স্থাপন না করাই উত্তম।

২) **পানির উৎস:** বাগদা চিংড়ি চাষের জন্য লবন পানির প্রয়োজন। চিংড়ি খামার এমন স্থানে স্থাপন করতে হবে যেখানে নদী/খাল থেকে সহজেই পানি খামারে ঢুকানো ও বের করা যায় এবং পানি দূষণমুক্ত হয়।

৩) **মাটির গুণাগুণ:** মাটির গুণাগুণ চিংড়ি চাষের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপর্ণ যা সহজেই খামারের পানিকে প্রভাবিত করে। খামার স্থাপনের জন্য মাটিতে:

- কাদার পরিমান বেশী থাকতে হবে এবং পিএইচ ৫ এর উপরে থাকতে হবে।
- জৈব পদার্থের পরিমান কমপক্ষে ১০% থাকতে হবে।
- এসিড সালফেট ও আয়রনের মাত্রা যথাক্রমে ০.০৩ পিপিএম এবং ০.০১ পিপিএম এর কম থাকতে হবে।

চিংড়ি চাষের জন্য পানির নিম্নবর্ণিত বৈশিষ্ট্য থাকা প্রয়োজন:

ক) লবনাক্ততা - ১০ থেকে ২৫ পিপিটি

খ) তাপমাত্রা	-	২৫^{০}-৩০^{০} সেঃ
গ) পিএইচ	-	৭.৫- ৮.৫
ঘ) এ্যালকালিনিটি	-	৮০ পিপিএম এর বেশী।
ঙ) দ্রবীভূত অক্সিজেন	-	৪-৮ পিপিএম (মি.গ্রা./লিটার)।
চ) হাইড্রোজেন সালফাইড	-	০.০৩ পিপিএম (মি.গ্রা./লিটার) এর কম।
ছ) আনআয়োনোইজড অ্যামোনিয়া	-	০.১ পিপিএম (মি.গ্রা./লিটার)এর কম।
জ) কীটনাশক দ্রব্যের উপস্থিতি	-	থাকা উচিৎ নয়।

৬) **ভূ-প্রকৃতি:** খামারের ভূ-প্রকৃতি অর্থাৎ ভূ-পৃষ্ঠের উপরিতল সম্পর্কে ধারনা থাকতে হবে যেন খামারে পানি ওঠানো-নামানোসহ অন্যান্য অবকাঠামো স্থাপনের হিসাব সহজে করা যায়।

৭) **অবকাঠামোগত সুবিধা:** চিংড়ি খামার স্থাপনের জন্য এমন জায়গা নির্বাচন করতে হবে যেখানে বন্যা-নিয়ন্ত্রণ বাঁধ, সড়ক যোগাযোগ, পানি নিয়ন্ত্রণের সুইসগেট ও বাজারজাতকরণের সুবিধা আছে।

৮) **বিদ্যুৎ সরবরাহ:** উন্নত পদ্ধতিতে চিংড়ি চাষের ক্ষেত্রে খামার এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ থাকা অত্যন্ত জরুরী তা না হলে আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার অনিশ্চিত হয়ে পড়বে। নিরাপত্তা এবং বসবাসের জন্যও বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রয়োজন।

৯) **দক্ষ জনশক্তি:** চিংড়ি খামার লাভজনক করতে হলে দক্ষ জনশক্তি আবশ্যক। সুষ্ঠু খামার পরিচালনার জন্য যেসব এলাকায় দক্ষ জনশক্তি পাওয়া যায় সেখানে খামার স্থাপন করা উচিত।

১০) **উৎপাদন সামগ্রীর সহজলভ্যতা:** যেসব এলাকায় উৎপাদন সামগ্রী যেমন- পোনা, চুন, সার, যন্ত্রপাতি, জ্বালানী ইত্যাদি সহজে পাওয়া যায় সেখানে চিংড়ি খামার স্থাপন করা উচিত।

উপরে উল্লেখিত বিষয়গুলি বিবেচনায় রেখে চিংড়ির খামার স্থাপন করা উচিত। এছাড়া নিরাপত্তা এবং সামাজিক পরিবেশও বিবেচনায় আনতে হবে। শুধুমাত্র মাটি ও পানির গুণাগুণ দেখে এবং অন্যান্য বিষয় সমূহ বিবেচনা না করে চিংড়ি খামার স্থাপনের ফলে অনেকে আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে এবং রোগ ও মড়কসহ নানাবিধ সমস্যায় পতিত হয়েছে। আদর্শ পুকুরের বৈশিষ্ট্য অনুসরণ করে জলাশয় নির্বাচন করা উচিত (মাছচাষের সাধারণ আলোচনা অংশ দ্রষ্টব্য)

ঘের/খামার প্রস্তুতি

ঘের/খামার নির্মাণের পর চিংড়ি চাষের জন্য উপযুক্তকরণ অর্থাৎ পানির উর্বরতা সংরক্ষণের জন্য করণীয় বিষয়সমূহ খামার প্রস্তুতির অন্তর্ভূক্ত। চিংড়ি চাষের প্রথম পর্যায় খামার প্রস্তুতি, তাই ঘের/খামার প্রস্তুতি পদ্ধতিগতভাবে করা গেলে চিংড়ি উৎপাদন নিশ্চিত করা যায়। খামার প্রস্তুতির ধাপসমূহ নীচে আলোচনা করা হলো।

(ক) চাষ এলাকার তলদেশ শুকানো:

নতুন চাষ শুরু করার আগে এবং প্রতি ফসল আহরণের পর চাষক্ষেত্র ভালভাবে শুকিয়ে নিতে হয়। শুকানোর উপকারিতা:

- বর্জ্য অপসারণ করা যায় এবং জৈব বর্জ্য খনিজায়নে (অক্সিডেশন) সহায়তা করে;
- হাইড্রোজেন সালফাইড উৎপাদন হ্রাস করে ও রাক্ষুসে ও প্রতিযোগী প্রাণীর উপদ্রব থেকে রক্ষা পাওয়া যায়;
- জীবাণু হ্রাস করে রোগের সম্ভাবনা কমিয়ে দেয় ও মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি করে এবং প্রয়োজনীয় মেরামত করা যায়।

বেশী শুকালে মাটির নিচের ক্ষতিকর রাসায়নিক দ্রব্যাদি মাটির উপরের স্তরে উঠে আসে। এমনভাবে শুকাতে হবে যেন মাটির উপর দাঁড়ালে ২-৩ সে: মি: মাটিতে পা বসে যায় এবং মাটি হাত দিয়ে তুলে দলা পাকানো যায়।

(খ) পাড় মেরামত ও কালো কাদা অপসারণ:

চিংড়ি চাষের জন্য ঘের/ খামার প্রস্তুতিকালে কখনও কখনও পাড় মেরামত ও তলার কালো কাদা অপসারণের প্রয়োজন দেখা দেয়। কারণ ঘের/খামারের ভাঙ্গা পাড় মেরামত ও কালো কাদা অপসারণ করা না হলে চাষকালীন সময়ে নানা ধরণের সমস্যা দেখা দিতে পারে। যেমন-

পাড় মেরামত করা না হলে-

- বাহির থেকে রাক্ষুসে প্রাণী ও অবাঞ্চিত মাছ প্রবেশ করতে পারে।

- বর্ষা বা অতিরিক্ত বৃষ্টির সময় চিংড়ি ও মাছ ভেসে যেতে পারে।
- বাইরের দূষিত পানি খামারে প্রবেশ করতে পারে।

কালো কাদা অপসারণ না করলে-

- ঘের/খামারের পানি দূষিত করে ফেলে;
- চিংড়ির জন্য অক্সিজেনের স্বল্পতা দেখা দেয়;
- তলায় বিষাক্ত গ্যাস জমা হয়;
- চিংড়ির রং কালো হয়ে যায়, ফলে বাজার মূল্য কম হয়;
- সহজেই নানা ধরনের রোগে আক্রান্ত হয়ে মড়ক দেখা দেয়।

(গ) অবাঞ্চিত ও জলজ প্রাণী নিয়ন্ত্রণ:

অনেক সময় দেখা যায় খামার শুকানোর পরও চাষ এলাকার নীচু জায়গায় বা খালে জমে থাকা পানিতে অবাঞ্চিত জলজ প্রাণী বা এদের পোনা থেকে যায় যা পরবর্তীতে মজুদকৃত পোনা খেয়ে ফেলে বা খাদ্য ও বাসস্থানে ভাগ বসায়। পানি জমে থাকা এলাকায় **রোটেনন ৬০ গ্রাম/শতাংশ/ফুট** পানির জন্য বা চা-বীজের খৈল ১৮০-২৪০ গ্রাম/শতাংশ/ফুট পানির জন্য ব্যবহার করে অনাহুত প্রাণী নিয়ন্ত্রণ করা যায়। অনেক সময় খামারের কোন কোন এলাকা শুকানো সম্ভব হয় না এবং ঐ এলাকা থেকে পঁচন বা রোগ সংক্রমণের সম্ভাবনা থাকে। এ সকল এলাকায় ৬০০ **গ্রাম/শতাংশ/ফুট পানির জন্য ব্লিচিং পাউডার বা ক্লোরিন ব্যবহার করা যায়**। একর প্রতি ১০০ কেজি কলি চুন ও ২০ কেজি অ্যামোনিয়াম সালফেট একত্রে ব্যবহার করে শামুক, ঝিনুক, কাঁকড়া ইত্যাদি দমন করা যায়। এ ক্ষেত্রে মরা শামুক, ঝিনুক তুলে ফেলতে হবে এবং বেশী পরিমান পানি উঠিয়ে আবার নিষ্কাশন করে ঘের/খামার ধৌত করতে হবে। অবাঞ্চিত প্রাণী রোধে কোন প্রকার বিষ বা কীটনাশক ব্যবহার করা উচিত নয়।

(ঘ) চাষ দেয়া:

তলদেশে হাল্কা চাষ দিয়ে জৈব পদার্থ খনিজায়নে সহায়তা করা যায় এবং মাটির বিষাক্ত গ্যাস অপসারণ করা যায়। অনেক সময় কস যুক্ত মাটিতে চাষ দিলে মাটির কস উপরে উঠে মাটির উর্বরতা কমিয়ে দেয়। যে সকল জমিতে উপরের স্তরে বালু বা পলি জমা হয় সেক্ষেত্রে হাল্কা চাষ উপকারী। প্রয়োজন না হলে এবং কষযুক্ত মাটি হলে চাষ পরিহার করাই ভাল।

(ঙ) তলদেশ ধৌতকরা:

শুকানো ও চাষের ফলে মাটির কস, রাসায়নিক পদার্থ, ক্ষতিকর লবণ ইত্যাদি মাটির উপরে জমা হয় যা ক্ষতিকর। চাষ ক্ষেত্রে পানি উঠিয়ে দুই এক দিন রেখে তা পুনরায় বের করে এর ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। ক্ষতিকর কস, লবণ ও রাসায়নিক দ্রব্যাদি প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদনে বাঁধা দেয় এবং চিংড়ির দেহের জন্যও ক্ষতিকর। ধান চাষের পর পানি উঠিয়ে রেখে তা বের করে দিলে ধানের শিকড় ও গোড়া থেকে নিঃসৃত পদার্থ অপসারণ করা যায়।

(চ) চুন প্রয়োগ: চাষ ক্ষেত্রে চুন প্রয়োগ অত্যন্ত জরুরী একটি কাজ। চুনের প্রধান উপকারীতা নিম্নরূপ:

- পিএইচ বৃদ্ধি করে (ক্ষারত্ব বাড়ায়) ও উর্বরতা বৃদ্ধি করে;
- ক্যালসিয়াম যোগায় যা চিংড়ির খোলস শক্ত করতে ও বাফার অবস্থা বজায় রাখতে সহায়তা করে;
- রোগের প্রাদুর্ভাব কমায় ও প্রয়োজনীয় পুষ্টি পদার্থের যোগান বাড়ায়;
- নাইট্রোজেন ফিক্সিং ব্যাকটেরিয়া ও মাটিতে বসবাসকারী প্রাণীর বৃদ্ধিতে সহায়ক; এবং
- অক্সিজেন বৃদ্ধিতে সহায়তা করে এবং পরিবেশ ভাল রাখে।

মাটিতে পিএইচ ভিত্তিক চুন প্রয়োগ এর পরিমাণ:

মাটির পিএইচ	চুন প্রয়োগের পরিমাণ (কেজি/একর) খাদ্য	
	কৃষি চুন বা ডলোমাইট	কলি চুন
৬.০ এর উপরে	৪০০-৮০০	২০০-৪০০
৫.০-৬.০	৮০০-১২০০	৪০০-৬০০
৫.০ এর নীচে	১২০০-২৪০০	৬০০-১০০০

চুন প্রয়োগ পদ্ধতি:

মাটির পিএইচ ৭.০ এর নীচে থাকলেই খামারে চুন প্রয়োগ করতে হবে। মাটিতে কলি চুন ব্যবহার করাই উত্তম। চাষক্ষেত্র শুকানোর পর সম্পূর্ণ তলদেশে এবং বাঁধের উপরে ও ঢালে চূর্ণকৃত চুন ছিটিয়ে দিতে হয়। পুকুরের যে অংশে চিংড়ি খাদ্য গ্রহণ করে এবং শুকানোর পরেও যে সকল স্থান আর্দ্র থেকে যায় সে সকল স্থানে বেশী পরিমাণে চুন প্রয়োগ করতে হয়। মাটিতে চুন গুড়া/চূর্ণ অবস্থায় দিতে হয়, চাষকালীন সময় চুন পানিতে গুলে সমগ্র পানি এলাকায় প্রয়োগ করতে হয়।

(ছ) চাষক্ষেত্রে ধাপে ধাপে পানি উত্তোলন:

পুকুরে যখনই পানি ওঠানো হোক না কেন অবশ্যই ছেকে তুলতে হবে। প্রথমবারে ২০ সে:মি: পানি ছেকে তুলতে হবে এবং পরবর্তী প্রতিবারে ১০ সে:মি: করে পানি তুলে পানিতে প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদন নিশ্চিত করা যায়। কমপক্ষে ৬০ সে:মি: পানি উত্তোলনের পর প্রাকৃতিক খাদ্যের উৎপাদন নিশ্চিত হয়ে পোনা মজুদ করতে হবে।

(জ) সার প্রয়োগ:

প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদনের জন্য খামারে নিয়মিত ও পরিমিত সার প্রয়োগ করতে হয়।

চাউলের কুড়া, চিটাগুড় ও ইষ্ট পাউডার ব্যবহার ও প্রয়োগ পদ্ধতি:

প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদনের জন্য পুকুর প্রস্তুতিতে একর প্রতি অটো পালিশ ৪ কেজি, চিটাগুড় ৪ কেজি ও ইস্ট ৪০ গ্রাম একটি পাত্রে নিয়ে দ্বিগুন পরিমাণ পানিতে ২৪ ঘন্টা ভিজিয়ে রাখতে হবে। পরে উক্ত মিশ্রন একটি পরিষ্কার কাপড় দিয়ে ছেকে শুধুমাত্র পানিটুকু পুকুরের সমস্ত জায়গায় ছিটিয়ে দিতে হবে এবং কাপড়ে রক্ষিত মিশ্রনটুকু পূর্বের ন্যায় পানিতে আবার ২৪ ঘন্টা ভিজিয়ে রেখে ছেকে পানিটুকু ঘেরে ছিটিয়ে দিতে হবে। এছাড়া পানিতে প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদন নিশ্চিত করার জন্য রাসায়নিক সার হিসেবে ইউরিয়া ও টিএসপি ব্যবহার করা যেতে পারে।

- একর প্রতি ১ কেজি ইউরিয়া ও ১ কেজি টিএসপি পানিতে ছিটিয়ে দিতে হবে। টিএসপি এক রাত ভিজিয়ে রাখতে হবে। পরের দিন প্রয়োগের আগে ইউরিয়া মিশিয়ে পাতলা করে গুলে নিতে হবে;
- ৭ - ১০ দিন প্রতিদিন পানিতে প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদন হবার আগ পর্যন্ত একইভাবে সার দিতে হবে;
- সার রৌদ্রকরোজ্জ্বল দিনে প্রয়োগ করতে হয় এবং সার প্রয়োগের পর পানি পরিবর্তন করা যাবে না;
- সার প্রয়োগের সাথে সাথে পানির গভীরতা ৬০ সেঃ মিঃ থেকে ক্রমান্বয়ে গড়ে ১.৫০-২.০০ মিটার করতে হবে;
- যদি পানির রং সবুজ/বাদামী হয় তবে ধরে নেয়া যায় পানিতে প্লাংকটন উৎপন্ন হয়েছে এবং পোনা ছাড়ার জন্য উপযুক্ত;
- সার প্রয়োগে পানির রং সবুজাভ না হলে অন্য জলাশয় থেকে উদ্ভিদকণা (ফাইটোপ্লাংকটন) এনে চাষ ক্ষেত্রে দিতে হবে।

মজুদ ব্যবস্থাপনা

ঘের/খামারে পোনা মজুদের সময় মজুদ পোনার পরিমান/মজুদ ঘনত্ব, প্রজাতি নির্বাচন, পোনার মান, মজুদকালীন যত্ন (শোধন ও খাপ খাওয়ানো) ইত্যাদি বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হয়। এতে খামার ব্যবস্থাপনায় যেমনি সুবিধা হয় তেমনি চিংড়ির উৎপাদনও বৃদ্ধি করা সম্ভব।

(ক) মজুদ পোনার পরিমান/মজুদ ঘনত:

খামার বা চাষক্ষেত্রের আয়তন, পানির গভীরতা ও চাষ পদ্ধতির উপর পোনা মজুদের পরিমান নির্ভর করে।

চাষ পদ্ধতি	মজুদ ঘনত্ব (প্রতি একরে)	খাদ্য প্রয়োগ	সার প্রয়োগ	বায়ু সঞ্চালন	পানির গুণাগুণ নিয়ন্ত্রন
সম্প্রসারিত/ প্রচলিত চাষ পদ্ধতি	৪,০০০-৬,০০০টি (১.০-১.৫টি/বঃ মিঃ)	করা হয় না	সাধারণতঃ করা হয় না	করা হয় না	অনিয়ন্ত্রিত
উন্নত সম্প্রসারিত/ প্রচলিত চাষ পদ্ধতি	৮,০০০-১২,০০০টি (২-৩টি/বঃ মিঃ)	অপরিমিত খাদ্য প্রয়োগ	পরিমিত সার প্রয়োগ	করা হয় না	পাম্পের সাহায্যে আধা-নিয়ন্ত্রিত

আধানিবিড় চাষ পদ্ধতি	৩০,০০০-৫০,০০০টি (৭.৫-১২.৫টি/বঃ মিঃ)	করা হয়	পরিমিত সার প্রয়োগ	এ্যারেটর দিয়ে বায়ু সঞ্চালন	পাম্পের সাহায্যে পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত

সম্প্রসারিত/প্রচলিত চাষ পদ্ধতিতে পোনা সাধারণতঃ কয়েকবারে মজুদ করা হয়ে থাকে। তবে উন্নত সনাতন ও আধানিবিড় পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট পরিমানের পোনা একত্রে মজুদ করতে হবে যাতে খাদ্য ও অন্যান্য ব্যবস্থাপনায় সুবিধা হয় এবং অধিক উৎপাদন পাওয়া যায়।

(খ) বাগদার সাথে প্রজাতি নির্বাচন:

প্রজাতি নির্বাচনের উপর চাষের সফলতা অনেকাংশে নির্ভর করে। খাদ্য প্রয়োগের মাধ্যমে চাষ ব্যবস্থাপনায় অন্য প্রজাতির মাছ/চিংড়ি থাকলে চিংড়ির খাদ্য খেয়ে উৎপাদনে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। এ সমস্ত ক্ষেত্রে চাষ এলাকায় অন্য প্রজাতির মাছ মজুদ করা যায় না, উপরন্তু অন্য অনাহুত বা রাক্ষুসে জাতীয় মাছ/চিংড়ি থাকলে তা সরিয়ে নিতে হয়।

সম্প্রসারিত/প্রচলিত চাষ পদ্ধতিতে যেহেতু খামারে খাদ্য প্রয়োগ করা হয় না তাই খামারের প্রাকৃতিক খাদ্যের সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহারের লক্ষ্যে চিংড়ির জন্য ক্ষতিকর প্রজাতির মাছ মজুদ করা যাবে না। বর্তমানে মুলেট (পার্শে/ভাঙ্গন), তেলাপিয়া ইত্যাদি মাছ মজুদ করা হয়ে থাকে। এসব মাছ মাটির আবর্জনা পরিস্কার রাখাসহ পানিতে অতিরিক্ত ফাইটোপ্লাংকটন নিয়ন্ত্রণ করে। তবে এ সমস্ত মাছ হেক্টর প্রতি ৩-৪ হাজারের বেশী মজুদ করা ঠিক নয়। তেলাপিয়া জাতীয় মাছ মাঝে মাঝে আহরন করে বংশ বিস্তার রোধ বা নিয়ন্ত্রিত পর্যায়ে রাখতে হবে। সম্প্রসারিত/প্রচলিত পদ্ধতিতে আংশিক মজুদ/আংশিক আহরণ করা হয়। উন্নত সম্প্রসারিত/প্রচলিত পদ্ধতিতে এককালীন পোনা মজুদ এবং এককালীন আহরণ করা হয়।

চিংড়ির ফসল তুলে নেবার পর এবং পানি যখন বাগদা চাষের উপযুক্ত থাকে না তখন অন্য মিঠাপানির মাছ চাষ করা যায়। এ ক্ষত্রে চাষ পদ্ধতি ও মজুদ ঘনত্ব অনুযায়ী উৎপাদন পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। তবে এ জাতীয় মাছ ৫-৬ মাস মেয়াদে চাষের সুযোগ থাকে।

(গ) পোনার গুণগতমান:

বাগদা চিংড়ি চাষে পোনার গুণগতমান একটি গুরুত্বপূর্ন বিষয়। রোগাক্রান্ত বা দূর্বল পোনা যেমনি উৎপাদন সহায়ক নয় তেমনি রোগ সংক্রমন ও পরিবেশগত সমস্যার সৃষ্টি করে থাকে। প্রাকৃতিক উৎস ও হ্যাচারিতে উৎপাদিত উভয় পোনাই খামারে মজুদ করা হয়ে থাকে। প্রাকৃতিক উৎস হতে পোনা আহরণ সম্পূর্ন বেআইনি এবং অধুনা হ্যাচারিতে উৎপাদিত পোনার প্রতি চাষিদের আগ্রহ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। যে উৎস থেকেই পোনা নেয়া হোক না কেন ঐ ব্যাচের পোনার স্বাস্থ্য যথাযথ ভাবে পরীক্ষা করতে হবে, এজন্য ম্যাগনিফাইং গ্লাসের সাহায্য পোনার বাহ্যিক লক্ষণ দেখে ভাল পোনা সনাক্ত করা যায়। তবে পিসিআর পরিক্ষীত ভাইরাসমুক্ত পোনা মজুদ বাগদা চাষের সফলতার পূর্বশর্ত হিসাবে ধরা হয়।

বাহ্যিক লক্ষণসমূহ

- খোলসের স্বাভাবিক উজ্জল রং সুস্থ ও ভালো পরিবেশে লালিত পোনার লক্ষণ;
- উপাঙ্গসমূহের দৃঢ়তা ও স্বভাবিকতা রোগমুক্ত এবং চোখের দৃঢ়তা ও উজ্জলতা ভালো পোনার পরিচায়ক;
- খোলসের ওপর পরজীবীর (ফাংগাস/ছত্রাক ইত্যাদি) উপস্থিতি অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে লালিত অসুস্থ পোনার লক্ষণ;
- খাদ্যনালীর পূর্ণতা কম থাকলে পোনা অপুষ্টি ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে পালিত বুঝা যায়;
- সুস্থ ও সবল পোনা সাঁতার কাটার সময় লম্বভাবে সাতার কাটে ও পুচ্ছ পাখনা ছড়ানো থাকে;
- পোনাকে বিরক্ত করলে লাফ দেয় বা পাত্রের গায়ের কাছ থেকে আচমকা সরে যায়।

এ সমস্ত বিষয়ে পর্যবেক্ষণ ছাড়াও:

- পোনার সুস্থতা ও দৃঢ়তা পর্যবেক্ষণের জন্য একটি পাত্রে কিছু পোনা নিয়ে পাত্রে হঠাৎ মিষ্টি পানি দিয়ে দেখতে হবে পোনা কেমন টেকসই হয়। মিষ্টি পানিতে পোনা এক সাথে জড়ো হলে বা মারা গেলে বুঝতে হবে পোনা বেশ দূর্বল।
- পোনা মজুদের পূর্বে একটি হাপায় পুকুরের পানিতে কিছু পোনা ২৪ ঘন্টা রেখে দেখতে হবে পোনা কেমন টেকসই ও পুকুরের পানি পোনার জন্য উপযুক্ত অবস্থায় আছে কিনা।
- একটি পাত্রে কিছু পোনা নিয়ে যদি পানি ঘুরিয়ে স্রোত সৃষ্টি করা যায় তবে এ অবস্থায় ২৫% এর বেশী পোনা পাত্রের মাঝে জমা হয় তবে ঐ ব্যাচের পোনা খারাপ বা দুর্বল হিসাবে বিবেচনা করতে হবে।

(ঘ) মজুদপূর্ব করণীয়:

পোনা মজুদের সময় নিম্নোক্ত সতর্কতা অবলম্বন করা হলে পোনার রোগ সংক্রমন ও মৃত্যুহার হ্রাস করা যায়।

(১) শোধন

মজুদের সময় পোনার দেহের পরজীবের সংক্রমন রোধে পোনাকে খামারে মজুদের পূর্বে এ্যারেশনসহ ১০০ মি.লিঃ/১০০০ লিটার ফরমালিনে গোসল/শোধন করিয়ে নিলে পরজীবের সংক্রমন কিছুটা রোধ করা যায়। অন্য জীবানুনাশক যেমন: ৩-৫ মি.গ্রাম/লিটার পটাশিয়াম পার ম্যঙ্গানেট শোধনের জন্য ব্যবহার করা যায়। তবে এমন কোন রাসায়নিক দ্রবাদি ব্যবহার করা যাবে না যা ক্রেতা দেশের খাদ্য ও ঔষধ প্রশাসন (এফডিএ)/অন্য কোন সংস্থা কর্তৃক ব্যবহারে বাধা নিষেধ রয়েছে।

(২) পোনা খাপ খাওয়ানো/অভ্যস্থকরণ

ছাড়ার আগে পোনাকে পুকুরের পানির লবনাক্ততা, তাপমাত্রা ও পিএইচ এর মাত্রার সাথে অভ্যস্থ করে নিতে হবে। এ জন্য প্রায় ১-২ ঘন্টা সময় ধরে পোনার পরিবহনকৃত পানির সাথে মজুদ এলাকার পানি অদল বদল করতে হবে।

- **তাপমাত্রা:** তাপমাত্রা অত্যাধিক কমে গেলে এনজাইমের কার্যক্ষমতা হ্রাস পায়, রক্তের হিমোলিম্ফ জমে যায়, কার্যক্ষমতা হ্রাস পায় অথবা লোপ পায় এবং বিপাক বিঘ্নিত হয়। আবার তাপমাত্রা অত্যাধিক বেড়ে গেলে অক্সিজেনের চাহিদা বেড়ে যায়। দেহের চর্বি, প্রোটিন এবং এনজাইম ভেঙ্গে যায়। এ অবস্থা রোধের জন্য পরিবহনকৃত পাত্রের পানি ও পুকুরের পানির তামাত্রার পার্থক্য ১০ সেঃ এর বেশী থাকা উচিত নয়। তাপমাত্রা ঘন্টায় ১.৫০ সেঃ এর বেশী বাড়ানো বা কমানো ঠিক নয়।
- **লবনাক্ততা:** বাগদার অসমোরেগুলেশান ও পরিপার্শ্বিক লবণাক্ততার মধ্যে একটি সম্পর্ক রয়েছে। লবনাক্ততা বাড়ার সাথে সাথে অসমোরেগুলেশান বেড়ে যায় এর ফলে দেহের অভ্যন্তরস্থ তরল পদার্থের পরিবর্তন ঘটে যা তাদের মৃত্যুর কারণ। বাগদার লবণাক্ততা সহ্য ক্ষমতা বিস্তৃত হলেও ঘন্টায় তা কমানোর হার ৩ পিপিটির বেশী এবং বাড়ানোর হার ১ পিপিটির বেশী হওয়া ঠিক নয়। পরিবহন পাত্র ও পুকুরের পানির মধ্যকার এ পার্থক্য ২ পিপিটির মধ্যে থাকা উচিৎ।
- **পিএইচ:** পিএইচ এর তারতম্য ঘন্টায় ০.৫ এর কম বেশী হওয়া ঠিক নয়। পরিবহন পাত্রটি ঘের/খামারের পুকুরের মধ্যে ১০-১৫ মিনিট ভাসিয়ে রেখে তাপমাত্রা, লবনাক্ততা ও পিএইচ এর পার্থ্যক্য দেখতে হবে। যদি পার্থক্য থাকে তবে ঘের/খামারের কিছু পানি পাত্রে এবং পাত্রের কিছু পানি ঘের/খামারের ফেলে দিতে হবে। এ অবস্থা ১-২ ঘন্টা পর্যন্ত চলতে পারে। উপরের নির্দেশনা অনুযায়ী সব অনুকূলে থাকলে তবে পোনা ছাড়া যাবে। তাড়াহুড়া করলে সমস্ত পোনাই মারা যেতে পারে। যতক্ষণ পোনা আপন ইচ্ছায় ঘের/খামারের পানিতে না যায় ততক্ষন অপেক্ষা করে পোনাকে নতুন পরিবেশের সাথে অভ্যস্থ করতে হবে।

ঙ) পোনা ছাড়ার স্থান ও সময়:

ঠান্ডা পরিবেশে যেমন সন্ধ্যার পর বা সকালে রোদের তীব্রতা বৃদ্ধি পাবার পূর্ব পর্যন্ত পোনা মজুদের উপযুক্ত সময়। দুপুরে বা রোদ/বৃষ্টির সময় পোনা ছাড়া উচিৎ নয়। খামারের যে অংশে নিয়ন্ত্রিত জলজ ঘাস বা আগাছা বা আশ্রয়স্থল সৃষ্টি করা হয়েছে এরূপ স্থানে পোনা ছাড়া উচিৎ, এর ফলে পোনা সহজেই তাদের আশ্রয়স্থল খুঁজে পাবে।

বাগদা চিংড়ির নার্সারি ব্যবস্থাপনা সাধারণ নার্সারি ব্যবস্থাপনা অংশে অন্তর্ভূক্ত

খাদ্য ব্যবস্থাপনা

প্রাকৃতিক খাদ্য:

উপযুক্তভাবে তৈরী ও সার প্রয়োগকৃত পুকুরে ভাসমান শৈবাল (algae) তৈরী হয়। পাশাপাশি পানির গভীরতা কম থাকলে ফিলিপিনোদের ভাষায় ল্যাব ল্যাব, লুমুট এবং দিগমান ইত্যাদি তৈরী হয়। ল্যাব ল্যাব এক ধরনের আনুবীক্ষনিক তলদেশজাত উদ্ভিদ ও প্রাণীকুলের সমষ্টি। ২৮ পিপিটি এর অধিক লবনাক্ততায় এরা জন্মে। এর পরিমাণ বেশী হলে তা পচে অ্যামোনিয়া ও হাইড্রোজেন সালফাইড তৈরী করে এবং পুকুরের তলদেশে দূষণ সৃষ্টি করে।

পরিপূরক বা সম্পূরক খাদ্য:

পোনা মজুদের প্রথম অবস্থায় বা চাষের প্রথম পর্যায় প্রাকৃতিক খাদ্য চিংড়ির বৃদ্ধির জন্য পর্যাপ্ত মনে হলেও চিংড়ি বড় হবার সাথে সাথে সম্পূরক খাদ্যের চাহিদা দেখা দেয়। চিংড়ির পুষ্টির জন্য বিভিন্ন ধরনের খাবার দেয়া হলে লক্ষ্য রাখতে হবে প্রদত্ত খাবারে প্রয়োজনীয় পুষ্টিমান বিদ্যমান আছে কি না এবং প্রদত্ত খাবার পানি দূষনের সৃষ্টি করে কি না। সাধারণত খাদ্য হিসাবে পিলেট ও খামারে তৈরী খাদ্যই চিংড়ি চাষে ব্যবহৃত হয়।

পিলেট খাবার:

দেশে বর্তমানে বেশ কয়েকটি পিলেট তৈরী কারখানা রয়েছে। তারা বিভিন্ন ধরনের খাদ্য তৈরী করে থাকে। কারখানায় তৈরী খাদ্য বয়লার প্রেসার কুকারে সিদ্ধ করে পিলেট তৈরী করে থাকে। এ সমস্ত খাদ্য সহজ পাচ্য এবং পানিতে সহজে গুলে যায় না। চিংড়ির বয়স ও সাইজ ভিত্তিক বিভিন্ন আকারের পিলেট তৈরী হয়ে থাকে। যেমন:

খাদ্যের নাম	চিংড়ির উপযুক্ত বয়স
নার্সারি ফিড	মজুদের পর ১ সপ্তাহ (নার্সারিতে)
স্টার্টার - ১	মজুদের পর ২য় সপ্তাহ (নার্সারিতে)
স্টার্টার - ২	মজুদের পর ৩য় সপ্তাহ প্রয়োজনে ৪র্থ সপ্তাহ (নার্সারিতে)
গ্রোয়ার	৪র্থ/৫ম থেকে ১০ম সপ্তাহ (লালন পুকুরে)
ফিনিসার	১১তম থেকে ধরা পর্যন্ত

বিভিন্ন খাদ্যের গুণগতমান ও আকার ভিন্ন হয়ে থাকে। ছোট অবস্থায় প্রোটিনের চাহিদা বেশী, বড় হলে পরিমান কমে আসে।

খামারে প্রস্তুত মিশ্রিত খাবার:

এ খাবার প্রয়োগে চিংড়ি চাষিরা বেশী উৎসাহী কারণ তাতে খরচ কম। তবে খাদ্য উপাদান উপযুক্ত ও সহজ পাচ্য না হলে পানি দূষণসহ চিংড়ির স্বাভাবিক বৃদ্ধি বাধাগ্রস্থ হতে পারে। চিংড়ির খাদ্যে ৩০-৪০% আমিষ, ২০% শ্বেতসার ৫-১০% চর্বি বা ফ্যাট, ভিটামিন ও খনিজ পদার্থ ২% হিসাবে থাকলে ভালো হয়। চিংড়ির দেহের জন্য প্রয়োজনীয় এ্যামাইনো এসিড, ফ্যাটি এসিড ও মিনারেল পাওয়া নিশ্চিত করতে হবে।

খামারে খাদ্য তৈরীর একটি নমুনা দেওয়া হলো:

ফিস মিল (মাছের গুড়া)	-	২৩%
সয়াবিন মিল	-	১৫%
সরিষার খৈল	-	৩০%
চালের কুড়া (অটো পালিশ)	-	১০%
গম চূর্ণ	-	১০%
আটা	-	১০%
চিটাগুড়		২%
মোট	=	**১০০%**

প্রতি কেজি খাদ্যে ১ গ্রাম ভিটামিন প্রিমিক্স ও ১ গ্রাম লবণ ব্যবহার করতে হবে। সরিষা খৈল ব্যবহারের পূর্বে বেশী পানিতে ভিজিয়ে রেখে উপর থেকে তেল মিশ্রিত পানি ফেলে ক্ষতিকর পদার্থ অপসারণ করে নিতে হবে।

ভিটামিন ছাড়া অন্য উপাদান সবগুলো ভালো ভাবে মিশিয়ে সিদ্ধ করে পরবর্তীতে ভিটামিন মিশিয়ে সেমাই/নুডুল তৈরী মেশিনে অথবা ছোট দলা তৈরী করে শুকিয়ে চিংড়িকে খাওয়ানো যায়। চিংড়ি তার পায়ের চিমটার সাহায্যে খাদ্য ধরে আস্তে আস্তে অনেক সময় নিয়ে খাদ্য গ্রহণ করে বিধায় দলা বা তৈরী পিলেট যেন পানিতে অন্তত ২ ঘন্টা স্থায়ী হয় সে বিষয় লক্ষ্য রাখতে হবে। এ ক্ষেত্রে চিটা গুড়ের পরিবর্তে বাইন্ডার ব্যবহার করতে হবে।

খাদ্য প্রয়োগ পদ্ধতি:

চিংড়িকে খাদ্য প্রয়োগের পূর্বে অবশ্যই জানতে হবে যে কি কি প্রজাতির মাছ মজুদ রয়েছে, চিংড়ির আকার ও বয়স, চিংড়ির গড় ওজন, পানির গুণাগুণ, চিংড়ির শারীরিক সুস্থতা ইত্যাদি।

চিংড়ির দেহ ওজনের ১০-৭ % খাদ্য প্রথম ৪-৫ সপ্তাহ (চিংড়ির ওজন ৫ গ্রাম) প্রদান করে পরবর্তীতে ৫-৪% প্রয়োগ করতে হবে। তবে খামারের বিভিন্ন স্থানে ফিডিং ট্রে (খাদ্যদানী) স্থাপন করে চিংড়ির খাদ্য গ্রহণ প্রবণতা যাচাই করে খাদ্যের পরিমাণ কমবেশী নির্ধারণ করতে হবে। ফিডিং ট্রে পরীক্ষার সময় যদি দেখা যায় যে খাদ্য শেষ হয়ে গেছে তাহলে পরবর্তীতে খাদ্যের পরিমাণ বাড়িয়ে দিতে হবে। একইভাবে খাদ্য ট্রেতে থেকে গেলে পরবর্তীতে খাদ্য কমিয়ে দিতে হবে। খামারে অন্য মাছ বা চিংড়ি থাকলে তার জন্য বাড়তি খাবার দিতে হবে। অর্থনৈতিকভাবে উপযুক্ত নয় এরূপ চিংড়ি/মাছকে দামী খাবার প্রদান করলে তা আর্থিক ক্ষতির কারণ হতে পারে।

খাদ্য প্রয়োগের সময়:

চিংড়ি সাধারণতঃ সবসময় খাদ্য গ্রহণ করে, তবে অন্ধকারাচ্ছন্ন অবস্থায় খাদ্য গ্রহণে স্বাচ্ছন্দ বোধ করে। প্রতিদিনকার খাদ্য চাহিদা নিরূপণ করে মোট খাদ্যকে ৩ বার খামারে প্রয়োগ করা হলে পানি দূষণের সম্ভাবনা কমে যায়।

নিম্নবর্ণিত সময়ে খাদ্য বন্টন করে প্রয়োগ করা যেতে পারে:

সময়	মোট খাবার
সন্ধ্যা (৬-৭ টায়)	৪০%
রাত্র (১১ টায়)	৩০%
সকাল (৬ টায়)	৩০%

পানি পরিবর্তন বা বায়ু সঞ্চালনের মাধ্যমে স্রোত সৃষ্টি করে অব্যবহৃত খাদ্য ঘের/খামার থেকে বের করে দিলে রোগ ও পানি দূষণের ঝুঁকি কমে যায়।

খাদ্য প্রয়োগে সতর্কতা:

উপযুক্ত খাদ্য না পেলে চিংড়ি তা গ্রহণ করে না। উচ্ছিষ্ট খাদ্য পানি দূষণ ও রোগ সংক্রমণের অন্যতম কারণ। তাই খাদ্য প্রয়োগে যথেষ্ট সতর্ক না থাকলে উপকারের চেয়ে অপকার হতে পারে। তাই নিম্নবর্ণিত সতর্কতা অবলম্বন বাঞ্চনীয়:

১. খাদ্যের মান উপযুক্ত হতে হবে, তাই খাদ্য পরীক্ষা করে নেয়া উচিত;
২. পঁচা বা ফাঙ্গাসযুক্ত খাবার দেয়া যাবে না;
৪. খাদ্য ট্রেতে খাদ্য গ্রহণ পর্যবেক্ষণ করতে হবে;
৫. নির্দিষ্ট স্থানে নির্দিষ্ট সময়ে খাদ্য দিতে হবে;
৬. অন্য প্রাণী যেন চিংড়ির খাদ্য গ্রহণ না করে তার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে; এবং
৭. গ্রোথ হরমোন বা কোন প্রকার এন্টিবায়োটিক খাবারের সাথে ব্যবহার করা নিষিদ্ধ।

পানি ব্যবস্থাপনা

পানি ব্যবস্থাপনা বলতে খামারের পানির ক্ষতিকর গুণাবলী সহনীয় মাত্রায় রাখা এবং পানি যেন চিংড়ির জন্য ক্ষতিকর না হয় এ ব্যবস্থাপনাকে বুঝায়। চিংড়ি/মাছ চাষের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ ভাল গুণগতমান সম্পন্ন পানি সরবরাহ খুবই জরুরী। জলজ প্রাণীর প্রজনন, বৃদ্ধি ও বেঁচে থাকা পানির গুণাগুণের উপর নির্ভর করে। পানির ভৌত এবং রাসায়নিক গুণাগুণ বাগদা চিংড়ির বৃদ্ধি এবং বেঁচে থাকার ওপর প্রভাব ফেলে।

পানির গুণাগুণের ওপর প্রভাব বিস্তারকারী কিছু ভৌত ও রাসায়নিক গুণাগুণ:

ক) ভৌত গুণাগুণ:

১। পানির গভীরতা:

চিংড়ি খামারে পানির গভীরতা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। চিংড়ি চাষে নার্সারিতে পানির গভীরতা ০.৮-১.০ মিটার এবং চাষ এলাকায় ১.৫-২.০ মিঃ হওয়া উচিত।

২। তাপমাত্রা:

বাগদা চিংড়ির উৎপাদন ২৫-৩০০ সেঃ তাপমাত্রায় ভাল হয়। ২৫০সেঃ তাপমাত্রার নীচে বৃদ্ধির হার কমতে থাকে এবং ২০০ সেঃ তাপমাত্রার নীচে প্রায় থেমে যায় অথবা খুবই কম হয়। এমনকি অধিক শীতে খাদ্য গ্রহণ প্রবনতা কমে যায়, ফলে বৃদ্ধি কম হয় অথবা থেমে যায়, খোলস পরিবর্তন করে না, এমনকি রোগের প্রাদূর্ভাব ঘটে মড়কও দেখা যায়। ১৪০ সেঃ তাপমাত্রার নীচে চিংড়ির মড়কও হতে পারে। আবার অত্যধিক গরমে (৩৩০ সে: এর উর্দ্ধে) চিংড়ির পীড়ন শুরু হয় এবং ৩৫০ সেঃ এর উর্দ্ধে মড়ক হতে পারে।

৩। পানির স্বচ্ছতা:

পানির স্বচ্ছতা নির্ভর করে পলি কণা এবং প্লণ্ঢাংকটন কণার ঘনত্ব ও দূষণের মাত্রার উপর। উন্নত ব্যপক চিংড়ি চাষ পদ্ধতিতে ৩০-৩৫ সে:মিঃ গভীরতায় যদি সেক্কি ডিস্ক অদৃশ্য হয়ে যায় তবে পানিতে স্বাভাবিক খাদ্য কণার উপস্থিতি উপযুক্ত ধরা হয়। অস্বচ্ছতা বেড়ে গেলে বা প্লণ্ঢণ্ঢাংকটনের আধিক্যের ফলে ২৫ সে: মি: গভীরতায় সেকি ডিস্ক অদৃশ্য হয়ে গেলে পানি পরিবর্তনের হার বাড়ানো দরকার এবং যদি সেকি ডিস্ক অদৃশ্য হতে ৩৫ সে: মি: এর অধিক গভীরতার প্রয়োজন হয় তবে পানি পরিবর্তনের হার কমাতে হবে এবং সার প্রয়োগ করে পানির উর্বরতা বৃদ্ধি করতে হবে।

খ) রাসায়নিক গুণাগুণ:

১। লবণাক্ততা:

বাগদা চিংড়ি ব্যাপক লবণাক্ততার তারতম্য (০-৪০ পিপিটি) সহ্য করতে পারে। এমনকি মিষ্টি পানিতেও বেঁচে থাকতে পারে এবং সীমিত সময় পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়। ছোট অবস্থাতেও চিংড়ি লবণাক্ততার উঠানামা সহ্য করতে পারে। দেখা গেছে ১০-২৫ পিপিটি লবণাক্ততায় বাগদা চিংড়ির উৎপাদন ভাল হয়। লবণাক্ততার হঠাৎ তারতম্য চিংড়ির দেহে পীড়ন ঘটায়, খাদ্য গ্রহণের প্রবণতাও কমে যায় এবং চিংড়ির রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়। সাধারণত: বৃষ্টির কারণে চিংড়ি খামারে লবণাক্ততা কমে যায়। খামার ও নদীর/উৎসের পানির লবণাক্ততার তারতম্য থাকাকালীন নদীর/উৎসের পানি খামারে প্রবেশ করালে লবণাক্ততার তারতম্য ঘটবে। খামারে বৃষ্টির পানি মিষ্টি হওয়ায় লবণ পানির চেয়ে হালকা হয়, তাই উপরের স্তরের পানি বের করে খামারের লবণাক্ততা কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করা যায়। অতি লবণাক্ততা চিংড়ি ও প্লাংকটনের জন্য ক্ষতিকর।

২। পিএইচ:

চিংড়ি খামারে পানির পিএইচ ৭.৫-৮.৫ হওয়া ভাল। কম পিএইচ হলে চিংড়ির ক্লেশ হয় এবং মৃত্যুহার বেড়ে যেতে পারে। কম পিএইচের ফলে চিংড়ির খোলস নরম হয় এবং খোলস বদল করতে পারে না। পিএইচ কাঙ্খিত মাত্রার চেয়ে কম বা বেশী হলে চিংড়ির খাদ্য গ্রহণ প্রবণতা কমে যায়। কম পিএইচ এর ফলে চিংড়ি কালো হয়ে যায় এবং পা ও লেজ ক্ষয় হয়ে যায়। পিএইচ কম হলে খামারের প্রাকৃতিক খাদ্য অর্থাৎ প্লণ্ঢাংকটনের উৎপাদনে ব্যাঘাত ঘটে।

৩। ক্ষারত্ব ও খরতা:

পানিতে বিভিন্ন ক্ষার (বাইকার্বনেট ও কার্বনেট) এর ঘনত্বই হলো ক্ষারত্ব। আর ক্যালসিয়াম এবং ম্যাগনেসিয়ামের মোট ঘনত্ব হচ্ছে খরতা, যা প্রকাশ করা হয় ক্যালসিয়াম কার্বনেটের পরিমাণ দিয়ে। মোট খরতার পরিমাণ মোট ক্ষারত্বের সাথে সম্পর্কিত। চিংড়ি চাষের উপযোগী ক্ষারত্ব ও খরতার মান হলো ৮০-২০০ মি:গ্রা:/লিটার। খামারে নিয়মিত চুন অথবা জিপসাম প্রয়োগ করে ক্ষারত্ব ও খরতা নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

৪। দ্রবীভূত অক্সিজেন:

চিংড়ি চাষের খামারে ৪-৮ পিপিএম (মি.গ্রাম/লিটার) বা ততোধিক দ্রবীভূত অক্সিজেন থাকা ভাল, কমপক্ষে ৩ পিপিএম থাকা আবশ্যক। পানির ভিতরকার জলজ উদ্ভিদ বা উদ্ভিদ কণা এবং পানি সংলগ্ন বাতাস থেকে এ দ্রবীভূত অক্সিজেন পাওয়া যায়। দিনের বেলায় জলজ খামারে মাছ ও চিংড়ি মজুদের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণে রাখা উচিত। উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও ঘনত্ব নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন এবং তলদেশে পঁচনশীল জৈব পদার্থ জমতে দেয়া উচিত নয়।

৫। অ্যামোনিয়া:

খামারের পানিতে অ্যামোনিয়ার উপস্থিতি পানি দূষণ করে। বেশী পিএইচ এবং তাপমাত্রায় অ্যামোনিয়া অধিক বিষাক্ত। তলদেশে জৈব পদার্থের পচন, অব্যবহৃত খাদ্য ও জলজ আগাছার পচন এবং জলজ প্রাণীর মলমূত্র ত্যাগের ফলে অ্যামোনিয়া বৃদ্ধি পায়। খামারের পানিতে মুক্ত অ্যামোনিয়ার উপস্থিতি চিংড়ির ক্লেশ, স্বাস্থ্যহানি, বৃদ্ধিহানি এমন কি মৃত্যু ঘটাতে পারে। মুক্ত অ্যামোনিয়ার মাত্রা ০.১ পিপিএম (মি.গ্রাম/লিটার) এর কম থাকাই বাঞ্চনীয়। পানি পরিবর্তন ও চুন প্রয়োগ করে অ্যামোনিয়া নিয়ন্ত্রনে রাখা যায়।

৬। হাইড্রোজেন সালফাইড:

খামারের পানিতে হাইড্রোজেন সালফাইডের উপস্থিতি মাছ ও চিংড়ির প্রচুর ক্ষতি করে। চিংড়ি চাষে আনআয়নাইজড হাইড্রোজেন সালফাইডের কাঙ্খিত মাত্রা ০.০৩ পিপিএম (মি.গ্রাম/লিটার)এর কম। কম পিএইচ এ হাইড্রোজেন সালফাইড বেশী বিষাক্ত। খামার প্রস্তুতকালীন সময়ে কালো কাদা অপসারণ করে, শুকিয়ে বা তলদেশ ধৌত করে এবং চাষকালীন সময়ে নিয়মিত পর্যাপ্ত পরিমাণ পানি পরিবর্তন এবং বায়ু সঞ্চালনের মাধ্যমে হাইড্রোজেন সালফাইডের আধিক্য রোধ করা যায়।

৭। চাষক্ষেত্রে ব্যবহৃত রাসায়নিক দ্রব্যাদি:

বর্তমানে চিংড়ি চাষে বিভিন্ন ধরণের রাসায়নিক দ্রব্যাদি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বিশেষ করে আধা-নিবিড় বা নিবিড় চাষ পদ্ধতিতে অনেক ধরণের রাসায়নিক দ্রব্যাদি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। চিংড়ির ক্রেতা বা আমদানীকারক দেশেরও বিভিন্ন ধরণের রাসায়নিক দ্রব্যাদি ব্যবহারের বিধি-নিষেধ রয়েছে। অবৈধ দ্রব্যাদি ব্যবহার রপ্তানীতে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করতে পারে। প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদনের জন্য সঠিক মাত্রায় বৈধ গুণাগুণ সম্পন্ন কোন খনিজ পদার্থ বা সার যদি ব্যবহার করা হয় তবে সেক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখতে হবে ব্যবহৃত দ্রব্যাদি যেন পরিবেশের (মাটি, পানি, প্রাণী দেহ) ক্ষতি না করে।

পানির উৎস ও সরবরাহ:

চিংড়ি চাষের জন্য উপযুক্ত পানি সাধারণত: সমুদ্র থেকেই পাওয়া যায় এবং উপকূলীয় নদী ও খালের মাধ্যমে খামারে সরবরাহ হয়। এছাড়া অধুনা ভূগর্ভস্থ পানিও ব্যবহৃত হচ্ছে। বিভিন্ন উৎসের পানির গুণাগুণও প্রায় ক্ষেত্রে ভিন্ন হয়ে থাকে। যে উৎস থেকেই পানি সরবরাহ হোক না কেন খামারে পানি ঢোকাবার পূর্বে থিতিয়ে, বায়ু সঞ্চালনপূর্বক পানি শোধন ও পানি ছেকে নেয়া ভাল।

পানি পরিবর্তন:

খামারে চিংড়ি মজুদের পরপরই খাদ্য, প্লাংকটন, চিংড়ি ও অন্য মাছের বর্জ্যের কারনে পানিতে জৈব ও অজৈব পদার্থের পরিমাণ বেড়ে যায়। এ অবস্থায় পানি পরিবর্তন করে পানির ভৌত ও রাসায়নিক গুণাগুণের উন্নয়ন করা যায়। চাষের প্রথম ৩০ দিন শুধু পানি উত্তোলন বা পানি যোগ করে পানির গুণাগুণ রক্ষা করা যায়। পরবর্তী চাষকালীন সময় নিয়মিত ও পরিমিত (১০-২০%) পানি প্রতি ১০-১৫ দিন অন্তর পরিবর্তন করা প্রয়োজন। যেখানে খাদ্য প্রয়োগ করা হয় সেখানে এ হার ৩০-৪০% হতে পারে। অভিকর্ষ পদ্ধতিতে জোয়ারে পানি উপযুক্ত গেটের মাধ্যমে খামারে নেয়া যায় বা প্রয়োজনে পাম্প ব্যবহার করা যায়। খামারে প্রথমে পানি ঢুকিয়ে অপর দিক দিয়ে বের করাই উত্তম। পানির গভীরতা সব সময় এক রকম রেখেই পানি পরিবর্তন করা উত্তম।

পানির উর্বরতা সংরক্ষণ ও ফাইটোপ্লাংকটন ব্যবস্থাপনা:

চিংড়ি খামারে ফাইটোপ্লাংকটন উৎপাদন নিশ্চিত হলে চিংড়ির উৎপাদনও নিশ্চিত করা যায়। খামারে পানির উর্বরতা বৃদ্ধি করা মানে ফাইটোপ্লাংকটনের উৎপাদন নিশ্চিত করা। পানিতে নিয়মিত প্রতিবার পানি পরিবর্তনের পর হেক্টর প্রতি ৫০ কেজি ডলোচুন বা কৃষি চুন প্রয়োগ করা প্রয়োজন। পোড়া চুন ব্যবহার করলে হেক্টর প্রতি ২০ কেজি দিতে হবে। এক্ষেত্রে এ চুন অন্তত: ২৪ ঘন্টা পানিতে (অন্যত্র) ভিজিয়ে রাখতে হবে। সব সময় চুন পানিতে গুলে সমস্ত খামারে ছিটিয়ে দিতে হবে। চুন প্রয়োগের ১-২ দিন পর একর প্রতি ১ কেজি ইউরিয়া ও ১ কেজি টিএসপি সার দিতে হবে। পরপর ২-৩ দিন দেয়াই উত্তম। সার পাতলা করে গুলে ঘের/খামারে ছিটিয়ে দিতে হবে। সেক্কি ডিক্স রিডিং সঠিক থাকলে সার দেয়া উচিত নয়। সব সময় রৌদ্রজ্বল দিনে সকালের দিকে সার দেয়া উত্তম। হালকা সবুজ ও হলদে সবুজ পানির রং স্বাস্থ্যকর ফাইটোপ্লণ্ঢাংকটনের লক্ষণ। এছাড়া জৈব সার হিসাবে একর প্রতি ৪ কেজি চালের অটোকুঁড়ো, ৪ কেজি চিটাগুড় ও ৪০ গ্রাম ইষ্ট পাউডার মিশ্রিত করে ২৪ ঘন্টা ভিজিয়ে রেখে পচিয়ে এর নির্যাস ব্যবহার করা যায় এবং এর মাধ্যমে উৎপাদিত প্লাংটনের গুনগতমান ও স্থায়ীত্ব ভাল হয়।

আহরণ ও আহরনোত্তর পরিচর্যা এবং বাজারজাতকরণ

আহরণের সময় থেকে শুরু করে প্রক্রিয়াকরণ কারখানায় পৌছানো পর্যন্ত বিভিন্ন ধাপে প্রয়োজনীয় পরিচর্যার অভাবেই চিংড়ির গুনগত মানের বিরাট ক্ষতি হয়ে যায়। এটি মনে রাখা প্রয়োজন যে, কোনভাবে একবার গুণগতমানের অবনতি হলে তাকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়। সুতরাং ঘের/খামার এবং প্রক্রিয়াকরণ কারখানার মধ্যবর্তী পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট ধাপগুলিতে চিংড়িকে সঠিকভাবে পরিচর্যা করা খুবই জরুরী।

গুণগতমান

চিংড়ির গুণগতমানের বিষয়ে বিদেশী ক্রেতাদের থেকে পাওয়া অভিযোগের মধ্যে ক্ষতিকর জীবানুর (স্যালমোনেলা, ভিব্রিও কলেরা, স্ট্যাফাইলোকক্কাস ইত্যাদি) উপস্থিতি, ক্ষতিকর এন্টিবায়োটিকের (ক্লোরামফেনিকল, নাইট্রোফিউরান্স) ও গ্রোথ হরমোনের উপস্থিতি, ভিজিয়ে ওজন বাড়ানো (Soaked), বিভিন্ন অপদ্রব্যের উপস্থিতি (পুশ) ও বিভিন্ন নোংরা বস্তুর উপস্থিতি ইত্যাদি।

আহরণ ও বাজারজাতকরণে বিভিন্ন ধাপে প্রয়োজনীয় পরিচর্যা:

- একদিন আগে খাবার দেওয়া বন্ধ করে দেয়া এবং ভোরে অথবা ঠান্ডা আবহাওয়ায় চিংড়ি আহরণ করা;
- তৈরী খাবারে এন্টিবায়োটিক, গ্রোথ হরমোন ও অন্যান্য রাসায়নিকদ্রব্য প্রয়োগ করা হয় সেক্ষেত্রে খাদ্য প্রস্তুতকারীর নির্দেশনা অনুযায়ী নির্ধারিত সময় পার হওয়ার পর চিংড়ি আহরণ করতে হবে;
- আহরণের সময় সরঞ্জাম ও পদ্ধতি নির্বাচনের ক্ষেত্রে চিংড়ির যাতে কম পীড়ন হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। গই ব্যবস্থার পরিবর্তে উপযুক্ত ফাঁদ ও নির্ধারিত ফাসের ঝাঁকি জাল দিয়ে চিংড়ি ধরলে কম পিড়ন হয়;
- চিংড়ি অধিক আঘাত পায়, অঙ্গ বিনষ্ট হয় এবং ত্বকে ক্ষতের সৃষ্টি হয় এমন কোন পদ্ধতি, কৌশল কিংবা সরঞ্জাম দিয়ে চিংড়ি আহরণ থেকে বিরত থাকা; এবং
- চিংড়ি আহরণের পর বরফ ঠান্ডা পানিতে ভালকরে ধুয়ে নিতে হবে যাতে কোন কাদা বা ময়লা না থাকে।

ঘের/খামারে সাময়িক সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ:

- ধরার পর চিংড়ি রোদে না রেখে ছাউনির মধ্যে রাখতে হবে এবং ধরার পর চিংড়িকে ছাউনির মধ্যে পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত মসৃণ পাকা জায়গায় অথবা পরিষ্কার প্লাস্টিকের শিটের উপর রাখতে হবে;
- পরিষ্কার ও শীতল পানিতে চিংড়িকে ভালভাবে ধুয়ে পরিষ্কার করতে হবে এবং পরিষ্কার চিংড়িকে ভাল পানি দিয়ে তৈরী কুচি বরফের মধ্যে রাখতে হবে;
- প্লাস্টিকের বাক্সের মধ্যে সাধারণত **১:১** অনুপাত বরফ ও চিংড়ি স্তরে স্তরে সাজাতে হবে;
- যথাসম্ভব দ্রুত চিংড়িকে ডিপো/আড়তে/সার্ভিস সেন্টারে/সরাসরি প্রক্রিয়াকরণ কারখানায় পরিবহনের ব্যবস্থা করতে হয়;
- বরফে ঠান্ডা করা আস্ত চিংড়ি কুচি বরফের মধ্যে প্লাস্টিকের বাক্সে ইনস্যুলেটেড (তাপ নিরোধক) ট্রাকে বা ভ্যানে পরিবহন করা;
- উপযুক্ত ডিজাইনের শক্ত প্লাস্টিকের বাক্সে চিংড়ি পরিবহন করতে হবে যাতে পরিবহনকালে চিংড়িতে চাপ না লাগে; এবং
- পরিবহনের পর পরিবহনযান/চিংড়ির বাক্স উপযুক্ত সাবান, ডিটারজেন্ট ও জীবাণুনাশক দিয়ে ভাল করে ধুয়ে শুকিয়ে ফেলা।

চিংড়ি পরিবহনের কাজে বাঁশের ঝুড়ি বা চাটই, হোগলার পাটি, চট, ইত্যাদির ব্যবহার হ্যাসাপ নীতি মোতাবেক সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। চিংড়ি পরিবহণের জন্য উপযুক্ত ডিজাইনের প্লাস্টিক বাক্স ব্যবহারের নিয়ম। মাথা ছাড়ানো চিংড়ি গ্রহণ, ডিপোতে মাথা ছাড়ানো, মাঠ পর্যায়ের যে কোন স্থানে ওজন বাড়ানোর জন্য চিংড়ির দেহে ইনজেকশানের মাধ্যমে পানি, সাগুদানা বা বার্লি, আটা বা ময়দা, গোলানো সিমেন্ট বা অন্য যে কোন অপদ্রব্য পুশ করানো, লোহা বা কাঁচের টুকরা ঢুকানো এবং নরম ও তুলতুলে চিংড়িকে শক্ত দেখানোর জন্য চিংড়ির দেহে লোহা বা নারকেলের শলা ঢুকানো- এ সবই গুরুতর এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এ অবৈধ কাজের কারনে বিদেশে বাংলাদেশের চিংড়ি রপ্তানী বন্ধ হয়ে যাওয়ার আশংকা দেখা দিয়েছে।

বদ্ধ জৈব পদ্ধতিতে বাগদা চিংড়ি চাষ

জৈব বদ্ধ চাষ পদ্ধতি বলতে বুঝায় সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে রাসায়নিক পদার্থের পরিবর্তে জৈব পদার্থ ব্যবহার করে যে চাষ পদ্ধতি বাস্তবায়ন করা হয়। এ পদ্ধতিতে ঘের/খামারের পানি সচরাচর পরিবর্তন করা হয় না। সাধারণত একটি ফসলের জন্য পানি উত্তোলন করে তা জীবাণূনাশক দ্বারা বিশুদ্ধ করে ঐ ফসলের সমগ্র চাষকালীন সময়ের জন্য ব্যবহার করা হয়। তবে বিশেষ প্রয়োজনে পানি পরিবর্তনের দরকার হলে রিজার্ভারে সংরক্ষিত জীবাণুমুক্ত পানি ব্যবহার করা হয়। জৈব বদ্ধ উন্নত পদ্ধতিতে বাগদা চিংড়ি চাষ শুরু করার পূর্বে স্থান নির্বাচন, পুকুর তৈরীসহ সকল কার্যাবলী সুষ্ঠু ও সুচারুভাবে সম্পন্ন করতে হবে।

পুকুর তৈরীতে বিবেচ্য বিষয়গুলো:

ক) পুকুরের আয়তন যথাসম্ভব ছোট করতে হবে। সাধারণত ৫০ শতাংশ হতে ১০০ শতাংশ হলে ভাল হয়;

খ) পুকুরের পাড় হবে প্রশস্ত, মজবুত, ঢালু ও উঁচু এবং পাড় ভালভাবে দুরমুজ করতে হবে;

গ) পুকুরের পানির গভীরতা হতে হবে ১.৫-২.০মি:, পুকুরের পানি ধরে রাখা এবং ভিতরের পানি বাইরে এবং বাইরের পানি ভিতরে প্রবেশ বন্ধে পাড় তৈরীতে শক্ত পুরু পলিথিন ব্যবহার করতে হবে;

ঘ) প্রতিবার চাষ শুরু করার আগে ঘের ভালভাবে শুকিয়ে নিতে হবে, তলার কালো কাদা দুর করতে হবে; এবং

চ) ঘেরে/পুকুরে রোগজীবাণুবাহী প্রাণির অনুপ্রবেশ বন্ধ করার লক্ষ্যে ঘন নেট/জাল দিয়ে পুকুরের চারপাশ ঘিরে দিতে হবে।

পুকুরে পানি উত্তোলন ও জীবাণুমুক্তকরণ:

পুকুর তৈরীর পর পুকুরে পরিষ্কার ও নিরাপদ পানি প্রবেশ করাতে হবে। সেক্ষেত্রে পানি ভাল করে ছেঁকে প্রবেশ করানো ভালো। পানি প্রবেশ করানোর পর পানি বিশুদ্ধ করা প্রয়োজন। সেক্ষেত্রে পানির লবনাক্ততার ওপর ভিত্তি করে ৫০০-৭০০গ্রাম/শতাংশ/ফুট পানিতে ব্লিচিং পাউডার প্রয়োগ করে পানি জীবাণুমুক্ত করা হয়। ব্লিচিং পাউডার দিনের যে কোন সময় প্রয়োগ করা যেতে পারে। তবে দিনের চেয়ে রাতে প্রয়োগ করলে বেশী ভাল ফল পাওয়া যায়।

পুকুরে প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদন:

ব্লিচিং পাউডার প্রয়োগের ৫-৭ দিন পর পানিতে প্রাকৃতিক খাবারের স্বাভাবিক উৎপাদন বজায় রাখতে হেক্টর প্রতি অটো পালিশ ১০ কেজি, চিটাগুড় ১০ কেজি ও ইস্ট ১০০ গ্রাম দুই গুন পানিতে ভিজিয়ে রেখে ২৪ ঘন্টা পর ঘন ন্যাকড়ায় ছেকে নিয়ে পুকুরের সর্বত্র ছিটিয়ে দিতে হবে। এভাবে পর পর তিন চার দিন প্রয়োগ করতে হবে। মিশ্রণ প্রয়োগের পর প্রতিদিন ৪/৫ বার পানি ঘোলা করতে হবে যতদিন পর্যন্ত না পানির রং হালকা সবুজ বর্ণ ধারণ করে। পুকুরে পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক খাবার তৈরী হলো কি না তা সেকিডিস্ক রিডিং দেখে জানা যাবে। বাগদা চিংড়ির পিএল নার্সিং এর জন্য উপযুক্ত রিডিং হলো ৩০-৩৫ সেমি:। প্রথমবার মিশ্রণ প্রয়োগের ৮/১০ দিন পরও যদি কাংখিত ফলাফল না পাওয়া যায় তবে প্রক্রিয়াটি পূণরায় প্রয়োগ করতে হবে।

পানির গুণাগুণ পরীক্ষা

পুকুরের পানির গুণাগুণ উৎপাদন ব্যবস্থাকে দারুনভাবে প্রভাবিত করে। তাই নিয়মিত পানির গুণাগুণ পরীক্ষা করতে এবং সঠিকমান বজায় রাখার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

চিংড়ি চাষে পানির আদর্শ গুণাগুণগুলো হলো:

পানির গভীরতা	: ১-১.৫ মি:	পানির স্বচ্ছতা	: ৩০-৩৫ সে.মি.
লবনাক্ততা	: ৫-১৫ পিপিটি	পানির পিএইচ	: ৭.৫-৮.৫
পানিতে অক্সিজেন	: ৮ মি.গ্রা./লি.	পানির ক্ষারত্ব ও খরতা	: ৮০-১২০ পিপিএম
এ্যামোনিয়া	: ০.১০ পিপিএম এর কম	হাইড্রোজেন সালফাইড	: ০.০৩ পিপিএম এর কম

পিএল মজুদের পূর্বে অবশ্যই পানির গুণাগুণ পরীক্ষা করতে হবে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
গুনগতমান সম্পন্ন পিএল সনাক্তকরণ, পরিবহন ও মজুদ বিষয়ে পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে।

চাষকালীন পানির গুণাগুণ বজায় রাখা:

চাষকালীন সময়ে অবশ্যই পানির গুণাগুন বজায় রাখতে হবে। সেক্ষেত্রে প্রতিদিন সকাল ৬.০০ টায় এবং বিকাল ৩.০০ টায় পানির পিএইচ পরিমাপ করে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এছাড়া দ্রবীভূত অক্সিজেন, পানির লবনাক্ততা, এ্যামোনিয়াসহ অন্যান্য নিয়ামকগুলো নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করতে হবে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। চিংড়ি চাষে পানির গুণাগুণ বজায় রাখতে বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক পদার্থের পরিবর্তে প্রবায়োটিক ব্যবহার করা যেতে পারে। প্রবায়োটিক ব্যবহারের ফলে:

- মাটি ও পানির পচঁনজনিত ক্ষতিকর গ্যাস নিয়ন্ত্রণ করে ও খাদ্য পচনজনিত ক্ষতিকর প্রভাব কমায়;
- পুকুরের তলদেশ ভাল রাখে এবং অপকারী ব্যাকটেরিয়ার পরিমান কমায় ও উপকারী ব্যাকটেরিয়ার পরিমান বাড়ায়;
- ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া প্রতিরোধ করে এবং চিংড়ির রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়।

খাদ্য প্রয়োগ

পোনা ছাড়ার পর পুকুরে নিয়মিতভাবে গুণগতমান সম্পন্ন সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগ করতে হবে। খাদ্যের মান গুণগত মানসম্পন্ন না হলে চিংড়ির উৎপাদন ব্যহত হতে পারে এমনকি চিংড়ি বিভিন্ন রোগ জীবাণু দ্বারাও আক্রান্ত হতে পারে।

খাদ্য প্রয়োগে বিবেচ্য বিষয়:

- ভাল মানের খাবার সঠিক পরিমানে দিতে হবে এবং একই স্থানে, একই সময়ে খাবার দিতে হবে;
- মাঝে মাঝে খামারের মাছ চিংড়ি নমুনায়ন করে খাদ্যের পরিমান ঠিক করতে হবে;
- দিনের সব খাবার একবারে নয়, ৩-৪ বার দিতে হবে। রাতের বেলা বেশী খাবার দিতে হবে;
- চিংড়ি বাড়ছে কি না, সুস্থ্য সবল আছে কি না তা দেখতে হবে;
- পুকুরে পরিমিত পরিমান প্রাকৃতিক খাবারের উপস্থিতি রক্ষা করতে হবে; এবং
- শুকনা খাবারে কেজি প্রতি ১ গ্রাম হারে ভিটামিন প্রিমিক্স ব্যবহার করতে হবে।

বাগদা চিংড়ি খামারের চিংড়ির স্বাস্থ্য ও বৃদ্ধি পরীক্ষা:প্রতি ৭ দিন পরপর নমুনায়ন করে পুকুরে চিংড়ির স্বাস্থ্য ও খাবারের পরিমান নির্ধারণ করতে হবে।

খাঁচায় মাছচাষ

ভূমিকা

বাংলাদেশে মাছের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের জন্য মাছচাষের সম্ভাব্য সকল সুযোগ কাজে লাগানো প্রয়োজন এবং বর্তমানে প্রচেষ্টা সেভাবেই চলছে। এরই ধারাবাহিকতায় সর্বশেষ উল্লেখযোগ্য সংযোজন খাঁচায় মাছচাষ। বাংলাদেশে এই পদ্ধতিতে মাছের চাষ তুলনামূলকভাবে নতুন হলেও এর ইতিহাস অনেক পুরাতন। এর সূচনা হয় চীনের ইয়াংঝি নদীতে প্রায় ৭৫০ বছর আগে। প্রযুক্তিগত উন্নতির কারণে এটি এশিয়ার বিভিন্ন দেশে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। বাংলাদেশে নতুন হলেও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কিছু দেশে এটি অনেক আগে থেকেই ব্যাপকভাবে জনপ্রিয়।

১৯৮০ সালে মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন ও বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক যৌথ উদ্যোগে কাপ্তাই লেকে সর্বপ্রথম খাঁচায় মাছচাষ প্রকল্প হাতে নেয়। তবে বিভিন্ন কারণে প্রকল্পের কার্যক্রম আশানুরূপ ফল লাভে ব্যর্থ হয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কারণসমূহ হলো: (১) টেকসই মানসম্পন্ন জালের অভাব, (২) খাঁচায় ব্যবহার উপযোগী ভাসমান খাদ্যের অভাব, (৩) সঠিক সময়ে গুণগত মানসম্পন্ন পোনার অভাব, (৪) খাঁচায় চাষ উপযোগী মৎস্য প্রজাতিসমূহ চিহ্নিত না হওয়া এবং (৫) প্রয়োজনীয় কারিগরি নির্দেশনার অভাব। অথচ একই সময়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ বিশেষ করে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশ খাঁচায় মাছ চাষে অভাবিত সাফল্য অর্জন করে। বাংলাদেশে উল্লেখযোগ্য সফলতা আসে ২০০২ সাল থেকে শুরু হওয়া চাঁদপুরের ডাকাতিয়া নদী ও লক্ষ্মীপুর জেলার মেঘনা নদীর রহমতখালী চ্যানেলে, যথাক্রমে সাড়ে চারশত এবং পাঁচশত খাঁচায় মনোসেক্স তেলাপিয়া চাষের মাধ্যমে। বর্তমানে ক্রমশ: তা ছড়িয়ে পড়ছে দেশের আরও কিছু এলাকায়।

খাঁচায় মাছচাষের সুবিধা

- খাঁচায় মাছচাষের মাধ্যমে অব্যবহৃত/অপ্রচলিত জলাশয়ের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত হয়;
- আর্থিকভাবে সুবিধাবঞ্চিত নদী তীরবর্তী, হাওর, বাঁওড়, বিল এলাকার জনগণের অংশগ্রহণে খাঁচায় মাছ চাষের মাধ্যমে জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন সম্ভব;
- পুকুরের চেয়ে খাঁচায় অধিক ঘনত্বে মাছ চাষ করে বেশি মুনাফা অর্জন করা যায়;
- মাছের খাদ্য ও পানি ব্যবস্থাপনা এবং মাছের পরিচর্যা সহজে করা যায়;
- প্রাকৃতিক সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করা সম্ভব;
- খাঁচায় মাছচাষে মাছ আহরণে তেমন কোন খরচ হয় না এবং বাজার দর বুঝে যে কোন সময় ইচ্ছেমত মাছ ধরা যায়; এবং
- নদীতে মাছ ধরার চাপ কমাতে মৎস্যজীবীদের বিকল্প কর্মসংস্থানের উপযুক্ত মাধ্যম হতে পারে খাঁচায় মাছচাষ।

খাঁচার প্রকারভেদ: দেশে-বিদেশে মাছচাষে যে সব খাঁচা ব্যবহৃত হয় তা মূলত চার প্রকারের:

১. স্থির খাঁচা (fixed cages)২. ভাসমান খাঁচা ৩. নিমজ্জিত খাঁচা ৪. নিমজ্জনযোগ্য খাঁচা (Submersible cages)

তবে বাংলাদেশে স্থির খাঁচা বা ভাসমান খাঁচাই ব্যবহৃত হচ্ছে।

মজুদপূর্ব ব্যবস্থাপনা

জলাশয় ও স্থান নির্বাচন:

নিম্মোক্ত বিষয়াদি বিবেচনা করে জলাশয় ও স্থান নির্বাচন করতে হবে :

- খাঁচা স্থাপনের জন্য জলাশয় হিসেবে অপেক্ষাকৃত কম স্রোতের ছোট নদী বা বড় নদীর অংশবিশেষ যেখানে একমুখী প্রবাহ কিংবা জোয়ার ভাটার প্রবাহ বিদ্যমান, বড় ও প্রশস্ত খাল, সেচ প্রকল্পের খাল, প্লাবনভূমির গভীর পানির এলাকা, গভীর বিল ও বাঁওড়কে জলাশয় হিসেবে নির্বাচন করা যেতে পারে।
- মূল খাঁচাটি এমন জায়গায় স্থাপন করতে হবে যেখানে সারা বছর ১০-১২ ফুট পানি থাকে। খাঁচার তলদেশ নিচের কাঁদা থেকে ন্যূনতম ৩ ফুট ব্যবধান থাকা আবশ্যক। পরিষ্কার পানির জলাশয় খাঁচা স্থাপনের স্থান হিসেবে নির্বাচন করা উত্তম।
- খাঁচা স্থাপনের কারণে যাতে কোনভাবেই নৌ চলাচলে বিঘ্ন না ঘটে এমন স্থান হতে হবে।
- সর্বোপরি খাঁচা স্থাপনের জায়গাটি এমন হতে হবে যাতে শিল্প বা কলকারখানার বর্জ্য কিংবা পয়:নিষ্কাশনের পানি অথবা কৃষিজমি থেকে বন্যা বা বৃষ্টি বিধৌত কীটনাশক প্রভাবিত পানি নদীতে পতিত হয়ে অপ্রত্যাশিতভাবে খাঁচার মাছ মেরে ফেলতে না পারে।

খাঁচা তৈরি

খাঁচা তৈরিতে নানাবিধ উপকরণের প্রয়োজন হয়। কোন ধরণের খাঁচা তৈরি হবে তার ওপর নির্ভর করে খাঁচার উপকরণের তারতম্য হতে পারে। সাধারণত খাঁচা তৈরিতে তিন ধরনের উপকরণ লাগে: ১. খাঁচার জাল তৈরির উপকরণ, ২. খাঁচার কাঠামো তৈরির উপকরণ এবং ৩. খাঁচা পরিচালনার জন্য উপকরণ।

১। খাঁচার জাল তৈরির উপকরণ

- পলিইথিলিন জাল (ঘের জাল): ৬ তার বিশিষ্ট, রাসেল নেট (খাদ্য আটকানোর বেড় তৈরীতে)
- মরক্কো কাছি (২৪ তার বিশিষ্ট), গ্রীন হেংস্ চিকন রশি (২৪ তার বিশিষ্ট)
- গ্রীন হেংস্ চিকন সুতা (মেরামতের জন্য), কভার নেট বা ঢাকনা জাল (পাখি, ইত্যাদির উপদ্রব থেকে রক্ষার জন্য)

২। ফ্রেম তৈরির উপকরণ

- ১" জি.আই. পাইপ (৭০ ফুট প্রতিটি খাঁচার জন্য)। জি.আই পাইপ এর পরিবর্তে বাঁশ দিয়েও খাঁচার ফ্রেম তৈরী করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে খাঁচার স্থায়িত্ব কম হবে।
- ঝালাই করার জন্য ওয়েলডিং রড ও ফ্লাটবার।
- ফ্রেম ভাসমান রাখার জন্য শূন্য ব্যারেল/ড্রাম (২০০ লিটারের পি.ভি.সি. ড্রাম, ওজন ৯ কেজির উর্ধ্বে)।
- খাঁচা স্থির রাখার জন্য গেরাপি (Anchor).
- গেরাপি বাঁধতে মোটা কাছি (১২ নং গ্রীন হেংস্)।
- ফ্রেমের সাথে বাঁধার জন্য মাঝারী আকারের সোজা বাঁশ (প্রয়োজনীয় সংখ্যক)।

৩। খাঁচা ব্যবস্থাপনার জন্য উপকরণ

- খাদ্য ও অন্যান্য দ্রব্য রাখার জন্য ছোট টিনশেড ঘর ও খাদ্য প্রদান নিয়মিত পরিচর্যার জন্য নৌকা।
- মাছ বাছাই (Sorting) ও স্থানান্তরের জন্য সুবিধাজনক পাত্র (বড় পাতিল কিংবা কাটা ড্রাম)।
- খাদ্য প্রদানের জন্য সুবিধাজনক পাত্র ও খাঁচা পরিষ্কার করার জন্য ব্রাশ।
- মাছের রোগ নিরাময়ের জন্য প্রয়োজনীয় রাসায়নিক দ্রব্য (ফরমালিন, কপার সালফেট, ইত্যাদি) ও ঔষধ।
- মাছ আহরণের জন্য হাতল বিশিষ্ট থলে জাল ও মাছ পরিবহনের জন্য বাঁশের ঝুড়ি/খাড়ি/প্লাষ্টিকের ঝুড়ি।
- মাছ মাপার জন্য ছোট বড় বিভিন্ন আকারের ব্যালেন্স/দাঁড়িপাল্লা।

পুকুরের জন্য ১ ঘনমিটার আকারের খাঁচাই উপযোগী।

নদীর ক্ষেত্রে যেহেতু নদীর পাড় বরাবর খাঁচা স্থাপন করাটাই নিরাপদ ও ঝুঁকিমুক্ত এবং নদীর অভ্যন্তরের দিকে ঝুঁকি বেশি এবং নৌ চলাচলে প্রতিবন্ধক হতে পারে কাজেই খাঁচার আকার খুব বেশি বড় করার সুযোগ থাকে না। ডাকাতিয়া নদীতে খাঁচাগুলো ২০ফুট × ১০ফুট ফ্রেম তৈরী করে ড্রামের সাহায্যে ভাসমান রাখা হয় এবং একটি খাঁচার সাথে অন্যটি পাশাপাশি সংযুক্ত করা হয়।

হাওর-বাঁওড় ও বড় দীঘি-লেক ইত্যাদি যেহেতু বিস্তৃত জলাশয় এবং এগুলোতে বড় নৌযান চলাচলে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির কোন আশংকা থাকে না কাজেই এ সকল জলাশয়ে বড় আকারের খাঁচা স্থাপন করা সম্ভব। পৃথিবীর অনেক দেশেই সমুদ্রে বিশাল পুকুরের অবয়বে খাঁচার অত্যন্ত মজবুত কাঠামো তৈরী করে খাঁচায় মাছচাষ করা হয়। তেমনি ভাবে আমাদের এ সকল জলাশগুলোতে অনেক বড় আকারের খাঁচা স্থাপন করা সমীচীন।

খাঁচার ফ্রেম তৈরি

ফ্রেমের কাঠামো নির্ভর করবে কোন পরিবেশে খাঁচা স্থাপন করা হবে তার ওপর। পুকুরের পরিবেশে যেখানে পানির কোন স্রোত বা প্রবাহ নেই সেখানে পিভিসি পাইপ, বাঁশ, ইত্যাদি দিয়ে ফ্রেম তৈরি করলেও চলবে। কিন্তু যেখানে স্রোত বা বিভিন্ন মাত্রার প্রবাহ বিদ্যমান সেখানে খাঁচার ফ্রেম অবশ্যই মজবুত ও শক্ত হওয়া প্রয়োজন। সাধারণত খাঁচার ফ্রেম তৈরি করতে প্রথমে ১ ইঞ্চি জি আই পাইপ দ্বারা ২০ ফুট × ১০ ফুট ফ্রেম তৈরি করা হয়। একটি ফ্রেম তৈরিতে ৭০ ফুট পাইপ ব্যবহৃত হয়।

আর মাঝে ১০ ফুট আরেকটি পাইপ বসিয়ে ঝালাই করে ফ্রেম তৈরি করা হয়। এতে সরাসরি ২০ ফুট × ১০ ফুট আকারের খাঁচা বসানো যায় আবার প্রয়োজনবোধে ১০ ফুট × ১০ ফুট খাঁচাও বসানো যাবে। এভাবে ফ্রেমগুলো তৈরি করে একটির সাথে অন্যটি সংযুক্ত করে খাঁচার আকারে সাজিয়ে ইউনিট তৈরি করা হয়। একটি ফ্রেমের সাথে অন্যটি সাজানোর জন্য এবং সেগুলো পানিতে ভাসমান রাখার জন্য দুইটি ফ্রেমের মাঝে ৩টি ড্রাম বসানো হয়। দুই ফ্রেমের মাঝে ড্রাম দিয়ে ফ্রেম দুটোকে ১৭-১৮ ফুট দৈর্ঘ্যের রড দিয়ে (দুই মাথায় ক্লাম্প তৈরি করে) সংযুক্ত করা হয়। আবার ড্রামের উপরে বসানোর মতো ৩ সুতা রডের ফ্রেম তৈরী করেও রডের ফ্রেমের সাথে জিআই পাইপের মূল খাঁচার ফ্রেম বেধে দেয়া যাবে।

নদীতে খাঁচা স্থাপন

খাঁচা স্থাপনের যাবতীয় উপকরণ সংগ্রহ করে নদীর পাড়ে যেখানে খাঁচা স্থাপন করা হবে সেখানে নিতে হবে। জিআই পাইপের ফ্রেমগুলো আগেই নিকটবর্তী কোন ওয়ার্কশপ থেকে ঝালাই করে ফ্রেম তৈরি করে খাঁচা স্থাপনের এলাকায় আনতে হবে। একসাথে জায়গার উপযোগিতা মোতাবেক ১০-১২টি ফ্রেম পাশাপাশি রেখে প্রতি দুটি খাঁচার মাঝে তিনটি করে ড্রাম বসিয়ে সংযোগকারী লোহার ফ্রেম দ্বারা আটকাতে হবে। ড্রামগুলো যাতে নীচ দিয়ে সরে না যায় সেজন্য দুই ফ্রেমের পাইপের সাথে ভালোভাবে নাইলনের দড়ি দিয়ে বেঁধে দিতে হবে। এরপর সম্পূর্ণ ফ্রেমের দৃঢ়তার জন্য চারদিকে জিআই পাইপের সাথে এবং মাঝের জিআই পাইপের সাথে প্রয়োজনীয় সংখ্যক সোজা বাঁশ বেঁধে দিতে হবে। এরপর সতর্কতার সাথে সম্পূর্ণ খাঁচার ফ্রেমকে পানিতে ভাসাতে হবে। এভাবে সমস্ত খাঁচা পানির উপরে তথা ডাঙ্গাতে বেঁধে পরে পানিতে ভাসাতে হবে। প্রত্যাশিত গভীরতায় খাঁচা ভাসানো হলে এর দুদিকে দুইটি এবং খাঁচা ইউনিটের দৈর্ঘ্য বিবেচনায় প্রয়োজনীয় সংখ্যক গেরাপী বা নোঙ্গর মোটা গ্রীন হেংস কাছি (১২ নং) দিয়ে বেঁধে উপযোগী দূরত্বে নদীতে স্থাপন করতে হবে। এরপর ধীরে ধীরে খাঁচার জাল ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করে প্রয়োজনীয় সংস্কার করে খাঁচাগুলো ফ্রেমের সাথে বাঁধতে হবে। খাঁচায় মাছ মজুদের কমপক্ষে ১৫ দিন পূর্বে জালগুলো সেট করে ফেলতে হবে। এতে জালের গায়ে সামান্য শ্যাওলা পড়বে। ফলে মাছ মজুদের পর নুতন জালের ঘর্ষণজনিত আঘাত থেকে মাছ রক্ষা পাবে।

পুকুরে খাঁচা স্থাপন

জলাশয়ে পোঁতা বাঁশের সাথে বেঁধে সাধারণত ভাসমান খাঁচার অবস্থান রক্ষা করা যায়। ভাসমান খাঁচা পানির উপরিস্তর উঠানামার সাথে সাথে উঠানামা করতে পারে। কেননা খাঁচাটি জলাশয়ে এমনভাবে পোঁতা বাঁশের সাথে দড়ি দিয়ে বেঁধে দেয়া হয় যাতে পানির ওঠা-নামার সাথে খাঁচাটিও ওঠানামা করতে কোন অসুবিধা না হয়। অনেক সময় দুই পাশে দুটি বাঁশ পুঁতে মাঝখানে একটি বাঁশ বেঁধে ঐ বাঁশের সাথে দড়ি বেঁধেও খাঁচা স্থাপন করা যায়। খাঁচার দুই-তৃতীয়াংশ অথবা তিন-চতুর্থাংশ পানিতে নিমজ্জিত অবস্থায় থাকে।

খাঁচা স্থাপনে বিবেচ্য বিষয়

- জলাশয়ে খাঁচার অবস্থান (গভীরতা, জলাশয়ের স্থান), খাঁচা স্থাপন পদ্ধতি (একক/সারিবদ্ধ);

- খাঁচা হতে খাঁচার দুরত্ব (কমপক্ষে ১ মিটার), খাঁচা স্থাপনের সময় (পোনা মজুদের ১০-১৫ দিন পূর্বে);
- কাঁকড়ার নাগালের বাইরে রাখা (খুঁটির গোড়ায় ব্যবহৃত পানির বোতলের ফানেল অথবা পাটের দড়ি পেঁচিয়ে দিয়ে);
- পানির উপরে খাঁচার উচ্চতা (৬-১২ ইঞ্চি), ফ্লোট বাঁধা (পানির ৯ ইঞ্চি নীচে)।

মজুদকালীন ব্যবস্থাপনা

খাঁচায় চাষ উপযোগী মৎস্য প্রজাতি

সাধারণভাবে খাঁচায় চাষের জন্য মৎস্য প্রজাতিগুলোর নিম্নবর্ণিত বৈশিষ্ট্যগুলো বিবেচনা করা হয়:

❖ স্বাভাবিক ব্যবস্থাপনায় বৃদ্ধি হার বেশি;	❖ স্থানীয় বাজারে চাহিদা ও মূল্য বেশি;
❖ সহজে পোনা পাওয়া যায়;	❖ বাণিজ্যিকভাবে প্রস্তুতকৃত আমিষ সমৃদ্ধ পিলেট খাদ্য প্রয়োগে চাষ করা যায়;
❖ রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশি;	❖ কম সময়ে বাজারজাতকরণের উপযোগী হয়;
❖ খাঁচার পরিবেশ ও পানির গুণাগুণ পরিবর্তনের ধকল সহ্য করতে পারে;	❖ সুস্বাদু, পুষ্টি সমৃদ্ধ এবং আকর্ষণীয় চেহারার;
❖ অধিক ঘনত্বে বসবাস উপযোগী;	❖ নদীর প্রবাহমান পানির খাঁচায় মাছের লাফানোর প্রবণতা কম হয়।

উল্লেখ্য, বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত মনোসেক্স তেলাপিয়ার খাঁচায় চাষ সর্বাধিক লাভজনক ও সুবিধাজনক বিবেচিত হয়েছে। সে কারণে খাঁচায় তেলাপিয়া মাছের চাষ আলোচিত হলো।

নার্সারি পুকুর থেকে পোনা পরিবহন ও খাঁচায় মজুদ:

খাঁচায় মাছ চাষের ক্ষেত্রে নার্সারি হতে পোনা পরিবহন ও খাঁচায় পোনা মজুদকরণ একটি অত্যাবশ্যকীয় ধাপ হিসাবে বিবেচনা করা হয়। পলিথিন ব্যাগে অথবা ড্রাম বা এলুমিনিয়ামের হাড়িতে পোনা পরিবহন করা যায়। পোনা পরিবহন ও মজুদকরণ ব্যবস্থাপনা সাধারণ চাষ ব্যস্থাপনার অনুরুপ যা পূর্বে আলোচিত হয়েছে। খাঁচায় তেলাপিয়ার পোনা পরিবহনের জন্য নার্সারি হতে পোনা সংগ্রহের পূর্বে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো বিশেষভাবে বিবেচনা করতে হবে:

মজুদ ঘনত্ব নির্ধারণ

খাঁচায়মাছ চাষের ক্ষেত্রে পোনার মজুদ ঘনত্ব নির্ধারণ খুবই গুরত্বপূর্ণ বিষয়। স্বল্প আয়তনে প্রত্যাশিত উৎপাদন পেতে হলে মজুদ ঘনত্ব যত বাড়ানো যায় ততই ভাল। তবে এ ঘনত্ব বাড়ানোর সাথে বেশ কিছু বিষয় জড়িত যা নিম্মে উল্লেখ করা হল:

১) পানির স্রোত

প্রবাহমান নিয়মিত জোয়ার ভাটা হয় এমন পানিতে অথবা স্রোতের পানিতে মাছের মজুদ ঘনত্ব বাড়িয়ে খাঁচায় মাছচাষে ভাল ফল পাওয়াা যায়। এভাবে স্রোতশীল নদীর পানিতে ২০ ফুট × ১০ ফুট × ৬ ফুট আকারের খাঁচায় ১০০০ টি মনোসেক্স তেলাপিয়া মজুদ করে চাষ করার মাধ্যমে প্রত্যাশিত উৎপাদন পাওয়া সম্ভব। এক্ষেত্রে ২৫ গ্রামের বেশি ওজনের (৪৫৫০ গ্রাম সবচেয়ে উপযোগী) মনোসেক্স তেলাপিয়া মজুদ করতে হবে। তবে স্রোতের মাত্রা যদি বেশি থাকে তবে একই আয়তনের খাঁচায় ১২০০টি পোনা মজুদ করা যেতে পারে।

২) জালের ফাঁসের আকার

খাঁচায় ব্যবহৃত জালের ধরনের ওপর মজুদ ঘনত্ব কম বেশি হয় এবং উৎপাদনও কমবেশি হয়। জালের ফাঁসের আকার বড় হলে ঐ খাঁচায় মজুদ ঘনত্ব বাড়ানো যেতে পারে। কারণ জালের ফাঁসের আকার (Mesh Size) বড় হলে পানির প্রবাহ বেশি হবে এবং অক্সিজেনের পরিমাণও বেড়ে যাবে। অন্য

দিকে জালের ফাঁসের আকার ছোট হলে স্রোতের প্রবাহ কম হয়, ফলে অক্সিজেন সঞ্চালন কম হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে পোনা মজুদ ঘনত্ব খুব বেশি বাড়ানো সম্ভব নয়। খাঁচায় জালের ফাঁসের আকার ০.৭৫ ইঞ্চি হিসাবে ব্যবহার করার ক্ষেত্রে প্রতি ঘনমিটারে ৩৩টি পোনা মজুদ করা যায়।

৩) পানির গভীরতা

খাঁচা স্থাপনে পানির গভীরতা একটি গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। খাঁচা স্থাপনের জন্য যে স্থান নির্বাচন করা হয়, সেখানে যদি খাড়ি অঞ্চল থাকে অথবা পানির গভীরতা বেশি হয় তবে মাছ চাষে সুবিধা হয় এবং মজুদ ঘনত্ব বাড়ানো সম্ভব হয়।

৪) উৎপাদিত মাছের আকার

খাঁচায় মাছ চাষের একটি সুবিধাজনক দিক হলো প্রত্যাশা অনুযায়ী যে কোনো আকারের মাছ উৎপাদন করা যায়। বাজারে কত ওজনের মাছের চাহিদা রয়েছে সেদিক বিবেচনায় রাখতে হবে এবং তার ওপর ভিত্তি করে মাছের মজুদ ঘনত্ব নির্ধারণ করে মাছ চাষ করতে হবে। যদি ১ ঘন মিটারে ৩৩টি মাছ মজুদ করা যায় তাহলে ৬ মাসে গড়ে ৫০০ গ্রাম ওজনের তেলাপিয়া পাওয়া যাবে। যদি ৩০০ গ্রাম ওজনের মনোসেক্স তেলাপিয়ার চাহিদা থাকে এবং ঐ পরিমান লাভ পাওয়ার টার্গেট থাকে তবে প্রতি ঘন মিটারে ৪০-৫০টি মাছ মজুদ করতে হবে।

৫) খাদ্যের গুণগতমান

খাঁচায় মাছ চাষের ক্ষেত্রে খাদ্যের গুণগতমান মাছের উৎপাদনে বিরাট ভূমিকা রাখে। খাঁচায় মাছচাষের জন্য সুষম সম্পুরক খাদ্য প্রয়োগ করা অত্যাবশ্যক। যদি খাদ্যের গুণগতমান ভাল হয় তাহলে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। এছাড়া খাদ্যের গুণগতমানের ওপর ভিত্তি করে মাছের মজুদ ঘনত্ব বাড়ানো বা কমানো যেতে পারে। যদি খাদ্যের গুণগতমান ভাল হয় তাহলে মাছের মজুদ ঘনত্ব বাড়ানো যাবে এবং মাছের উৎপাদনও বেড়ে যাবে।

এছাড়া বিনিয়োগের আর্থিক সংগতির ওপর মজুদ ঘনত্ব নির্ভর করে।

প্রবাহমান নদীতে (প্রতি ২০০ বর্গ ফুট আকারের খাঁচায় মজুদ সংখ্যা)	হাওর/বাঁওড়/বিল (প্রতি ২০০ বর্গ ফুট আকারের খাঁচায় মজুদ সংখ্যা)	পুকুর/দিঘী (প্রতি ২০০ বর্গ ফুট আকারের খাঁচায় মজুদ সংখ্যা)
১০০০	৬০০-৭০০	৮০-১০০

খাদ্য প্রয়োগ ও ব্যবস্থাপনা

লাভজনকভাবে খাঁচায় মাছচাষের জন্য খাদ্য নির্বাচন ও প্রয়োগ অন্যতম প্রধান বিবেচ্য বিষয়। খাঁচায় তেলাপিয়া চাষের ক্ষেত্রে সম্পূরক খাদ্যে শতকরা ২৮-৩০% আমিষ থাকা উত্তম। ফিড মিলে উৎপাদিত পিলেট এবং স্থানীয়ভাবে তৈরী খাদ্য উভয়ই খাঁচায় ব্যবহার করা যায়। অপচয় কমিয়ে অধিক উৎপাদনের লক্ষ্যে ভাসমান পিলেট জাতীয় খাদ্য বেশী উপযোগী। নার্সারি অবস্থায় মনোসেক্স তেলাপিয়া মাছের পোনার দেহ ওজনের ১৫% হিসেবে খাদ্য প্রয়োগ করতে হবে। চাষকালীন প্রথম দুই মাস ৮-১০% এবং শেষ দুই মাস ৫-৬% হিসেবে খাদ্য প্রয়োগ করতে হবে।

নমুনায়ন ও গ্রেডিং

নমুনায়ন

খাঁচায় মাছচাষের ক্ষেত্রে নমুনায়ন করা হয় মাছের দৈহিক বৃদ্ধি, স্বাস্থ্যগত অবস্থা, খাঁচার জাল, ইত্যাদি পর্যবেক্ষণের জন্য। এজন্য মাঝে মাঝে নির্ধারিত বিরতিতে প্রতিটি খাঁচার নীচে আড়াআড়িভাবে বাঁশ দিয়ে টেনে মাছগুলোকে খাঁচার একপার্শ্বে জড়ো করে মাছের সার্বিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা হয়। মাছের গড় ওজন বের করার জন্য জড়ো করা মাছের ১০% এর ওজন মেপে দেখতে হবে।

খাঁচার মাছ আহরণ ও বাজারজাতকরণ

আরহণযোগ্য মাছের আকার, ওজন, বাজার চাহিদা, চাষের মেয়াদ ও ব্যবস্থাপনার ধরন বিবেচনায় রেখে মাছ আহরণ ও বাজারজাতকরণের সিদ্ধান্ত নিতে হবে। খাঁচার সব মাছ একত্রে বাজারজাতের উপযোগী আকার হয় না। তাই বড় মাছগুলো বাছাই করে বাজারে প্রেরণের জন্য পৃথক এক বা একাধিক

খাঁচায় রাখতে হবে। এতে একদিকে যেমন একই আকারের মাছ গ্রেড করার কারণে উপযুক্ত মূল্য পাওয়া যায়, অন্যদিকে ধীরে ধীরে ছোট মাছগুলো বড় হওয়ার জন্য অতিরিক্ত স্থান ও সময় পাবে। মাছ বাজারে প্রেরণের সময় যদি মাছের পেটে খাদ্য ভর্তি থাকে তবে তা মাছের গুণগতমান নষ্ট হওয়াকে তরান্বিত করে। এজন্য মাছ বাজারে প্রেরণের আগের দিন ঐ খাঁচায় দুপুরের পর খাদ্য প্রদান বন্ধ রাখতে হবে। এতে বাজারজাতের জন্য প্রেরিত মাছের গুণগতমান অধিক সময় অক্ষুন্ন থাকবে।

নিয়মিত পরিচর্যা

খাঁচায় মাছচাষের উৎপাদন অনেকাংশে নির্ভর করে নিয়মিত খাঁচা ব্যবস্থাপনার উপর। সঠিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে খাঁচায় মাছের উৎপাদন বহুলাংশে বৃদ্ধি করা সম্ভব।

১. **নিয়মিত খাবার প্রয়োগ:** নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রত্যাশিত উৎপাদন প্রাপ্তির লক্ষ্যে নিয়মিতভাবে পরিমিত মাত্রায় প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান সমৃদ্ধ গুণগত মানসম্পন্ন দানাদার ভাসমান খাবার প্রয়োগ করতে হবে।

২. **আচরণ পর্যবেক্ষণ:** মাছের আচরণের যে কোন পরিবর্তন সম্পর্কে সচেতন থাকা। মাছ যদি অস্বাভাবিকভাবে ভেসে বেড়ায় কিংবা যথেষ্ট খাদ্য গ্রহণ না করে অথবা অন্য যে কোন সমস্যা দেখা দিলে সে ব্যাপারে দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৩. **জাল পর্যবেক্ষণ:** জালে ছিদ্র আছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করা (সকাল বেলা খাওয়ানোর পূর্বে জাল পরীক্ষা করার উত্তম সময়)। জালে ছিদ্র থাকলে বা কোন কারণে ছিঁড়ে গেলে তা মেরামত কিংবা নতুন খাঁচা স্থাপনের পদক্ষেপ নিতে হবে।

৪. **মৃত মাছ অপসারণ:** খাঁচার ভিতরে যদি কোন মাছ মারা যায় তবে দ্রুত সরিয়ে ফেলতে হবে যাতে করে পরিবেশ দূষণ না হয়।

৫. **ক্ষতিকর প্রাণীর আক্রমণ:** ক্ষতিকর প্রাণী যেমন: কাঁকড়া, গুইসাপ, সাপ, ইত্যাদি থেকে খাঁচাকে রক্ষা করা।

৬. **উচ্ছিষ্ট খাদ্য:** সরবরাহকৃত খাবার অনেক সময় সম্পূর্ণ রুপে না খেলে তা জমা হয়ে খাঁচার স্বাভাবিক পরিবেশ দূষিত হয়ে যেতে পারে। এজন্য উচ্ছিষ্ট বা অতিরিক্ত খাবার দ্রুত সরিয়ে ফেলতে হবে।

৭. **জলাশয়ে খাঁচার অবস্থান পর্যবেক্ষণ:** জোয়ার ভাটার সময় পানির উঠানামার সাথে সাথে খাঁচার ভারসাম্য রক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

৮. **খাঁচার জালের ফাঁস বন্ধ হয়ে যাওয়া:** শ্যাওলা দ্বারা জালের ফাঁস বা মেস বন্ধ হয়ে পানির প্রবাহ কমে যায়। লম্বা হাতলযুক্ত নরম ব্রাশের সাহায্যে জালের শ্যাওলা পরিষ্কার করতে হবে। আবার মাছকে ২/১ দিন খাদ্য প্রয়োগ বন্ধ রাখলে মাছ এই শ্যাওলা খেয়ে জাল পরিস্কার করে ফেলে।

৯. **খাঁচার অভ্যন্তরে বা দুই খাঁচার মাঝে আবদ্ধ আবর্জনা:** খাঁচার মধ্যে অনেক সময় ছোট ছোট কচুরীপানা ও অন্যান্য আবর্জনা ঢুকে যায়। এগুলো পরিস্কার করে ফেলতে হবে।

১০. **নৌ-চলাচল:** নৌ-চলাচলের সময় খাঁচার অবস্থান যাতে দূর থেকে বুঝতে পারে সেজন্য খাঁচা সংলগ্ন স্থানে আলোর ব্যবস্থা করে বা লাল পতাকা ব্যবহার করে খাঁচার অবস্থান চিহ্নিত করা।

১১. **নদীর অস্বাভাবিক স্রোত:** বেশি স্রোত অনেক সময় খাঁচার কাঠামো ভেঙ্গে ফেলতে পারে কিংবা ক্ষতি সাধন করতে পারে। সেজন্য বেশি স্রোতশীল স্থানে খাঁচা স্থাপন করা হলে স্রোতের বিপরীতে বাঁকানো বেড়া দিয়ে স্রোতের আঘাত হতে খাঁচাকে রক্ষা করতে হবে।

১২. **প্রাকৃতিক বিপর্যয়:** বিভিন্ন প্রতিকূল আবহাওয়া যেমন ঝড়, জলোচ্ছাস, ইত্যাদি থেকে খাঁচাকে রক্ষার জন্য পূর্ব সতর্কতা হিসাবে খাঁচা ওঠা-নামা রশি ঢিলা, শক্ত নোঙ্গর, ইত্যাদি সতর্ক অবস্থা বজায় রাখতে হবে।

১৩. **পাখির উপদ্রব:** খাঁচার উপর ঢাকনা জাল দেয়া যাতে বক, পানকৌড়ি, ইত্যাদি পাখি খাবারের জন্য এসে মাছকে ঠুকরিয়ে আঘাত করতে না পারে।

১৪. **ড্রাম ভাসমান রাখা:** ড্রাম ছিদ্র হয়ে গেলে ড্রাম ডুবে গিয়ে জাল ডুবে মাছ বেরিয়ে যেতে পারে। ঝালাই দেয়ার সুবিধা থাকলে ঝালাই দিয়ে পুনরায় ড্রাম স্থাপন করতে হবে।

১৫. **পানির গুণগতমান পর্যবেক্ষণ:** পুকুরে স্থাপিত খাঁচার ক্ষেত্রে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যে পুকুরের পানি যাতে অত্যধিক সবুজ না হয়, বাঁশে শ্যাওলা জমে যেন পচে না যায়।

খাঁচায় মাছচাষের আয়-ব্যয়, মুনাফা হিসাব ও রেকর্ড সংরক্ষণ

১০ টি খাঁচার ১টি ইউনিট স্থাপনের সম্ভাব্য খরচ

ক্র.নং	উপকরণের নাম	পরিমাণ/ সংখ্যা	একক মূল্য (টাকা)	মোট মূল্য (টাকা)
১	রেডিমেড জাল	১০ টি	৩৫০০.০০	৩৫,০০০.০০
২	ড্রাম/ব্যারেল	২২ টি	১৫০০.০০	৩৩,০০০.০০
৩	১ ইঞ্চি জিআই পাইপ	৭৫০ ফুট	৮৫.০০	৬৩,৭৫০.০০
৪	ফ্রেমের সংযোগ লৌহ	৬৬ টি	১০০.০০	৬,৬০০.০০
৫	গেরাপী	৩টি (২০ কেজি প্রতিটি)	২৫০০.০০	৭,৫০০.০০
৬	গেরাপী বাঁধার কাছি	১ কয়েল	১০০০.০০	১,০০০.০০
৭	বাঁশ	২০ টি	৫০০.০০	১০,০০০.০০
৮	নাইলনের সুতা ও রশি	থোক	-	৫,৫০০.০০
৯	শ্রমিক মজুরী	থোক	-	৫,০০০.০০
১০	অন্যান্য	থোক	-	৪,৬৫০.০০
	১০ টি খাঁচা স্থাপনে মোট খরচ			১,৭২,০০০.০০

১০ টি খাঁচার এক ফসলের (৬ মাস) উৎপাদন খরচ

ক্র.নং	উপকরণের নাম	পরিমাণ/ সংখ্যা	একক মূল্য (টাকা)	মোট মূল্য (টাকা)
১	মাছের পোনা সংগ্রহ (প্রতিটি গড়ে ৩০ গ্রাম)	৮০০০টি	৪.০০	৩২,০০০.০০
২	মাছের খাদ্য	৪০০০ কেজি	৫৫.০০	২,২০,০০০.০০
৩	শ্রমিক মজুরী	১ জন (৬ শ্রম মাস)	৬,০০০.০০	৩৬,০০০.০০
৪	অন্যান্য (স্থাপনা ব্যয়সহ)			১০,০০০.০০
			মোট :	২,৯৮,০০০.০০

প্রতিটি খাঁচায় একটি ফসলে উৎপাদন = ৪০০ কেজি

১০ টি খাঁচায় ৪০০ x ১০ = ৪০০০ কেজি

প্রতি কেজি মাছের পাইকারী বাজারমূল্য = ১১০ টাকা

মোট মাছ বিক্রয় = ৪,৪০,০০০.০০ টাকা

নীট লাভ = (৪,৪০,০০০-২,৯৮,০০০) = ১৪২,০০০ টাকা (বছরে ২ ফসল হিসাবে ১০ খাঁচায় নীট লাভ ২,৮৪,০০০ টাকা)

*গড়ে প্রতিটি খাঁচার আয়ুষ্কাল ৯ বছর ধরে ফসল প্রতি স্থাপনা ব্যয় ধরা হয়েছে।

মাছের নার্সারি ব্যবস্থাপনা

লাভজনকভাবে মাছ চাষের জন্য ভাল জাতের এবং বড় আকারের মানসম্পন্ন পোনা পাওয়া খুবই প্রয়োজন। সময়মত কাঙ্ক্ষিত আকারের পোনা না পাওয়ার জন্য অনেক মৎস্যচাষি ঈপ্সিত উৎপাদন লাভে সমর্থ হয় না। ফলে দেশে সামগ্রিক মৎস্য উৎপাদন ব্যাহত হয়। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের একমাত্র উপায় হলো উন্নত নার্সারি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সঠিক সময়ে ভাল জাতের মানসম্পন্ন পোনা উৎপাদন। প্রধান প্রধান মাছের পেনা উৎপাদন কৌশল এ অংশে আলোচনা করা হলো।

রুই জাতীয় মাছের নার্সারি ব্যবস্থাপনা

স্থান নির্বাচন

মাছের পোনা উৎপাদনের জন্য পুকুরের স্থান নির্বাচনের ক্ষেত্রে মাটির বৈশিষ্ট্য সাধারণ মাছ চাষের পুকুরের মতই। এছাড়া আরো যে সব বিষয় গুরুত্ব দিতে হবে তা হলো পুকুর খননের এলাকা হবে বন্যামুক্ত ও উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা থাকতে হবে।

রুই জাতীয় মাছের নার্সারি ব্যবস্থাপনায় সাধারণত দুই ধরণের পুকুর ব্যবহার করা হয়।

ক. নার্সারি বা আঁতুড় পুকুর

যে পুকুরে রেণু ছেড়ে ধানী পর্যন্ত বড় করা হয়, তাকে নার্সারি বা আঁতুড় পুকুর বলে। এ ধরনের পুকুর সাধারণত ছোট থেকে মাঝারি আকারের হয়ে থাকে। পুকুরের গভীরতাও থাকে তুলনামূলকভাবে কম। কাজেই যে সমস্ত ছোট, মাঝারি ও অগভীর পুকুরে রেণু পোনা ছেড়ে ধানী পোনার আকার পর্যন্ত বড় করা হয়, সেগুলো আঁতুড় পুকুর নামে অভিহিত। এ পুকুরের আয়তন সাধারণত ১০-২৫ শতাংশ এবং পানির গভীরতা ৩-৪ ফুট হয়ে থাকে। তবে প্রজাতিভেদে আয়তন ও গভীরতার তারতম্য ঘটে থাকে। থাই সরপুঁটি মাছে রেণুর ক্ষেত্রে পানির গভীরতা ২-৩ ফুট হলেই ভাল হয়।

খ. লালন বা চারা পুকুর

যে পুকুরে ধানী পোনা ছেড়ে চারা পোনা (৫-১০সেমি) পর্যন্ত বড় করা হয়, তাকে লালন বা চারা পুকুর বলে। বিভিন্ন ধরনের অগভীর বাৎসরিক পুকুর বা চাষাবাদ মৌসুমে পানির ব্যবস্থা থাকে, এমন ধরনের পুকুরে মাছের পোনা উৎপাদন করা যায়। নার্সারি পুকুর এবং লালন পুকুরের বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ:

- পুকুরের পাড় উঁচু, মজবুত ও বন্যামুক্ত;
- পুকুরে পযাপ্ত সূর্যের আলো এবং বাতাস লাগার ব্যবস্থা থাকতে হবে;
- নার্সারি পুকুরের আয়তন হবে ১০-৫০ শতাংশ এবং পানির গড় গভীরতা হবে ১.০-১.৫ মিটার;
- লালন পুকুরের আয়তন হবে ২০-১০০ শতাংশ এবং পানির গড় গভীরতা ১.৫-২.০ মিটার হলে ভাল হয়;
- উভয় প্রকার পুকুর হবে আয়তাকার যাতে ব্যবস্থাপনায় সুবিধা হয়;
- পুকুরের তলায় ১০-১৫ সেমি-এর বেশি কাদা থাকবে না।

তবে একই পুকুরে একধাপ পদ্ধতিতেও রুই জাতীয় মাছের পোনা উৎপাদন করা হয়।

ব্যবস্থাপনা:

১. জলজ আগাছা নিয়ন্ত্রণ, ২. রাক্ষুসে ও অবাঞ্ছিত মাছ দূরীকরণ, ৩. পুকুর মেরামত ও চাষ দেয়া, ৪. চুন প্রয়োগ বিষয়ে সাধারণ মাছচাষ অংশে অলোচিত হয়েছে।

৫. পুকুরে পানি ভরাটকরণ: পুকুর শুকানো হলে চুন প্রয়োগের ২-৩ দিন পর পুকুরে পানি সরবরাহ করতে হবে। পানি সরবরাহ কালে যেন কোনো রাক্ষুসে এবং অবাঞ্ছিত মাছ ঢুকতে না পারে।

৬. পোনা প্রাপ্তি নির্ধারণ: পুকুরে সার প্রয়োগের ৩-৮ দিনের মধ্যে ফাইটোপ্লাংকটন, ৫-১০ দিনের মধ্যে রটিফার, ৮-১৪ দিনের মধ্যে ক্লাডোসেরা এবং ১২-২০ দিনের মধ্যে কপিপডের উৎপাদন সর্বোচ্চ সীমায় থাকে। রেণুর জন্য যেহেতু রটিফার জাতীয় খাদ্য দরকার। তাই রেণু প্রাপ্তির সম্ভাব্য তারিখ জেনে পুকুরে সার প্রয়োগ করলে পোনার উৎপাদন সবচেয়ে ভালো পাওয়া যাবে।

৭. সার প্রয়োগ: পুকুরের নিজস্ব উৎপাদনশীলতার ওপর সার প্রয়োগের মাত্রা পুকুর থেকে পুকুরে ভিন্ন হয়। পুকুর প্রস্তুতকালীন সার ব্যবহারের মাত্রা নিম্নরূপ:

ইউরিয়া	●	১০০-১৫০ গ্রাম/শতাংশ
টিএসপি	●	৫০-৭৫ গ্রাম/শতাংশ

পুকুরে পানির গুণাগুণের ওপর ভিত্তি করে সার প্রয়োগের মাত্রা কম-বেশি হতে পারে। সার হিসেবে খৈলও ব্যবহার করা যেতে পারে। শতাংশ প্রতি ০.৫ কেজি খৈল পুকুরে রটিফার (এক ধরণের প্রাণিকণা) উৎপাদনে সহায়ক।

৮. পানিতে প্রাকৃতিক খাদ্য পর্যবেক্ষণ

রেণু/ধানী মজুদের আগেই পুকুরে প্রাকৃতিক খাদ্য তৈরি হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করতে হবে। রেণুর পুকুরে পানির রং থাকবে লালচে সবুজ বা বাদামি সবুজ। খালি চোখে দেখতে হবে পানির রং ঠিক আছে কিনা। ঠিক থাকলে পরিমিত খাবার আছে কিনা তা নিচের পরীক্ষার মাধ্যমে দেখতে হবে।

সেকিডিস্ক

এটি একটি লোহার চাকা যার ব্যাস ২০ সেমি এবং রং সাদা-কালো। এটি ৩টি রংয়ের ১টি সুতা দ্বারা ঝুলানো থাকে। থালার গোড়া থেকে প্রথম অংশের রং লাল (২ সেমি), দ্বিতীয় অংশের রং সবুজ (১০ সেমি) এবং হাতে ধরার সর্বশেষ অংশের রং সাদা।

পানির বিষাক্ততা পরীক্ষা

পুকুরে রেণু/পোনা ছাড়ার অন্তত একদিন আগে পুকুরের পানির বিষাক্ততা দূর হয়েছে কি না তা পরীক্ষা করতে হয়। কেননা পানিতে বিষক্রিয়া থাকলে রেণু/পোনা মারা যাবে।

বিষাক্ততা পরীক্ষা পদ্ধতি: পুকুরে হাপা স্থাপন করে কিছু পোনা ছেড়ে ২৪ ঘন্টা পর্যন্ত দেখা, পোনা মারা গেলে বুঝতে হবে পানিতে বিষ ক্রিয়া হয়েছে, এ অবস্থায় পুকুরে পোনা মজুদ উচিত নয়, কিছু দিন অপেক্ষা করার পর আবারও বিষাক্ততা পরীক্ষা করে পোনা ছাড়া, পুকুরের বিষাক্ততার মাত্রা বেশি হলে পানি কমিয়ে এনে বা বদলিয়ে বিশুদ্ধ উৎসের পানি সংযোজন।

জলজ পোকা-মাকড় দমন

জলজ পোকা-মাকড় রেণু পোনার জন্য খুবই ক্ষতিকর। পুকুরের পানিতে এমনিতেই বিভিন্ন ধরনের জলজ পোকা-মাকড় জন্ম নেয়। যেমন- হাঁস পোকা (back swimmer), ড্রাগনফাই, ওয়াটার স্ট্রোক, আংগুলি পোকা (cutter piller) গোবর পোকা (water-bug) বড় আকৃতির জুপ্লাংকটন যথা- ক্লাডোসেরা, কপিপোড, (cyclops, daphnia, diaptomas) ইত্যাদি। পুকুরে যখন সার প্রয়োগ করা হয় তখন প্রাকৃতিক খাদ্যের বৃদ্ধি ঘটে এবং এর সাথে সাথে রেণু পোনার জন্য ক্ষতিকর পোকা-মাকড় এর বৃদ্ধি ঘটে থাকে। এরা রেণু পোনা ধরে খেয়ে ফেলে অথবা পেট কেটে মেরে ফেলে। এ ছাড়াও পোকা-মাকড় রেণুর খাদ্য নষ্ট করে ফেলে। রেণু ছাড়ার পূর্বে নার্সারি পুকুর হতে এ সমস্ত জলজ পোকা-মাকড় ভালোভাবে দমন করতে হয়।

জলজ পোকা-মাকড় দমন পদ্ধতি

বিভিন্ন ধরনের কীটনাশক বা ডিজেল/কেরোসিন প্রয়োগ করে নার্সারি পুকুরের জলজ পোকা-মাকড় ভালোভাবে দমন করা যায়। নিচে বিভিন্ন ধরনের পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো:

- **সুমিথিয়ন:** ২-৩ মিলি/শতাংশ/ফুট পানির গভীরতা;
- **নোভান/নগস:** ২-৩ মিলি/শতাংশ/ফুট পানির গভীরতা।

কীটনাশক ব্যবহার পদ্ধতি

প্রয়োজনীয় কীটনাশক একটি পাত্রের মধ্যে ১০ লি. পরিমাণ পানিতে গুলে সমস্ত পুকুরে সমানভাবে ছিটিয়ে দিতে হবে। ডিপটারেক্স প্রয়োগের পর জলজ পোকা-মাকড় মারা যাওয়া শুরু করলে সমস্ত পোকা-মাকড় চটজাল দ্বারা তুলে ফেলতে হবে। দুপুরে রোদে ব্যবহার করলে ভাল ফলাফল পাওয়া যায়। কম তাপমাত্রা, মেঘ, কিংব বৃষ্টির সময় কীটনাশক ব্যবহার না করাই উচিত।

কীটনাশক ব্যবহারের সতর্কতা

- কীটনাশক ব্যবহারের সময় ব্যবহারকারীকে মুখ, শরীর কাপড়ে ঢেকে নিয়ে চশমা পরে নিতে হবে;
- বাতাসের অনুকূলে ছিটাতে হবে;
- ব্যবহারের পর সাবান দিয়ে ভাল করে গোসল করে নিতে হবে এবং সকল প্রকার কীটনাশক শিশুদের নাগালের বাইরে রাখতে হবে।

ডিজেল বা কেরোসিন

- প্রতি শতাংশ জলাশয়ে ১২৫ মিলি বা প্রতি ১০ শতাংশ জলাশয়ে ১ লি. প্রয়োগ করতে হবে (গড়ে পানির গভীরতা ৩ ফুট);
- পুকুরের পানি যখন ঢেউহীন অবস্থায় থাকবে তখন প্রয়োগ করতে হবে;
- পুকুরের পানিতে ঢেউ থাকলে চটজাল টেনে জালের মধ্যে প্রয়োগ করতে হবে। এ প্রক্রিয়া ২/৩ বার করলে ভাল হয়;
- সমস্ত মরা পোকা-মাকড় তুলে ফেলতে হবে।

জাল টেনে: ঘন নাইলনের জাল (ঘন পলিস্টার নেট) বার বার টেনেও ক্ষতিকারক পোকা-মাকড় সহনশীল মাত্রায় কমিয়ে আনা যায়।

উপরে বর্ণিত যে কোনো একটি পদ্ধতি রেণু ছাড়ায় ২৮ ঘন্টা পূর্বে অনুসরণ করতে হবে।

মজুদকালীন ব্যবস্থাপনা

রেণু পোনা দুই পদ্ধতিতে প্রতিপালন করা যায়। এ পদ্ধতি নির্ভও করে রেণু ছাড়ার পরিমাণের ওপর। এর পরিমাণ আবার নির্ভর করে রেণুর জাত, পুকুরের আয়তন ও তার উৎপাদনশীলতার ওপর। ছোট ও মাঝারি পুকুর অধিকতর উৎপাদনশীল বলে বিবেচিত। চাষির অভিজ্ঞতাও এক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়।

১. রেণু ছাড়ার পরিমাণ

এক ধাপ পদ্ধতি

একই পুকুরে ২-৩ মাস রেণু ৫-১০ সেমি আকার পর্যন্ত লালন করা হয়। এপদ্ধতিতে রুইজাতীয় মাছের যে কোনো প্রজাতির ৪-৫ দিন বয়সের রেণু প্রতি শতাংশে ৮-১০ গ্রাম ছাড়া যায়। সঠিক ব্যবস্থাপনায় রেণুর বাঁচার হার শতকরা ৫০-৬০%।

দুই ধাপ পদ্ধতি

এই পদ্ধতিতে প্রস্তুতকৃত নার্সারিতে ৪-৫ দিন বয়সের রেণু শতাংশ প্রতি ২৫-৩০ গ্রাম করে মজুদ করা যায়। প্রথমে অপেক্ষাকৃত ছোট পুকুরে রেণু ছেড়ে এবং ১০-১২ দিন পর ধানী পোনা লালন পুকরে স্থানান্তর করে ৬-৮ সপ্তাহ লালন করে ৭-১২ সেমি আকার চারা পোনা করা যায়। এ পদ্ধতি অধিক লাভজনক। সঠিক ব্যবস্থাপনায় ধানী পোনার বাঁচার হার শতকরা ৮০ ভাগ।

প্রজাতি অনুযায়ী গ্রাম প্রতি রেণুর সংখ্যা

প্রজাতি	রেণুর সংখ্যা/গ্রাম	প্রজাতি	রেণুর সংখ্যা/গ্রাম
কাতলা	৪০০ টি	গ্রাস কার্প	৩৫০টি
রুই	৪৭৫টি	মিরর কার্প	৪০০টি
মৃগেল	৪০০টি	বিগ হেড	৩০০টি
সিলভার কার্প	৩২৫টি		

রেণু ছাড়ার পরিমাণ

প্রজাতি	এক ধাপ পদ্ধতি	রেণুর সংখ্যা/গ্রাম
সিলভার কার্প	১০ গ্রাম/শতাংশ	৩৫ গ্রাম/শতাংশ
কাতলা	১০ গ্রাম/শতাংশ	৩০ গ্রাম/শতাংশ

রুই	৮ গ্রাম/শতাংশ	২৫ গ্রাম/শতাংশ
মৃগেল	১০ গ্রাম/শতাংশ	৩০ গ্রাম/শতাংশ
গ্রাস কার্প	৮ গ্রাম/শতাংশ	২৫ গ্রাম/শতাংশ
বিগ হেড	১০ গ্রাম/শতাংশ	৩৫ গ্রাম/শতাংশ

* একটি নার্সারি পুকুরে একই প্রজাতির রেণু চাষ করা ভাল।

ভাল রেণু শনাক্তকরণ

রেণু প্রাপ্তির উৎস দুইটি যথা: প্রাকৃতিক এবং হ্যাচারি। বাহ্যিক ও অনুকূল পরিবেশে মাছের প্রজনন ঘটে বিধায় প্রাকৃতিক উৎসের রেণুর মান ভালো থাকে। তবে অসুবিধা হলো প্রয়োজনীয় সময়ে পরিমাণমত ঈপ্সিত প্রজাতির রেণু না পাওয়া এবং এতে কাঙ্ক্ষিত ও অনাকাঙ্ক্ষিত রেণুর মিশ্রণ থেকে যায়। অন্যদিকে হ্যাচারির উৎপাদিত রেণু নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে উৎপাদিত হয়। ফলে পছন্দ ও চাহিদামত প্রজাতির রেণু সংগ্রহ করা যায়। কিন্তু ব্রুড মাছের গুণগত মান, পুষ্টি বজায় রাখা না হলে রেণুর গুণগত মান খারাপ হতে পারে।

ভাল রেণু চেনার উপায়

- চলাফেরায় সন্তরণশীল, দেহের রং কালচে-বাদামি/সবুজ;
- রেণুর পাত্রে হাত দিলে রেণু দ্রুত সরে যায় এবং স্রোতের বিপরীতে সাঁতরাতে সক্ষম।

পর্যবেক্ষণ বিষয়	ভাল রেণু	দুর্বল রেণু
দেহের রং	কালচে-বাদামি/সবুজ	ঘোলা, ফ্যাকাশে
আচরণ	চঞ্চল, দ্রুত সন্তরণশীল	অপেক্ষাকৃত ধীর, দুর্বল সন্তরণশীল
রেণুর পাত্রে হাত দেয়া	রেণুর পাত্রে হাত দিলে রেণু দ্রুত সরে যায়	রেণুর পাত্রে হাত দিলে রেণু দ্রুত সরে যায় না

রেণু পরিবহণ

হ্যাচারি থেকে অক্সিজেন ব্যাগে রেণু পরিবহণ করতে হবে, সতর্ক থাকতে হবে ব্যাগে যাতে কোনোভাবে ছিদ্র না হয় ব্যাগ ঠান্ডা ও ছায়াযুক্ত স্থানে রাখতে হবে, বেশি ব্যাগ এক সাথে পরিবহন করা হলে বিকল্প অক্সিজেন সরবরাহ বা হাড়ির ব্যবস্থা রাখতে হবে। ৬০ x ৪০ সেমি আকারের একটি পলিথিন ব্যাগে ৮-১০ ঘন্টার দুরত্বে ১২৫ গ্রামের বেশি রেণু পরিবহন করা উচিত নয়। তহে নির্ভরযোগ্য পরিমাণ হলো ৩-৫ গ্রাম/লিটার পানি।

খাপ খাওয়ানো ও পুকুরে রেণু ছাড়া

রেণুর ব্যাগ ও পুকুরের পানির তাপমাত্রার সমতা এনে রেণু ছাড়তে হবে। প্রথমে ব্যাগ ও পুকুরের পানির তাপমাত্রার সমতা এনে রেণু ছাড়তে হবে। এর জন্য রেণু পরিবহনকৃত ব্যাগটি ১০-১৫ মিনিট পুকুরের পানিতে ভাসিয়ে রাখতে হবে। ব্যাগের মুখ আস্তে আস্তে খুলে হাত একবার ব্যাগের পানিতে আবার পুকুরের পানিতে ডুবিয়ে তাপমাত্রা সমান আছে কিনা দেখতে হবে। থার্মোমিটারও ব্যবহার করা যেতে পারে। ব্যাগ ও পুকুরের পানির তাপমাত্রা সমান না হলে উভয় পানি বদলা-বদলী করতে হবে। এভাবে তাপমাত্রার ব্যবধান ধীরে ধীরে কমে আসবে। রেণু ছাড়ার জায়গায় হাত দিয়ে তলদেশের পানি উপরের দিকে আন্দোলিত করে তাপমাত্রার সমতা আনতে হবে। তাপমাত্রার পার্থক্য যেন ২০ সে. বেশি না হয়। তাপমাত্রা সমতায় আসলে ব্যাগ কাত করে হালকা ঢেউ দিলে ব্যাগ থেকে রেণু ধীরে ধীরে পুকুরে চলে যাবে। পাড়ের কাছাকাছি বাতাসের প্রতিকূলে রেণু ছাড়তে হবে।

রেণু ছাড়ার সময়

- সকালে অথবা বিকেল বেলা ছাড়াই উত্তম
- বৃষ্টি অথবা নিম্নচাপের দিনে রেণু ছাড়া ঠিক হবে না।

রেণু ছাড়ার পর তিন দিন পর্যন্ত সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। পানি অধিক সবুজ ও শেওলাযুক্ত হলে রৌদ্রজ্জ্বল দিনে অধিক অক্সিজেন রেণুর মড়ক ঘটবে। এমতাবস্থায় পুকুরের তলার কাধা তুলে সারা পুকুরে ছিটাতে হবে যেন পানি ঘোলা হয়। এতে সূর্যের আলো বাধাপ্রাপ্ত হবে। ফলে শেওলা সালোকসংশ্লেষণের মাধ্যমে অধিক অক্সিজেন তৈরি করতে পারবে না।

মজুদপরবর্তী ব্যবস্থাপনা

পুকুরে সার প্রয়োগের ফলে যে প্লাংকটন জন্মে, রেণু বা বড় পোনা তা খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে। এছাড়া রেণু মজুদের পর প্রাকৃতিক খাদ্যের পাশাপাশি সম্পূরক খাদ্য সরবরাহ করা প্রয়োজন।

রেণু মজুদের পর ৪টি কাজ গুরুত্বপূর্ণ

- প্রতিদিন ভোরে পুকুর পর্যবেক্ষণ করতে হবে।
- রেণু সাধারণত দল বেঁধে পুকুরের কিনার দিয়ে চলাফেরা করে, যা লক্ষ্য করলে খালি চোখেই দেখা যাবে।
- গামছা বা কাপড় টেনে প্রতি টানে যদি ৫-১০টি রেণু আসে তবে বুঝতে হবে বেঁচে থাকার হার ভাল।
- গামছা টানার পর রেণু থালায় নিয়ে দেখতে হবে। সুস্থ রেণু হবে সন্তরণশীল।

সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগ

রেণুর জন্য পুকুরে সরিষার খৈল, চালের কুঁড়া, গমের ভুমি খাবার হিসেবে ব্যবহার করা যায়। আর্থিক বিবেচনায় চাষিরা এসব খাদ্য উপকরণ তাদের পুকুরে অধিকমাত্রায় ব্যবহার করে থাকে। এ সব খাদ্যে প্রোটিন মান কম কিন্তু প্রোটিন সমৃদ্ধ প্রাকৃতিক খাবার তৈরিতে সহায়ক। খৈলের পরিবর্তে ফিসমিল ব্যবহার করা যায়। আবার খৈল (৩৫-৪০%) ভূসির (২০-২৫%) সাথে কসাই খাবার রক্ত (৩৫-৪০%) মিশ্রণে সম্পূরক খাবার অত্যন্ত কার্যকর। এ মিশ্রণ প্রয়োগে রেণু থেকে ধানী পর্যন্ত বেঁচে থাকার হার শতকরা প্রায় ৯০ ভাগ।

খাদ্যের পরিমাণ

খাদ্যের পরিমাণ নির্ভর করে পুকুরে প্রাকৃতিক খাদ্যের অবস্থা, রেণুর মোট ওজন, বয়স এবং তাপমাত্রার ওপর। সাধারণত রেণুর মোট ওজনের ২ গুণ হারে দৈনিক দু'বার খাবার দিতে হবে।

প্রয়োজনীয় সম্পূরক খাদ্যের পরিমাণ

১-৫ দিন	মজুদকৃত রেণুর ওজনের ২ গুণ/দিন	১১-১৫ দিন	মজুদকৃত রেণুর ওজনের ৪ গুণ/দিন
৬-১০ দিন	মজুদকৃত রেণুর ওজনের ৩ গুণ/দিন	১৬-২০ দিন	মজুদকৃত রেণুর ওজনের ৫ গুণ/দিন

রেণু মজুদের প্রথম ৫ দিন শুধু খৈল প্রয়োগ সবচেয়ে ভাল। গবাদি পশুর রক্ত পাওয়া না গেলে খৈল ৫০ ভাগ ভুষি/কুঁড়া ৫০ ভাগ হারে ধানী কাটাই না করা পর্যন্ত দিতে হবে। সিরিষার খৈল অন্তত ১০ ঘন্টা পানিতে ভিজিয়ে রেখে তার সাথে মিহি কুঁড়া/ভুসি ভালোভাবে মিশিয়ে সমস্ত পুকুরে সমানভাবে ছিটিয়ে দিতে হবে।

সার প্রয়োগ: রেণু মজুদের পর পুকুরে প্রাকৃতিক খাদ্য বজায় রাখার জন্য প্রতিদিন নিম্নহারে অজৈব সার দিতে হবে

সার	পরিমাণ (গ্রাম/শতাংশ/দৈনিক)
ইউরিয়া	৪-৫
টিএসপি	৩

প্রয়োগ পদ্ধতি

অজৈব সার পুকুর প্রস্তুতকালীন পদ্ধতির অনুরূপ

রেণু মজুদের পর আরও সে সমস্ত বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে:

- খুব সকালে রেণু ভেসে উঠতে পারে। তখন পানির ঝাপটা, সম্ভব হলে নতুন পানি দিতে হবে;
- সকালে ও বিকালে হররা টেনে তলার বাজে গ্যাস বের করে দিতে হবে;
- রেণু ছাড়ার ৫-৭ দিনের মধ্যে চট জাল টানা যাবে না ও মেঘলা দিনে সার ও খাবার দেয়া যাবে না;
- অধিক তাপমাত্রায় পুকুরে পানি গরম হয়ে গেলে ছায়া ব্যবস্থা করতে হবে এবং সম্ভব হলে ঠান্ডা পানি সরবরাহ করতে হবে।

ধানী পোনা কাটাই

রেণুপোনা আরো বড় হয়ে ধানের আকার বা ১.৫-২ সেমি এর বড় হলে, তাদেরকে ধানীপোনা বলে। নিয়মিত সার ও খাবার দিলে ১০-১২ দিনের মধ্যেই ধানীপোনা কাটাই বা স্থানান্তর করা যায়।

- **কাটাই পদ্ধতি ও সময়-** সকাল বেলাতেই ধানী কাটাই করা ভালো। কাটাই করার আগের দিন পুকুরে জাল টেনে পোনাগুলোকে অল্প পানির ঝাপটা দিয়ে ছেড়ে দিতে হবে। পরদিন সকালে জাল টেনে, সতর্কতার সাথে পোনাগুলোকে একত্র করে বার বার পানির ঝাপটা দিতে হবে। তারপর অ্যালুমিনিয়ামের পাতিল বা পলিথিন ব্যাগে কম ঘনত্বে ধানী পোনা লালন পুকুরে স্থানান্তর করা উচিত।
- **ধানী থেকে চারা পোনা উৎপাদন-** ধানী পোনা আরো বড় হয়ে হাতের আঙ্গুলের মতো বা আরো বড় আকার ধারণ করলে (৭ সেমি এর উপর, ওজন ৫-২৫ গ্রাম) তাদেরকে চারাপোনা বলে।
- **পুকুর প্রস্তুতি-** নার্সারি পুকুরের মত লালন পুকুরও এই নিয়মে তৈরি করা হয়। তবে কোন কীটনাশক ব্যবহারের দরকার নেই।

মজুদ ঘনত্ব এবং হার

- প্রতি শতাংশ ধানী মজুদ করা যাবে ৮০০-১০০০টি (একক বা মিশ্র);
- একই পুকুরে এক জাতের অথবা বিভিন্ন জাতের ধানী একসাথে মজুদ করা যাবে;
- আলাদা আলাদা পুকুরে আলাদা আলাদা প্রজাতির ধানী মজুদ করা ভাল।

নিচের নিয়মে পুকুরে ধানী পোনা মজুদ করা যায়

প্রজাতি	এক ধাপ (সংখ্যা)	দুই ধাপ (সংখ্যা)
কাতলা	১৫০-২০০	-
সিলভার কার্প	২০০-২৫০	১৭৫-২০০
বিগ হেড	-	১৫০-২০০
রুই	১৫০-২০০	১০০-১৫০
মৃগেল	১০০-১২৫	১৫৮০-২০০
কার্পিও	১০০-১২৫	১৫০-১৫০
গ্রাস কার্প	১০০-১০০	৭৫-১০০
সর্বমোট	৮০০-১০০০টি	৮০০-১০০০ টি

পোনা পরিবহন ও ছাড়া

- পলিথিন ব্যাগ, পাতিল বা ব্যারেলে ধানী পরিবহন করা যায়। পরিবহন ঘনত্ব নির্ভর করে পোনার প্রজাতি, শারীরিক অবস্থা, দুরত্ব এবং তাপমাত্রার ওপর।
- রেণু ছাড়ার মতোই পুকুরের পানির তাপমাত্রার সাথে সহনশীল করে আস্তে আস্তে ধানী পোনা ছাড়তে হবে।

খাদ্য প্রয়োগ

- প্রতিদিন পোনাকে তাদের ওজনের ৫-১০% হারে খাবার দেয়া উচিত;
- পোনার স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য চালের মিহি কুঁড়া/গমের ভুসি ও খৈল ব্যবহার করা যায়;

- ভালো উৎপাদনের জন্য প্রোটিনসমৃদ্ধ খাদ্য দরকার, খাদ্যে প্রোটিন পরিমাণ ২৫-৩০% হলে ভাল হয়;
- রক্ত/ফিসমিল ব্যয় সাধ্য। এগুলো না পাওয়া গেলে খৈল ৫০ ভাগ ও ভুসি ৫০ ভাগ হারে ব্যবহার করা যাবে;
- পুকুরে গ্রাস কার্প/স্বর পুঁটির পোনা থাকলে ক্ষুদিপোনা ১৫০-২০০ গ্রাম/শতাংশ/দিন হিসেবে প্রয়োগ করতে হবে;
- প্রতিদিন মোট খাবারের অর্ধেক সকালে এবং অবশিষ্ট বিকেলে একটি নির্দিষ্ট জায়গায় ছড়িয়ে দিতে হবে;
- ট্রেতে খাবার দিলে ভাল ফল পাওয়া যায়।

সার প্রয়োগঃ নার্সারি পুকুরের মতো লালন পুকুরে নিয়মিত সার দিতে হবে। প্রয়োগ মাত্রা এবং পদ্ধতি নার্সারি পুকুরে সার প্রয়োগের মতোই, তবে পানিতে মাছের প্রাকৃতিক খাদ্যের অবস্থা অনুযায়ী সার কম বেশি হবে। পানির রং বেশি সবুজ হলে মেঘলা দিনে পুকুরে সার ও খাবার দেয়া বন্ধ রাখতে হবে।

হররা টানাঃ পোনা মজুদের পর মাঝে মাঝে সকালে/বিকেলে হররা টেনে দিলে পুকুরের তলায় বাজে গ্যাস জমতে পারবে না।

নমুনায়নঃ ২-৩ সপ্তাহ পর পর জাল টেনে পোনার স্বাস্থ্য, ওজন এবং আনুমানিক বেঁচে থাকার হার পরীক্ষা করাসহ পোনার খাদ্য মাত্রার প্রয়োজনীয় পরিমাণ নির্ণয় করা যায়।

শিং মাছের নার্সারি ব্যবস্থাপনা

যে কোন মাছচাষে উত্তম ফলাফল প্রাপ্তির পূর্বশর্ত সঠিক আকারের ও ভাল মানের পোনা নিশ্চিত করা। নিজস্ব নার্সারি ছাড়া সঠিক সময়ে সঠিক আকারের পোনা প্রাপ্তি নিশ্চিত হওয়া যায় না। শিং মাছ চাষের ক্ষেত্রে বিষয়টি অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

পুকুর প্রস্তুতি: পানি নিস্কাশন করে পুকুর শুকিয়ে তলদেশে অতিরিক্ত কাদা অপসারণ করে ফেলতে হবে; পুকুরের ঢালে গর্ত থাকলে তা ভরাট করে ঘাস থাকলে তা পরিস্কার করে ফেলতে হবে।

ব্লিচিং প্রয়োগ: পুকুরের তলদেশ শুকানো না হলে যদি ভিজা কাদা কাদা থাকে তবে প্রতি শতকে ১০০ গ্রাম ব্লিচিং পাউডার পানিতে গুলিয়ে ছিটিয়ে দিতে হবে। ব্লিচিং পাউডার পুকুরের তলদেশের সকল জীবাণু ধবংশ করবে। শুকনা পুকুরে ব্লিচিং প্রয়োগের প্রয়োজন নাই।

চুন প্রয়োগ: পুকুরে ব্লিচিং প্রয়োগের পর প্রতি শতাংশে ১ কেজি হারে পোড়া চুন পানিতে ভালভাবে গুলিয়ে ঢালসহ পুকুরের তলায় ছিটিয়ে দিতে হবে।

রেণু সংগ্রহ: সুনাম আছে, নিজস্ব উৎসের মা-মাছ হতে রেণু উৎপাদন করে এবং পরিচিত পুকুর প্রস্তুতির পুর্বে এরকম হ্যাচারির সাথে যোগাযোগ করে রেণু গ্রহণের দিন নির্ধারণ করতে হবে। মনে রাখতে হবে ভাল মানের রেণু হলে তা থেকে ভাল মানের পোনা তৈরি হবে। সাধারণত রেণু অক্সিজেন ব্যাগে পরিবহন করা হয়।

পুকুরে পানি সরবরাহ: রেণু প্রাপ্তির ১-২ দিন আগে পুকুরে ১.৫-২.৫ ফুট গভীরতা পর্যন্ত পানি সরবরাহ করতে হবে। পুকুরের অগভীর অংশে কিছুটা ঘাস থাকলে ভাল হয়। কারণ শিং মাছের পোনা প্রাকৃতিগতভাবে অগভীর পানির ঘাসযুক্ত স্থানে চরে বেড়ায়। দিনের সুর্যের প্রখরতা বৃদ্ধির সাথে সাথে জলাশয়ের গভীর অংশে চলে যায়। পানি প্রবেশের পর পূর্ব থেকে তৈরি ইষ্ট মোলাসেস এর পানির মিশ্রণ সমস্ত পুকুরে ছিটিয়ে দিতে হবে। এতে পুকুরে পর্যাপ্ত প্রয়োজনীয় জুপ্লাংকটন তৈরি হবে।

৩০ শতাংশ জলায়তনের পুকুরের জন্য একটি পাত্রে ২০ লি. পানির সাথে ১০ কেজি অটোকুঁড়া, ৬ কেজি চিটাগুড় ও ৫০ গ্রাম ইস্ট ২৪ ঘন্টা ভিজিয়ে পুকরে প্রয়োগ করতে হবে।

নার্সারি পুকুরের চারিদিকে বেড়া স্থাপন: নার্সারি পুকুরে অধিক ঘনত্বে ছোট আকারের পোনা মাছ থাকে এবং এ পোনা মাছ সাপ এবং ব্যাঙের উত্তম খাবার তাই পুকুরে যাতে কোন প্রকার ক্ষতিকর প্রাণী প্রবেশ করতে না পারে সে জন্য নার্সারি পুকুরের চারদিকে বেড়া দিতে হবে। বেড়া দেয়ার জন্য বাঁশের বানা অথবা ঘন ফাঁসের নাইলনের জাল ব্যবহার করা যেতে পারে।

রেণুর জন্য ক্ষতিকর পোঁকা মাকড় দমন: পুকুরে পানি প্রবেশ করানোর পর বা পুকুরে প্রাকৃতিক খাদ্য সৃষ্টির পাশাপাশি শিং মাছের রেণুর জন্য ক্ষতিকর হাঁস পোকা জন্মাতে পারে। হাঁসপোকা দূও করার জন্য ৩০ শতাংশ পুকুরে ১ লিটার কেরোসিন বা ডিজেল মৃদু বাতাস প্রবাহের অনুকুলে ধীরে ধীরে ছিটাতে হবে। বাতাসের প্রবাহ অধিক হলে কেরোসিনের কার্যকারীতা কম হবে। কিন্তু রেণু ছাড়ার ঠিক আগের দিন পুকুরে পানি প্রবেশ করালে কেরোসিন না দিলেও চলবে।

রেণু মজুদ: হ্যাচারি থেকে রেণু নির্ধারিত দিনে সংগ্রহ করে পুকুর পাড়ে আনতে হবে। প্রতি ৩০ শতাংশের পুকুরে ১ কেজি পরিমাণ রেণু মজুদ করা যেতে পারে। রেণু ভোরে অথবা বিকালে পুকুরে ছাড়লে ভাল হয়। রেণু আনার সাথে সাথে রেণুসহ অক্সিজেন ব্যাগ পুকুরের পানিতে রাখতে হবে। পুকুরের পানি কোন কারণে গরম থাকলে পানি আলোড়িত করে পুকুরের তলদেশের ঠান্ডা পানি উপরে আনার ব্যবস্থা করতে হবে। অক্সিজেন ব্যাগ খুলে পুকুরের পানির সাথে রেণুর খাপ খাইয়ে ধীরে ধীরে পুকুরে ছেড়ে দিতে হবে।

রেণু মজুদের সময় অন্যান্য করণীয়: রেণু ছাড়ার পুর্ব মূহূর্তে পুকুরের পানি জীবাণু মুক্ত রাখার জন্য বাজারে প্রাপ্ত যে কোন একটি ভাল মানের জীবাণুনাশক পরিমাণমত পুকুরে ছিটিয়ে পানির সাথে মিশাতে হবে। এজন্য পুকুরের তলদেশ মই দিয়ে নেড়ে দিতে হবে। এ সময় পুকুরের তলদেশের জমে থাকা গ্যাস দূর করার জন্য বাজারে প্রাপ্ত যেকোন একটি ইয়োকা নির্জাস সমৃদ্ধ ঔষধ ২-৩ মিলি (৩-৪ ফুট গভীরতায়) প্রতি শতাংশে প্রয়োগ করতে হবে। এর পাশাপাশি রেণু ছাড়ার সময় পানিতে অক্সিজেনের প্রাচুর্যতা বৃদ্ধির জন্য প্রতি শতাংশে ২ গ্রাম হারে সোডিয়াম পার কার্বনেট (১২-১৩%) দিলে ভাল হয়।

খাদ্য প্রয়োগ: রেণু ছাড়ার ৪-৫ ঘন্টা পর প্রতি কেজি রেণুর জন্য ১০-১২টি সিদ্ধ ডিমের কুসুম পানিতে গুলিয়ে সমস্ত পুকুরে ছিটিয়ে দিতে হবে এবং এসময় ভিটামিন প্রিমিক্স মিশিয়ে দিলে ভাল হয়। ডিমের কুসুম পানিতে ভালভাবে গুলানোর সময় ভিটামিন তাতে মিশাতে হবে। মিশ্রিত দ্রবণ সমস্ত

পুকুরে ছিটিয়ে দিতে হবে। রাত্রে একই ভাবে খাদ্য প্রয়োগের সময় আর এক বার সোডিয়াম পার কার্বনেট আগের মাত্রায় প্রয়োগ করতে হবে। এভাবে ২ দিন পরে যে কোন ভাল ব্রান্ডের নার্সারি খাদ্য (১ কেজি পাউডার) পানিতে ভিজিয়ে একবার ভোরে এবং আর একবার সন্ধায় প্রয়োগ করতে হবে। এভাবে ১০-১৫ দিন প্রতিপালনের পর পোনা যখন পানির উপরের তলে যাওয়া-আসা শুরু করবে তখন পাউডার খাদ্য পুকুরের পানির ওপর ছিটিয়ে দিতে হবে। পুকুরে প্রাকৃতিক খাদ্যের প্রাচুর্যতা পর্যবেক্ষণ করতে হবে এবং সে অনুযায়ী খাদ্যের পরিমাণ ধীরে ধীরে বাড়াতে হবে। প্রাকৃতিক খাদ্য কম থাকলে পূর্বে আলোচিত পদ্ধতিতে অটোকুড়া, মোলাসেস এবং ইস্ট প্রক্রিয়াজাত করে পুকুরে দিতে হবে। চাষ চলাকালে পুকুরের তলদেশের গ্যাস দূর করার জন্য প্রতি সপ্তাহে একবার করে স্বল্প ডোজে জিওলাইট (১০০ গ্রাম/শতাংশে) এবং তার সাথে গ্যাস শোষণকারী রাসায়নিক প্রকুরে প্রয়োগ করতে হবে। পোনা নিরাপদ রাখার জন্য ১০-১২ দিন পর আবার এক ডোজ জীবানুনাশক ব্যবহার করতে হবে।

নার্সারি পুকুরের পানিতে প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদন: নার্সারি পুকুরের পানি রেণু ছাড়ার ২-৩ দিনের ভিতর সবুজ করতে হবে যাতে পুকুরের তলদেশে সূর্যের আলো প্রবেশ করতে না পারে। ইস্ট মোলাসেস দিলে পুকুরে জুপ্লাংটনের আধিক্য বাড়ে কিন্তু পানির স্বচ্ছতা কমানোর জন্য সরিষার খৈল ভেজানো পানি পুকুরে দিতে হবে। এ উদ্দেশ্যে ২-৩ দিন আগে একটি পাত্রে ৪-৫ কেজি সরিষার খৈল ভেজাতে হবে। খৈল ভেজানোর ২ ঘন্টা পর সমস্ত পানি উপর থেকে ফেলে দিতে হবে কারণ উক্ত পানিতে তৈলের একটি স্তর পড়ে। প্রথম বারের পানি ফেলে দিয়ে আবার পানি দিয়ে রখতে হবে। খৈল ভেজানো পানি ২৪ ঘন্টা পরপর ২-৩ দিন পুকুরে দেয়া যাবে। এর পরে ভেজানো খৈল অন্য পুকুরে ব্যবহার করতে হবে। খৈল ভেজানো পানি পুকুরে প্লাংকটোন জন্মাতে সাহায্য করবে।

আশ্রয় স্থল ও পুকুরের চারিদিকে বেড়া স্থাপন: রেণু পোনার আশ্রয়স্থল হিসেবে পুকুরের কয়েকটি স্থানে কচুরী পানা সুতা ও লাঠির সাহায্যে আটকিয়ে দিতে হবে। এসব আশ্রয়স্থলে পোনা দিনের বেলা আশ্রয় নেয় এবং পোনার বর্ণ স্বাভাবিক রাখা যায়। এখানে একটি বিষয় মনে রাখতে হবে সব ধরণের মাছের নার্সারির ক্ষেত্রে নাইলনের জাল দিয়ে পুকুরের চারদিকে অবশ্যই বেড়া দিতে হবে। কারণ যেখানে পোনা চাষ করা হয় সেখানে সাধারণত মাছ শিকারী প্রাণী যেমন সাপ, ব্যাঙ প্রভৃতি প্রবেশ করে প্রচুর পোনা খেয়ে ফেলে। পোনার জৈব নিরাপত্তা (Biosecurity) নিশ্চিত করতেও পুকুরের চারিদিকে বেষ্টনি দেয়া একান্ত প্রয়োজন।

রেণুর পরিচর্যা: রেণু প্রতিপালন চলাকালে পুকুরের পানির গুণাগুণ পর্যবেক্ষণে রাখতে হবে। পুকুরের তলদেশে গ্যাস জমছে কিনা সে বিষয়ে খেয়াল রাখতে হবে। যেহেতু অধিক পুষ্টিসমৃদ্ধ খাদ্য পুকুরে দেয়া হয় সেজন্য উচ্ছিষ্ট খাদ্য পুকুরের তলায় জমে গ্যাস সৃষ্টি হতে পারে। এ জন্য গ্যাসশোষণ কারী রাসায়নিক প্রয়োগের পাশাপিাশ পানির অবস্থা বুঝে হররা টানতে হবে। হররা সূর্য উঠার পর বেলা ১১-১২ টার সময় পুকুরের এক পাশ থেকে অপরপাশে আবার অপর পাশ থেকে এপাশ এভাবে হররা টেনে পুকুরের তলদেশ ওলোটপালোট করে দিতে হবে। এ সময় যে কোন একটি ভাল মানের প্রোবায়টিক্সও ব্যবহার করা যেতে পারে। পুকুরে রেণু বাঁচার হার, তাদের খাদ্য গ্রহণের প্রবণতা পর্যবেক্ষণ করলে সার্বিক সমস্যা বিষয়ে ধারণা পাওয়া যাবে। পুকুরে জুপ্লাংটনের প্রাচুর্যতা ভাল থাকলে পুকুরে খাবার কম দিতে হবে। নার্সারি পুকুরে হাঁস পোকা বেশি হলে পূর্বের ন্যায় ৩০ শতাংশে ৫০০ এমএল কেরোসিন পুনরায় পুকুরে দিতে হবে। এভাবে রেণু ৩০-৩৫ দিন পালন করলে পোনা চাষের পুকুরে ছাড়ার আকার অর্থাৎ কেজিতে ২০০০-২৫০০ বা ১.৫-২ ইঞ্চি আকার হয়ে যাবে।

পোনা আহরণ এবং বিক্রয়: সাধারণত শিং মাছের পোনা আহরণ করতে হয় খুব ভোরে কারণ দিনের বেলায় জাল টানলে পোনা আনেক সময় কম ধরা যায়। পোনা ধরার সময় ঘন ফাঁস বিশিষ্ট প্লাষ্টিকের মসৃণ জাল দিয়ে পোনা ধরতে হবে যাতে পোনা কোনভাবেই আঘাত প্রাপ্ত না হয়। পোনা জাল থেকে হাউজে নেওয়ার সময় পাতিলে পানিসহ পরিবহন করতে হবে। কোন ভাবেই পোনা পানি ছাড়া পরিবহন করা যাবে না। কারণ শিং মাছের গায়ে আঁইশ নাই এবং গায়ের ত্বক পাতলা এবং কানকোয়ার দুপাশে দুটি সুচালো বিষাক্ত কাটা আছে। পানি ছাড়া পোনা পরিবহন করে হাউজে আনলে কাটায় পোনা আহত বা চামড়া ছিড়ে যেতে পারে বা চামড়া ছিদ্র হয়ে যেতে পারে। ক্ষত স্থানে ব্যাক্টেরিয়ার সংক্রমণ ঘটে, এ সংক্রমণ সমস্ত পোনা মাছে ছড়িয়ে পড়তে দেখা যায়। এখানে আরো একটি বিষয় খেয়াল রাখতে হবে যেন একই কারণে পোনা পরিমাপের সময় বা পোনা অক্সিজেন ব্যাগে প্যাকেটিং এর সময় প্লাষ্টিকের ছিদ্রযুক্ত ঝুঁড়ি ব্যবহার করা না হয়। এ ক্ষত্রে মসৃণ স্টিলের ছিদ্রযুক্ত গামলা বা বাটি ব্যবহার করতে হবে। শিং মাছের পোনার ত্বকে ক্ষত হলে পরবর্তীতে পোনার ব্যাপক মড়ক দেখাদিতে পারে। এজন্য শিং মাছের পোনা সর্তকতার সাথে নাড়া চাড়া (Handling) করতে হয়। পোনা বিক্রয়ের আগের দিন পুকুরে খাদ্য প্রয়োগ না করাই ভালো। সাধারণত ভালভাবে পরিচর্যা করলে ১ কেজি রেণু থেকে ১ লক্ষ হতে ২ লক্ষ পোনা উৎপাদিত হয়।

পাবদা মাছের নার্সারি ব্যবস্থাপনা

নার্সারি পুকুর প্রস্তুতি- (শিং মাছের নার্সারি পুকুর প্রস্তুতির অনুরূপ)।

মজুদকালীন করণীয়- নার্সারি পুকুরের পানির গভীরতা ৩-৪ ফুট করে নিয়ে সকালে সম্পূর্ণ পুকুরের তলায় মই দিতে হবে। রেণু ছাড়ার সময় পানিতে অক্সিজেনের প্রাচুর্যতা বৃদ্ধির জন্য প্রতি শতাংশে ২ গ্রাম হারে সোডিয়াম পার কার্বনেট (১২-১৩%) দিলে ভাল হয়।

রেনুর মজুদ ঘনত্ব- প্রতি শতাংশে ৪০-৬০ গ্রাম রেনু মজুদ করা যায়।

রেনু পোনা খাপ খাওয়ানো- রেনু ছাড়ার সময় পুকুরের পানির তাপমাত্রা ও প্রতিবেশের সাথে খাপ খাওয়াতে হবে। প্রথমে রেনুপোনা বহনকারী অক্সিজেনযুক্ত ব্যাগের মুখ না খুলে পুকুরের পানিতে ১০-২০ মিনিট ভাসিয়ে রাখতে হবে। এরপর ব্যাগের মুখ খুলে পুকুর থেকে হাতের তালুতে পানি নিয়ে ব্যাগের ভিতর ঝরণার মত করে পানি ছিটিয়ে ছিটিয়ে দিতে হবে। এভাবে ব্যাগের ভিতরের পানির তাপমাত্রা ও পুকুরের পানির তাপমাত্রা সমান বা কাছাকাছি হয়ে গেলে ব্যাগটি হাল্কা কাত করে আস্তে ধীরে রেনু পোনা পুকুরে অবমুক্ত করতে হবে।

রেনু পোনা শোধন- রেনু অবমুক্ত করার এক ঘণ্টার মধ্যে প্রতি শতাংশে ২ গ্রাম ৪০% এন-এলকাইল ডাই মিথাইল বেনজাইল এমোনিয়াম ক্লোরাইড, ৬০% স্ট্যাবিলাইজড ইউরিয়া জাতীয় জীবাণুনাশক প্রয়োগ করে জীবাণুর সংক্রমণ থেকে রেনুপোনাগুলো রক্ষা করা যায়।

নার্সারি পুকুরে খাদ্য ব্যবস্থাপনা-

নার্সারি পুকুরে খাদ্য সরবরাহের তালিকা

দিন/রেণুর বয়স (দিন)	রেণুর ওজন (গ্রাম)	খাদ্য	প্রয়োগমাত্রা
১-৩	১০০	আটা/ময়দা- ১০০ গ্রাম হাঁসের সিদ্ধ ডিমের কুসুম- ১টি	৩ বারে প্রয়োগ, সকাল-৮.০০ টা, সন্ধ্যা-৬.০০টা ও রাত্রি ১০.০০ ঘটিকায়
৪-৭	১০০	৩৫-৪০% প্রোটিন সমৃদ্ধ নার্সারী ফিড (পাউডার) ১০০ গ্রাম	২ বারে প্রয়োগ, ভোর- সন্ধ্যা
৮-১০	১০০	উন্নত নার্সারী ফিড পাউডার ২০০ গ্রাম	২ বারে প্রয়োগ, ভোর- সন্ধ্যা
১৬-২১	১০০	উন্নত নার্সারী ফিড পাউডার ৪০০ গ্রাম	২ বারে প্রয়োগ, ভোর- সন্ধ্যা
২২-৩০	১০০	উন্নত নার্সারী ফিড পাউডার ৫০০ গ্রাম	২ বারে প্রয়োগ, ভোর- সন্ধ্যা

বাগদা চিংড়ির নার্সারী ব্যবস্থাপনা

চিংড়ি পোনা খামারে ছাড়ার পরপরই অনেক ক্ষেত্রেই পোনা মারা যায়। পরিবেশের তারতম্য, পোনার দূর্বলতা, পরিবহনজনিত ক্লেশ, খাপ খাওয়ানো ঠিকমত না হওয়া ইত্যাদি কারনে পোনা মারা যায়। হ্যাচারী থেকে সংগৃহীত এসপিএফ পিএল নার্সারীতে ২১-২৫ দিন প্রতিপালন করে চাষ এলাকায় (ঘেরে) ছাড়া হলে চাষকালীন মৃত্যু হার কমে এবং উৎপাদন বৃদ্ধি পায়।

নার্সারী পুকুরের ধরন: কংক্রিটের তৈরী ট্যাংক, পরিকল্পিত মাটির পুকুর, মূল চাষ এলাকার অংশ বিশেষ খাঁচা, পেন ইত্যাদি স্থাপন করে বাগদা চিংড়ির নার্সারীর জন্য ব্যবহার করা যায়। চাষ এলাকার কাছাকাছি নার্সারী পুকুর নির্মাণ করে পোনা প্রতিপালন করাই বেশী সুবিধাজনক। নার্সারির প্রতি শতাংশে ২০০০-৬০০০ টি পিএল প্রতিপালন করা যায়।

পরিকল্পিত নার্সারী পুকুর: খামারে যেখানে পানি সরবরাহ ও নিষ্কাশনের ভাল ব্যবস্থা রয়েছে, এরূপস্থানে নার্সারী পুকুর স্থাপন করা উচিৎ। একটি নার্সারী পুকুরে ভাল পানি ব্যবস্থাপনা করা না গেলে নার্সারিতে পোনা প্রতিপালন না করাই ভাল। এতে পোনা আরও দূর্বল হয়ে যায় এবং অনেক ক্ষেত্রে মৃত্যু ঘটে।

একটি পরিকল্পিত পুকুরে পানি ছেঁকে প্রবেশ ও নিষ্কাশনের ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক। পুকুরে ১ মিটার পানি ধারন করা যায় এরূপ বাঁধ নির্মান করতে হবে এবং সহজে যেন পানি অভিকর্ষ পদ্ধতিতে বের করে পুকুর শুকানো যায় এরুপ ব্যবস্থা থাকতে হবে। নার্সারী পুকুরের আয়তন ০.৩-০.৫ একর অথবা মজুদ পুকুরের এক দশমাংশ হতে হবে। পানি উত্তোলনের গেইট ১ মিঃ মিঃ ছিদ্রযুক্ত নেট স্থাপন করে পানি ছেকে নিতে হবে। পানি ছেকে না নিলে অবাঞ্চিত প্রানী দ্বারা ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে। এছাড়া নেট স্থাপন করা না হলে পুকুর থেকে পোনা বের হয়ে যাবার সম্ভাবনাও থাকে।

চুন-সার প্রয়োগ:

পোনা মজুদের পূর্বে নার্সারি পুকুর ভাল ভাবে প্রস্তুত করতে হবে। এজন্য পুকুর ভাল ভাবে সূর্যালোকে শুকাতে হবে যেন তলা ফেটে না যায়। অনাহুত মাছ দমনের জন্য রোটেনন ব্যবহার করতে হবে। তবে ভাল ভাবে পুকুর শুকানো গেলে রোটেনন ব্যবহারের প্রয়োজন হয় না। পুকুর শুকানোর পর একর প্রতি ৪০০-৮০০ কেজি কৃষি চুন প্রয়োগ করতে হবে, তবে চুনের পরিমান মাটির পিএইচ এর সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত। চুন প্রয়োগের ২/৩ দিন পর পর ০.৮০-১.০ মিটার পানি তুলে একর প্রতি ১.০০ কেজি ইউরিয়া এবং ১.০০ কেজি টি,এস,পি সার প্রয়োগ করতে হবে যতদিন না পানি সবুজ হয়। সার পাতলা করে গুলে পানিতে ছিটিয়ে দিতে হবে।

পানি ও খাদ্য ব্যবস্থাপন:

সার প্রয়োগের ৬/৭ দিনের মধ্যে প্রাকৃতিক খাদ্য তৈরী হয়। তখনই পোনা মজুদ করা যাবে। নার্সারি পুকুরের পানি পরিবর্তন হার পোনা মজুদের ঘনত্বের উপর নির্ভরশীল। মজুদ ঘনত্ব বেশী হলে প্রতিদিন পানি পরিবর্তন ও পাউডার খাদ্য পোনার দেহের ওজনের ২০% হিসাবে প্রয়োগ করতে হবে। বর্তমানে বাজারে নার্সারিতে ব্যবহারের উপযোগী পাউডার ও পিলেট খাবার পাওয়া যায়। পরিমিত খাদ্য যেমন চিংড়ি পোনার বৃদ্ধি ঘটায় তেমনি অতিরিক্ত খাদ্য চিংড়ি পোনার মৃত্যুর কারন হতে পারে। পুকুরে ব্যবহৃত খাদ্য পোনা ঠিকমত গ্রহণ না করলে তা পানি দূষণের কারন হয়ে পড়ে। এজন্য খাদ্য-ট্রে তে খাদ্য সরবরাহ করে তা পর্যবেক্ষণ করতে হবে।

পেন নার্সারি:

খামারের একটি নির্দিষ্ট স্থানে যেখানে পানি চলাচল ব্যবস্থা ভাল এরূপস্থানে পেন স্থাপন করতে হবে। ০.৫-১.০ মিঃ মিঃ ছিদ্র (ফাঁস) যুক্ত কৃত্রিম তন্তুর নেট দ্বারা পেন স্থাপন করা যায়। নেটের বাইরের দিকে বাশেঁর পাটা ব্যবহার করে পেনকে মজবুত করা যায়। নেট এবং বাঁশের পাটা ৪০-৪৫ সেঃ মিঃ মাটির মধ্যে বসিয়ে/ঢুকিয়ে দিতে হবে। যাতে সহজে উঠে না আসে। এভাবে পেনে খাদ্য প্রয়োগ করে পোনাকে ২০-২৫ দিন প্রতি পালন করে খামারে ছেড়ে দিলে মৃত্যু হার কম হয়। এতে উৎপাদন বেশী আশা করা যায়।

নার্সারীতে মজুদ কালে খাপ খাওয়ানো:

অক্সিজেন ব্যাগে পরিবহনকৃত পোনা ব্যাগসহ পুকুরের পানিতে ভাসিয়ে রাখতে হবে। এ অবস্থায় পরিবহনকৃত ব্যাগের পানি ও পুকুরের পানির তাপমাত্রা একই মাত্রায় আনা যায়। তারপর ব্যাগের মুখ খুলে পুকুরের পানি অল্প অল্প করে ব্যাগে দিতে হবে এবং ব্যাগের পানি অল্প অল্প করে পুকুরে ফেলতে হবে।

৪০-৫০ মিনিট সময় ধরে এরূপভাবে পোনাকে পুকুরের পানির সঙ্গে খাপ খাওয়াতে হবে। এতে পানির লবনাক্ততা, অক্সিজেন, পিএইচ ও কার্বন-ডাই-অক্সাইড ইত্যাদির মাত্রা সমতায় চলে আসবে।

হাঁড়িতে পরিবহনকৃত পোনা একই পদ্ধতিতে খাপ খাইয়ে পুকুরে ছাড়তে হবে। পোনা ছাড়ার পূর্বে পোনা খাপ না খাইয়ে ছাড়া হলে হঠাৎ নতুন পরিবেশে চিংড়ির পোনা সহজে দূর্বল হয়ে রোগাক্রান্ত হতে পারে এবং মারা যেতে পারে।

পোনা ছাড়ার সময়:

সকাল বা সন্ধ্যা পোনা ছাড়ার উপযুক্ত সময়। এসময় তাপমাত্রা সহনীয় অবস্থায় থাকে। তবে সকাল বেলায় পোনা ছাড়াই উত্তম কারণ এ সময়ে যেমন তাপমাত্রা কম থাকে অন্য দিকে অক্সিজেনের পরিমান ও পর্যায়ক্রমে বাড়তে থাকে।

মজুদ কালে পোনার বাঁচার হার পর্যবেক্ষণ:

নার্সারি পুকুরে হাপা স্থাপন করে পোনার প্রাথমিক মৃত্যু হার পর্যবেক্ষণ করা যায়। পুকুরের একটি নির্দিষ্ট স্থানে হাপা স্থাপন করে পুকুরের মজুদকৃত পোনা থেকে ১০০-১৫০টি পোনা হাপায় ছাড়তে হবে এবং ২৪ ঘন্টা পর পোনা গুনে বেঁচে থাকার হার দেখতে হবে। হাপায় যে পরিমাণ পোনা বেঁচে থাকবে সে হারেই পুকুরে মজুদকৃত পোনার বাঁচার হার নির্ধারণ করা যায়।

রোগ ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা

রোগ হচ্ছে যে কোন প্রাণীর দেহের অস্বাভাবিক অবস্থা যা বিশেষ কিছু লক্ষণ দ্বারা প্রকাশ পায়। অন্যান্য প্রাণীর ন্যায় মাছ ও চিংড়ির মাঝেও নানা ধরনের রোগ বালাই হতে দেখা যায়। রোগ এবং স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত অজ্ঞতা বা অবহেলার কারণে প্রতি বছরই অনেক চাষির পুকুরে ব্যাপক আকারে মাছ ও চিংড়ি মারা যায়। চাষি আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে পড়েন এবং দেশ লক্ষ লক্ষ টাকার বৈদেশিক মুদ্রা আয় থেকে বঞ্চিত হয়।

রোগের কারণ

জলজ পরিবেশের চাপ, রোগ-জীবাণু এবং মাছ ও চিংড়ির অভ্যন্তরীণ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার ফলে রোগের সৃষ্টি হয়ে থাকে। সে জন্য মাছ ও চিংড়ি রোগাক্রান্ত হওয়ার পিছনে একাধিক কারণ বা বিষয় কাজ করে। এখন পর্যন্ত যে সব কারণ চিহ্নিত করা হয়েছে তাদের মধ্যে উলেখযোগ্য হচ্ছে -

- পানির ভৌত-রাসায়নিক গুণাগুণের অবনতি (পানির তাপমাত্রা, পচা জৈব পদার্থ, পিএইচ, দ্রবীভূত অক্সিজেনম, অ্যামোনিয়া, হাইড্রোজেন সালফাইড ইত্যাদি);
- প্রয়োজনের অতিরিক্ত সার ও খাদ্য প্রয়োগ বা বাইরে থেকে ময়লা ধোয়া দূষিত পানির প্রবেশ;
- অধিক মজুদ ঘনত্ব ও প্রয়োজনীয় পুষ্টির অভাব; এবং
- ত্রুটিপূর্ণ পরিবহন ও হ্যান্ডেলিং এবং পরজীবী ও রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণুর সংক্রমণ।

নিচের প্রবাহ চিত্রের মাধ্যমে মাছ ও চিংড়ির রোগাক্রান্ত হওয়ার কারণ বিস্তারিতভাবে প্রকাশ করা যায়:

রোগের কারণ এবং মাছ ও চিংড়ির মড়কের মধ্যে একটি ঘটিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। পানির পরিবেশ দূষিত হওয়ার ফলে মাছের মৃত্যুহার অধিক হয় এবং পোনা দ্রুত মারা যায়। মাছের মড়কের অন্যান্য কারণ, যেমনঃ রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণু, পুষ্টির অভাব ইত্যাদির প্রতিক্রিয়া অপেক্ষা পরিবেশের প্রতিক্রিয়ার তীব্রতা অনেক বেশি।

রোগের সাধারণ লক্ষণ

রোগের প্রকারবেদ ও রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণু বা আক্রমণের ধরন অনুযায়ী রোগাক্রান্ত মাছ ও চিংড়ির মাঝে বিভিন্ন প্রকার লক্ষণ দেখা যায়। তবে সাধারণত রোগাক্রান্ত মাছ ও চিংড়ির মধ্যে যে সমস্ত লক্ষণ ও আচরণ বেশি দেখা যায় সেগুলো হচ্ছে:

রোগাক্রান্ত মাছ ও চিংড়ি

- ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে এবং ছন্দহীনভাবে পানির ওপর সাঁতার কাটে, শরীরের স্বাভাবিক উজ্জ্বলতা হারিয়ে ফেলে;
- খাওয়া দাওয়া কমিয়ে দেয় বা একবারে বন্ধ করে দেয়, পানির ওপর ভেসে খাবি খায়;
- ফুলকার স্বাভাবিক রং নষ্ট হয়ে যায়, দেহের ওপর লাল/কালো সাদা দাগ পড়ে;
- দেহে বিজল থাকে না, দেহ খসখসে হয়ে যায়, মাছ পানির তলদেশের কোন কিছুর সাথে গাঁ ঘষতে থাকে;
- চোখ ফুলে যায় বা বাইরের দিকে বের হয়ে আসে, ঠিক মত খাদ্য গ্রহণ করে না;
- ধীর গতিতে চলাচল করে, এলোমেলোভাবে পানির উপর সাঁতার কাটতে থাকে;
- পাড়ের কাছাকাছি ভেসে থাকে, কখনও পাড়ে উঠে আসে, চিংড়ির ক্ষেত্রে খোলস নরম হয়ে যায়;
- ফুলকায় কালো দাগ দেখা যায়, খোলসের উপর নীলাভ রং বা শেওলা জমে যায়; এবং
- হাঁটার অঙ্গ এবং এন্টিনা খসে পড়ে অথবা বাঁকা হয়ে যায়।

মাছ ও চিংড়ির সাধারণ রোগ

মাছ ও চিংড়ির রোগ চিকিৎসা অত্যন্ত জটিল ও ব্যয়বহুল ব্যাপার। কারণ রোগ শনাক্তকরণ ও প্রতিটি মাছ বা চিংড়ির আলাদা আলাদাভাবে চিকিৎসা করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। তার পরও রোগক্রান্ত হয়ে পড়লে এগুলোর চিকিৎসা বা রোগের প্রতিকার করা জরুরী হয়ে পড়ে । নিচে মাছ ও চিংড়ির কিছু সাধারণ রোগ ও এগুলোর প্রতিকার ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করা হলো:

ক্ষত রোগ

অভ্যন্তরীণ জলাশয়ের অধিকাংশ মাছ এ রোগে আক্রান্ত হয়। সাধারণত শীত মৌসুমে এ রোগের সংক্রমণ বেশি হয়। এখন পর্যন্ত এ রোগের সুনির্দিষ্ট কারণ জানা যায়নি। তবে দূষিত পরিবেশে ছত্রাকের আক্রমণে এ রোগের সংক্রমণ ঘটে বলে ধারণা করা হয়।

লক্ষণ

- ত্বকে লাল দাগ ও ক্ষতের সৃষ্টি হয় ও ক্ষতস্থানে রক্তক্ষরণ হতে দেখা যায়;
- ঘাঁ আস্তে আস্তে সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে পড়ে;
- অনেক সময় লেজ খসে পড়ে ও অস্বাভাবিকভাবে সাঁতার কাটে।
- খাদ্য গ্রহণ কমিয়ে দেয়।

কারণ- Aphynomyces bvgK Fungus এর আক্রমেণে এ রোগ হয়। পরবর্তীতে ব্যাকটেরিয়া আক্রমণ করে।

প্রতিরোধ শীতের শুরুতে ১ কেজি/শতাংশ হারে পুকুরে চুন প্রয়োগ এবং পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখলে এ রোগ সাধারণত হয় না।

প্রতিকার

২-৪ পিপিএম পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট দ্রবণে ১ মিনিট গোসল

১২৫ পিপিএম ফরমালিন দ্রবণে মাছকে গোসল করানো (যতক্ষণ সহ্য করতে পারে)।

কপারসালফেটের (CuSO4 5H2O) ১ পিপিএম দ্রবণের পানিতে গোসল করাতে হবে।

পুকুরে ১ পিপিএম হারে পটাশ প্রয়োগ করা যেতে পারে।

পুকুরের পরিবেশ উন্নয়নের জন্য শতাংশে ২৫০ গ্রাম হারে চুন বা ১০০ গ্রাম হারে জিওলাইট প্রয়োগ করা যেতে পারে।

লেজ ও পাখনা পচা রোগ

এ রোগ সাধারণত অ্যারোমোনাস ও মিক্সো- ব্যাকটেরিয়া দ্বারা সংঘটিত হয়ে থাকে। কার্পজাতীয় মাছে আক্রমণ বেশি হলেও মাঝে মাঝে পাঙ্গাশ মাছেও এ রোগ দেখা যায়। সাধারণত গ্রম্মি ও বর্ষাকালে মাছ এ রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে।

লক্ষণ

- মাছের দেহ ঘোলাটে বর্ণ ধারণ করে;
- ত্বকের পিচ্ছিলতা কমে যায়, প্রাথমিক পর্যায়ে লেজ ও পাখনায় লাল দাগ দেখা যায়;
- পাখনার পর্দা ছিঁড়ে যায় এবং আস্তে আস্তে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।

প্রতিরোধ: পুকুরে ১ কেজি /শতাংশ হারে চুন প্রয়োগ ।

প্রতিকার: ২.৫ % লবণ পানিতে ২-৩ মিনিট বা ২-৪ পিপিএম পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট দ্রবণে ১ মিনিট গোসল করানো যেতে পারে।

ড্রপসি (পেটফুলা রোগ)

ব্যাকটেরিয়া দ্বারা এ রোগের সংক্রামণ হয়ে থাকে। সরপুঁটি,গ্রাসকার্প, সিলভারকার্প ও শিং-মাগুরজাতীয় মাছে এ রোগ বেশি সংক্রমিক হতে দেখা যায়। সাধারণত শীতের প্রাক্কালে ও শীতকালে এ রোগ বেশি হয়ে থাকে।

লক্ষণ: রোগাক্রান্ত মাছের পেট ও আঁইশের নিচে পানি জমে। মাছের পেট ফুলে বেলুনের মত আকার ধারণ করে। চামড়ায় ঘা হয় ও অন্ত্র ফুলে যায়। আঁইশ আলগা হয়ে যায়।

প্রতিরোধ

- সুষম খাদ্য প্রয়োগ
- জৈব সার কম দেয়া
- প্রতি শতাংশে ১ কেজি হারে চুন প্রয়োগ

প্রতিকার

- প্রতি কেজি খাবারে ২৫০ মি.গ্রাম রেনাভেট মিশিয়ে ৪-৭ দিন খাওয়ানো

আরগুলোসিস (মাছের উকুন)

সব ধরনের মাছে এ রোগ হতে পারে। সাধারণত মাছের পাখনা ও আঁইশের ফাঁকে আরগুলাস নামক এক প্রকার পরজীবী দ্বারা মাছ আক্রান্ত হয়। গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে আরগুলাসের আক্রমন বেশি হয়ে থাকে।

লক্ষণ

- মাছ অবিরাম ছোটাছুটি করতে থাকে
- মাছের গায় এ পরজীবী লেগে থাকতে দেখা যায় খালি চোখেই
- মাছ শক্ত জিনিসের সঙ্গে গা ঘষতে থাকে
- দেহের বিভিন্ন স্থানে লাগ ক্ষতের সৃষ্টি হয়

প্রতিকার

- ১০ লি. পানিতে ২০০ গ্রাম লবণ মিশিয়ে ঐ দ্রবণে মাছকে গোসল করানো;
- পুকুরে ৬-১২ গ্রাম /শতাংশ /ফুট হারে ডিপটারেক্স পর পর ৩ সপ্তাহ প্রয়োগ অথবা
- সুমিথিয়ন ২-৩ মিলি/শতাংশ /ফুট হারে পর পর ৩ সপ্তাহ পুকুরে প্রয়োগ ।

প্রতিরোধ: প্রতি শতাংশে ১ কেজি হারে চুন প্রয়োগ, আক্রান্ত পুকুরে ব্যবহৃত জাল অন্য পুকুরে ব্যবহার না করা।

পুষ্টির অভাবজনিত রোগ

পরিমিত খনিজ লবণ ও ভিটামিনের অভাবে মাছের দেহে বিভিন্ন প্রকার রোগ বালাই হতে দেখা যায়।

লক্ষণ: দেহ বেঁকে যায় ও লেজের অংশ বেঁকে যায়।

প্রতিকার: দেহ বা লেজ বেঁকে গেলে কোন প্রতিকারের উপায় নেই।

প্রতিরোধ: সুষম খাদ্য বিশেষ করে খনিজ লবণ ও ভিটামিন সমৃদ্ধ খাদ্য সরবরাহ করার মাধ্যমে এ রোগ প্রতিরোধ করা যায়।

পাংগাস মাছের রোগ ও রোগ ব্যবস্থাপনা:

ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ- শীতের সময় যখন পানির তাপমাত্রা কমে যায়। বিশেষ করে মাছের আকার ১০০-১৫০ গ্রামের মাঝে থাকে। খুবভাল করে লক্ষ করলে দেখা যাবে মাছের নাভির চারিদিকে ত্বকের স্তর ক্ষয় হয়ে গেছে।

লক্ষণ:

- প্রথমে চোখের অভ্যন্তরে রক্তক্ষরণ
- মুখ ও পায়ু পথ আক্রান্ত হয়ে লাল হয়।
- সম্পূর্ণ শরীরে শ্লাইম দেখা দেয়।
- পানির উপরে অস্বাভাবিকভাবে সাঁতার কটতে দেখা যায়।
- হঠাৎ মাছ মারা যায়।

কারণ: পানি দূষণের কারণে Aeromonus ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণে এ রোগ হয়।

প্রতিকার: পুকুরের তলদেশে জৈব পদার্থ দূর করার জন্য ২৫০ গ্রাম হারে চুন প্রয়োগ করতে হবে। মাছের খাদ্যের সাথে অক্সিটেট্রাসাইক্লিন (প্রতি কেজি খাবারের সাথে ১০ গ্রাম) মিশিয়ে ৪-৫ দিন খাওয়াতে হবে।

মাছের গায়ে চাক চাক দাগ হওয়া: অধিক ঘনত্বে মাছ চাষ করলে পুকুরের পানির পরিবেশ খারাপ হওয়ার কারণে পাংগাস মাছের গায়ে চাক চাক দাগ হতে দেখা যায়। মাছের শরীরে অন্য অংশের বর্ণ এ স্থানের তুলনায় ভিন্ন হওয়ায় মাছ বিক্রয়ে সমস্যা হয়।

প্রতিকার: পুকুরে খাদ্য লবণ (NaCl) শতাংশে ৫০০ গ্রাম হারে ব্যবহার করে এ সমস্যা দূর করা যায়।

গুলশা মাছের রোগ ও রোগ ব্যবস্থাপনা

পাখনা ও লেজ পচা রোগ

গুলশা মাছে পাখনা ও লেজ পচা রোগ হলে অক্সিটেট্রাসাইক্লিন (OTC) গ্রুপের লিকুইড এন্টিবায়োটিক ২০০ মিলি/৩৩ শতাংশ (৩-৫ ফুট পানিতে) পর পর ৩দিন প্রয়োগ করতে হবে (এন্টিবায়োটিক উইথড্রয়াল পিরিয়ড ২১দিন)।

ব্যাকটেরিয়াজনিত ক্ষত রোগ

লক্ষণ:

- বক্ষ পাখনা, পিঠ ও পেট অঞ্চলে গুলশা মাছে লালচে ক্ষত দেখা যায়।
- বারবেল ক্ষয় পেতে থাকে ও এক পর্যায়ে খসে যায়।
- চোখেও লালচে ক্ষত দেখা যায়।
- লেজের দিকে লাল লাল র‍্যাশ দেখা যায়।

রোগ সৃষ্টির কারণ: এ্যারোমোনাস ও মিক্সোব্যাকটার গ্রুপের ব্যাকটেরিয়াসমূহ এই রোগ সৃষ্টির জন্য দায়ী।

প্রতিকার:

- ব্লিচিং পাউডার (৩০% ক্লোরিন সমৃদ্ধ) ১০-১২ গ্রাম/শতাংশ/৩-৪ ফুট পুকুরে প্রয়োগ করা যায়।
- ক্ষত দূরীকরণে অক্সিটেট্রাসাইক্লিন (OTC) গ্রুপের পাউডার ৩-৫ গ্রাম প্রতি কেজি খাদ্যে ৩-৫ দিন ব্যবহার করা যায় অথবা উপযুক্ত এন্টিবায়োটিক প্রয়োজনীয় মাত্রায় ব্যবহার করা যায়(এন্টিবায়োটিক উইথড্রয়াল পিরিয়ড ২১দিন)।

ভিটামিনের অভাব এবং অপুষ্টিজনিত রোগ

রোগের লক্ষণ ও কারণ

- ➢ চর্বিতে দ্রবণীয় ভিটামিন এ, ডি এবং কে-এর অভাবজনিত কারণে মাছের অন্ধত্ব এবং হাড় বাঁকা রোগ দেখা দেয়;
- ➢ ভিটামিন বি-এর অভাবে মাছের ক্ষুধামন্দা, স্নায়ু দুর্বলতা, রক্তশূন্যতা এবং ত্বক ও ফুলকার উপর ক্ষতের সৃষ্টি হতে পারে;
- ➢ এছাড়া মাছের খাবারে হজমযোগ্য আমিষের অভাবে মাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত করে। এতে মাছ পীড়িত ও অস্থির বোধ করে এবং অচিরেই রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে।

চিকিৎসা :

- ➢ প্রতি কেজি খাদ্যের সাথে ২-৩ গ্রাম হারে ৫-৭ দিন মাল্টিভিটামিন খাওয়ানো যেতে পারে।

গুলশা মাছের ভাইরাসজনিত রোগ

লক্ষণ: গুলশা মাছ ভাইরাসে আক্রান্ত হলে সম্পূর্ণ পুকুরে মারাত্মকভাবে সংক্রমণ ছড়িয়ে যায় ও দুই থেকে তিন দিনের মধ্যে ব্যাপক হারে মৃত্যু ঘটে। এ ধরণের সংক্রমণে সাধারণত বিশেষ বহ্যিক কোন লক্ষণ প্রকাশ পায় না।

প্রতিরোধ: ভাইরাসজনিত রোগ প্রতিরোধে পুকুরের স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ বজায় রাখতে হবে। পুকুরের পাড় পরিষ্কার রাখতে হবে। পুকুরের কোন অবস্থাতেই ময়লা-আবর্জনা ফেলা যাবে না, মল-মূত্র ত্যাগ করা যাবে না। পুকুরে কোন প্রাণি বা পাখির বিষ্ঠা ব্যবহার করা যাবে না। রোগের যাবতীয় বাহক যেমন: বাইরের মাছ, মানুষ, গরু, ছাগল, পাখি, পোকা-মাকড়, কাঁকড়া, সাপ, ব্যঙ ইত্যাদির দ্বারা রোগ যেন ছড়াতে না পারে সে ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। পুকুরের সাথে নদী-নালা, খাল-বিল বা কোন নর্দমার সংযোগ দেওয়া যাবে না। পরিমিত ও সুষম খাদ্য ব্যবহার করতে হবে। প্রতি ১৫-২০ দিন পর পর জীবাণুনাশক ও জিওলাইট ব্যবহার করে পুকুরের পানির পরিবেশ ভালো রাখতে হবে। সঠিক মজুদ ঘনত্ব বজায় রেখে মাছকে পীড়নমুক্ত রাখতে হবে।

শিং মাছের বিশেষ কিছু রোগ ও প্রতিকার

১) **ব্যাক্টেরিয়া জনিত রোগ:** সাধারণত অধিক ঘনত্বে মাছ চাষ করলে এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাবার প্রয়োগ করলে অব্যবহৃত খাদ্য ও জৈব পদার্থ পুকুরের তলদেশে জমে পঁচনের ফলে পানি দূষিত হয়। দূষিত পরিবেশে ব্যাক্টেরিয়া দ্রুত বংশ বিস্তার করে। ব্যাক্টেরিয়াজনিত রোগ সাধারণত সংক্রামক রোগ।

লক্ষণ

- ❖ লেজ ও পাখনায় সাদা দাগ দেখা যায়;
- ❖ লেজ ও পাখনায় পঁচন ধরে এবং ধীরে ধীরে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়;
- ❖ রং ফ্যাকাশে হয়ে যায়;
- ❖ ফুলকা ফুলে যায়, ফ্যাকাশে হয় ও পঁচে যায়।

প্রতিকার

- ❖ ১-২ পিপিএম হারে পটাশিয়াম পারমেঙ্গানেট পুকুরে প্রয়োগ করতে হবে;
  (বি: দ্রঃ সম্পুরক খাদ্য দিয়ে মাছ চাষ করলে সে পুকুরে পটাশ প্রয়োগ না করায় উত্তম)
- ❖ প্রতি কেজি খাবারের সাথে ১০ গ্রাম OTC (Oxytetracyclene) ৪-৫ দিন দিতে হবে। এর পাশাপাশি খাবারের সাথে ভিটামিন সি প্রয়োগ করতে হবে। এখানে উল্লেখ্য যে কোন এন্টিবায়োটিক প্রয়োগ পর তার উড্রোল পিরিয়ড পার করে মাছ বাজারে পাঠাতে হবে। এ ক্ষেত্রে ২১ দিন পরে মাছ বাজারে পাঠাতে হবে।

২) শিং মাছের মুখে ও কাটায় সাদা দাগ রোগ:

লক্ষণ: সাধারণত শিং মাছ চাষে এ রোগ প্রায়ই দেখা যায় এবং চাষে বেশ ক্ষতি সাধিত হয়। এ সময় মাছ উলম্বিকভাবে পানির উপরের স্তরে ভেসে থাকে। খুব ভাল করে পর্যবেক্ষণ করলে মাছের মুখে এবং দুপাশের কাটার গোড়ায় সাদা দাগ দেখা যায়। প্রতি দিন কিছু মাছ মারা যায় এবং পুকুরের তল দেশে জমতে থাকে। এ রোগ দেখা দিলে চাষি মাছ চাষে বেশ ক্ষতির সম্মূখিন হয়ে থাকে।

প্রতিকার: খাবারের সাথে OTC (Oxytetracyclene) ৪-৫ দিন দিতে হবে। এর পাশাপাশি খাবারের সাথে ভিটামিন সি প্রয়োগ করতে হবে। পুকুরে পানিতে জীবাণু নাশক প্রয়োগ করতে হবে। এখানে উল্লেখ্য যে, কোন এন্টিবায়োটিক প্রয়োগ পর তার উড্রোল পিরিয়ড পার করে মাছ বাজারে পাঠাতে হবে। এ ক্ষেত্রে ২১ দিন পরে মাছ বাজারে পাঠাতে হবে।

চিংড়ির রোগ ও তার প্রতিরোধ এবং প্রতিকার

প্রত্যেক জীবেরই রোগবালাই হতে পারে। চিংড়িরও রোগবালাই হয়ে থাকে। সাধারণতঃ রোগবালাই জনিত কারনেই চিংড়ির অধিক মড়ক হয়। চিংড়ির যে কোন রোগের জন্য বহুবিধ কারণ রয়েছে। পরিবেশগত এবং রোগজীবানুজনিত কারনে তা হতে পারে। যে কোন কারনে উদ্ভুত রোগবালাই'র জন্য রয়েছে প্রয়োজনীয় প্রতিরোধ ও প্রতিকারের ব্যবস্থা।

রোগের উৎসঃ

চিংড়ি তার পরিবেশ এবং রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণুর ভারসাম্যহীনতাই রোগসৃষ্টির মূল কারণ। চিংড়ির রোগের প্রধান ৩টি উৎস হলো ১. পরিবেশ, ২. রোগ জীবানু (পরজীবিসহ) এবং ৩. চিংড়ি অর্থাৎ রোগজীবানুর পোষক (Host)।

চিংড়ির স্বাস্থ্য ও বৃদ্ধি পর্যবেক্ষণঃ

একটি স্বাভাবিক চিংড়ির পর্যবেক্ষণ করলে নীচের বৈশিষ্ট্য সমূহ সহজে দেখা যায়;

- শরীরের রং সবুজাভ ধুসর, স্বচছ এবং পা সমূহ স্বাভাবিক, সম্পূর্ণ ও পরিস্কার;
- খোলস পরিস্কার, ক্ষতহীন, চকচকে ও সম্পূর্ণ এবং খোলস নরম নয় ও স্বাভাবিক চাপে ভেঙ্গে যাবে না;
- হেপাটোপেনক্রিয়াস হলদে ও আকৃতি স্বাভাবিক এবং ফুলকা স্বাভাবিক পরিস্কার, উজ্জল ও পানির ন্যায় স্বচছ।
- পা, খোলস বা দেহের কোন অংশে কালো দাগ থাকবে না এবং চোখ দৃঢ়, উজ্জল ও দু পার্শ্বে ছড়ানো;
- খাদ্যনালী পরিপূর্ণ ও স্বাভাবিক;
- জীবিত ও সদ্য ধৃত চিংড়ির দেহের মাঝামাঝি দু আঙ্গুলে ধরলে লেজ ও মাথা অঞ্চলের অঙ্গসমূহ ছড়িয়ে রাখে।

চিংড়ি রোগ প্রতিরোধ ও প্রতিকারঃ

চিংড়ি অত্যন্ত স্পর্শকাতর জলজ জীব। পরিবেশের সামান্যতম তারতম্যের কারনে চিংড়ি অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে। যে কোন এক বা একাধিক অবস্থার দ্রুত তারতম্যে চিংড়ি মারাও যেতে পারে। সেক্ষেত্রে তাৎক্ষণিক প্রতিকার সহজসাধ্য নয়। চিংড়ির রোগ প্রতিরোধে বায়োসিকিউরিটি মেনে চললে অনেকাংশে চাষি সম্ভাব্য ক্ষতি থেকে রক্ষা পাবেন।

চিংড়ি চাষ ব্যবস্থাপনায় নিরাপদ চিংড়ি উৎপাদনে বায়োসিকিউরিটি অত্যবশ্যকীয় অনুসরনীয় কৌশল।

চিংড়ি খামারে বায়োসিকিউরিটি বাস্তবায়ন পদ্ধতি

খামারের পুকুরে তলা ও পাড়ের মাটি জীবানুমুক্তকরণ

১. তলার কালো কাদা অবশ্যই অপসারন করতে হবে।

২. চুন বা ব্লিচিং পাউডার দিয়ে তলা ও পাড় জীবনুমুক্ত করতে হবে।

রোগমুক্ত পোনা মজুদ

১. পোনা পরিবহন সময় ৬ ঘন্টার কম হতে হবে;

২. প্রাকৃতিক উৎসের পোনা ব্যবহার না করে এসপিএফ/এসপিআর অথবা পিসিআর পরিক্ষীত পোনা ব্যবহার করা উচিত।

৩. ১০০ পিপিএম এ্যায়ারেটেড ফরমালিন দ্রবনে ১৫-২০ মিনিট পোনা রেখে দূর্বল পোনা আলাদা করা যেতে পারে।

৪. ৩০-৪৫ দিন পোনা নার্সারী করে মজুদ পুকুরে ছাড়া উচিত;

৫. পোোনা মজুদকালে পানিতে পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক খাদ্য থাকতে হবে এবং অনুকূল পরিবেশে পোনা অবমুক্ত করতে হবে।

নিরাপদ পানির ব্যবহার

১. কেবলমাত্র দুষণ মুক্ত নিরাপদ উৎসের পানি ব্যবহার করতে হবে। পানি উঠিয়ে পৃথক পুকুরে থিতিয়ে এবং শোধন করে ৭-১০ দিন পর পোনা মজুদ পুকুরে দিতে হবে।

২. এক ঘেরের পানি অন্য ঘেরে ব্যবহার করা যাবে না ও এক ঘেরের পানি যাতে অন্য ঘেরে চুইয়ে না যায় সেটিও খেয়াল রাখতে হবে।

চাষকালীন অনুসরনীয়:

১. প্রতিদিন পুকুরের পানির রং পর্যবেক্ষণ এবং পুকুরে প্রাকৃতিক খাদ্যে উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে কারন রোগ নিয়ন্ত্রণে এটি গুরুত্বপূর্ণ;

২. সাপ্তাহিক চিংড়ির বৃদ্ধি এবং বাঁচার হার পরীক্ষা করতে হবে;

৩. খাদ্য নালীতে খাদ্যের উপস্থিতি ও রং পরীক্ষা করতে হবে, এ সংক্রান্ত একটি তালিকা নিম্নে প্রদান করা হল:

খাদ্য নালীর রং	সম্ভাব্য খাদ্য উপাদান	সম্ভাব্য কারন
কালো, কালো-বাদামী	তলার কাদা, তলার পঁচা জৈব পদার্থ	অপর্যাপ্ত খাদ্য/মাত্রাতিরিক্ত খাদ্য প্রয়োগ
বাদামী	প্রয়োগকৃত খাদ্য	স্বাভাবিক
লাল, হালকা গোলাপি	মৃত চিংড়ির দেহাবশেষ	রোগ সংক্রমনের সম্ভবনা
সবুজ	তলার শেওলা বা উদ্ভিদের দেহাবশেষ	অপর্যাপ্ত খাদ্য
ফ্যাকাশে সাদা/খাদ্য নালী আংশিক পূর্ণ	শূন্য অথবা আংশিক পূর্ণ	রোগ সংক্রমনের সম্ভাবনা

বায়োসিকিউরিটি বাস্তবায়নে সাধারন সতর্কতা

১. পুকুরের চারিদিকে বেড়া দিয়ে গৃহপালিত পশুপাখি এবং বন্য প্রাণির প্রবেশ ও বিচরণ বন্ধ করতে হবে;

২. পুকুরের চারপাশে এবং উপরিভাগে জাল দিয়ে ঘিরে রাখতে হবে;

৩. পুকুরের পাড়ে বা খামারের পাশে পাখি আশ্রয় নিতে পারে এমন গাছ রাখা উচিত নয়;

৪. অনুমতি ব্যতিরেকে সাধারণের প্রবেশ নিষিদ্ধ করা;

৫. বিভিন্ন পরিবহনযানের মাধ্যমে বা খাদ্য এবং খাদ্য উপকরণের সাথে রোগজীবাণূ অনুপ্রবেশ বন্ধের ব্যবস্থা করা;

৬. বাহির থেকে খামারে প্রবেশের পূর্বে ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা এবং ব্যবহৃত পোষাকাদি জীবানুমুক্ত করে প্রবেশ করা উচিত;

৭. উচ্চ লবনাক্ততা এবং পিএইচ (>৮.৫) নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে;

৮. সবুজ পানি রোগ সংক্রমনের সম্ভবনা কমায় এজন্য মজুদ পুকুরে প্রাকৃতিক খাদ্যের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে;

৯. নিয়মিত পুকুরে চুন প্রয়োগ করতে হবে, বিশেষত: পানি পরিবর্তনের এবং বৃষ্টির পরে;

১০. মজুদ পুকুরে ক্ষতিকর রাসায়নিক ও এ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার থেকে বিরত থাকতে হবে তবে মজুদ পুকুরে প্রয়োজনে প্রোবায়োটিক ব্যবহার করা যেতে পারে;

১১. নিয়মিত খাদ্য ট্রে পরীক্ষা এবং খাদ্য গ্রহনের হার পর্যবেক্ষণ করতে হবে;

১২. প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নিয়মিত তলার শেওলা পরিস্কার করতে হবে;

১৩. প্রয়োজন না হলে পানি পরিবর্তন করা উচিত নয়, পানির গভিরতা সব সময় ৩-৫ ফুট রাখতে হবে;

১৪. সাপ্তাহিকভাবে তলার কাদার গন্ধ এবং রং পরীক্ষা করতে হবে;

১৫. মৃত বা রোগাক্রান্ত চিংড়ি উন্মুক্ত পরিবেশে না ফেলে তা শোধন করে মাটিতে পুঁতে ফেলতে হবে;

১৬. আহরণ অত্যাবশ্যক হলে দ্রুত আহরনের ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে; এবং

১৭. রোগাক্রান্ত ঘেরের পানি উন্মুক্ত পরিবেশে না ছেড়ে তা অন্য পুকুরে রেখে শোধন করে ব্যবহার করতে হবে।

চাষ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/কর্মীদের স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতা:

১. খামারের কর্মী ছোঁয়াচে রোগে আক্রান্ত হলে, হাতে ক্ষত বা ঘাঁ থাকলে তাকে চিংড়ি ধরা/পরিচর্যায় নিয়োজিত না করা;

২. খামারে কর্মরত সকলের সংক্রামক ব্যাধি নেই মর্মে চিকিৎসকের ছাড়পত্র সংগ্রহ করে খামারে সংরক্ষণ;

৩. কর্মীদের ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি খাদ্য নিরাপত্তা ও পরিস্কার: পরিচ্ছন্নতার বিষয়ে প্রশিক্ষণ থাকতে হবে;

৪. কর্মীদের আহার ও বিশ্রামের আলাদা কক্ষ থাকতে হবে।

বায়োসিকিউরিটি একটি সমন্বিত প্রক্রিয়া। উৎপাদন প্রক্রিয়ার সকল ধাপে এবং সঠিক সময়ে এর বাস্তবায়ন ব্যতিত চিংড়ি ঘেরের বায়োসিকিউরিটি নিশ্চিত করা সম্ভব নয়।

রোগ প্রতিরোধের উপায়সমূহ:

নিম্ন বর্ণিত পদক্ষেপ/ব্যবস্থা গ্রহণ করলে চিংড়ি আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা কমে যাবে।

ক. মজুদ পূর্ব পদক্ষেপ -

- হ্যাচারী হতে সুস্থ সবল ও রোগমুক্ত পোনা সংগ্রহ করতে হবে এবং রোগাক্রান্ত ও দূর্বল পোনা মজুদ না করা।
- পোনা যথাযথ টেকসই করে ছাড়া এবং অবাঞ্চিত প্রাণীর অনুপ্রবেশ বন্ধ করা।

খ. মজুদ পরবর্তী প্রতিরোধ ব্যবস্থা

- প্রতিবার ছেঁকে পানি তুলে ঘেরে/খামারে ক্ষতিকর প্রাণীর অনুপ্রবেশ নিয়ন্ত্রণ, অতিরিক্ত পচনশীল পদার্থ থাকলে তা তুলে ফেলা এবং পানির গভীরতা ১ মিটারের উপরে রাখা;
- প্লাংকটন উৎপাদন নিয়ন্ত্রনে রাখা, সঠিক মাত্রায় খাবার প্রয়োগ করা ও নিম্নমানের খাবার প্রয়োগ থেকে বিরত থাকা;
- পরিমিত চুন প্রয়োগ করে পানির পিএইচ ও রোগজীবানু নিয়ন্ত্রণ;
- ঘোলাটে কিম্বা দূষিত পানি ঘেরে প্রবেশ করানো থেকে বিরত থাকা, সময়মত, পরিমিত পানি পরিবর্তন ও রোগে আক্রান্ত হলে ঘেরে পানি পরিবর্তন থেকে বিরত থাকা;
- বিকল্প শস্য উৎপাদনের মাধ্যমে মাটির উর্বরতা ধরে রাখা;
- সময়মত চিংড়ি আহরণ এবং প্রতি ৩-৫ বৎসর অন্তর ১-২ বৎসর চিংড়ি চাষে বিরত থাকা।

চিংড়ির গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি রোগ, রোগের কারণ/লক্ষণ, প্রতিকার ও প্রতিরোধ ব্যবস্থাপনা:

রোগের নাম, কারণ ও লক্ষণ	চিকিৎসা/প্রতিকার	প্রতিরোধ	মন্তব্য
হোয়াইট স্পট বা চায়না ভাইরাস রোগঃ চিংড়ি পোনা ঘেরে ছাড়ার ৩০-৭০ দিনের মধ্যে এ রোগ দেখা দিতে পারে। প্রথম দিকে রোগের কোন বাহ্যিক লক্ষণ দেখা যায় না। ৩-৪ দিন পর রোগের তীব্রতা বৃদ্ধি পায়। চিংড়ি পাড়ের কাছে জমা হয় এবং গায়ে, মাথায়, খোলসে সাদা স্পট দেখা যায় এবং রং নীলাভ বা লালচে হয়ে যায়। খাদ্য গ্রহণ করে না, ৪/৫ দিনের মধ্যে ব্যাপক হারে মারা যায়। শিরোবক্ষ ও অগ্নাশয় গ্রন্থি স্ফীত হয়। মে-জুন মাসে সাধারণত এ রূপ মড়ক দেখা দেয়।	তেমন কোন চিকিৎসা নেই। পানির গুণগত মান উন্নত করতে হবে।	ঘেরের তলদেশের পঁচা কাঁদা মাটি তুলে ফেলতে হবে। চুন ও সার দিয়ে জমি প্রস্তুত করতে হবে। পরিমাণমত সুস্থ্য সবল পোনা ছেড়ে নিয়মিত পরিচর্যা করতে হবে। অন্য রোগাক্রান্ত খামারের পানি যাতে ঘেরে প্রবেশ করতে না পারে সেদিকে সর্তক দৃষ্টি রাখতে হবে। প্রয়োজনীয় এবং উন্নত পানি ব্যবস্থাপনা এ রোগ প্রতিরোধে অন্যতম প্রধান উপায়।	গলদা চিংড়ির হোয়াইট স্পট রোগের কোন রিপোর্ট এ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। পিসিআর দ্বারা হোয়াইট স্পট ভাইরাস রোগ সনাক্ত করা যায়।
চিংড়ির কালো ফুলকা রোগ: পুকুরের তলায় মাত্রাতিরিক্ত হাইড্রোজেন সালফাইড এবং অন্যান্য জৈব পদার্থের কারনে	পুকুরের তলদেশে হররা টেনে/দ্রুত পানি পরিবর্তনে এ রোগের উন্নতি হয়।	পুকুর প্রস্তুতকালীন সময়ে তলদেশের প্যাক মাটি তুলে ভালমত শুকিয়ে এবং	যে সকল খামারে পানি সরবরাহ ব্যবস্থা নেই সেখানে

এ রোগ দেখা যায়। ফুসোরিয়াম ও স্যাপ্রোলেগনিয়া ছত্রাক এর রোগের জীবানু। এ রোগে চিংড়ির ফুলকায় কাল দাগ হয় ও পচন দেখা যায়। খাদ্য গ্রহণে অনীহা দেখা দেয়। আক্রান্ত চিংড়ি ধীরে ধীরে মারা যায়। বড় চিংড়িতে এ রোগ বেশী হয়।	মিথাইলিন ব্লু ভাল ফল দেয়। অ্যাসকর্বিক এসিড ২০০০মিঃ গ্রাঃ/কেজি খাদ্যে মিশিয়ে খাওয়ালে ভাল ফল পাওয়া যায়।	পরিমাণমত চুন/ডলমাইট/ব্লিচিং পাউডার দিতে হবে। পুকুরের পাড়ে পাতা ঝরা গাছ কেটে ফেলতে হবে।	এ রোগের প্রাদুর্ভাব বেশী।
কাল দাগ রোগঃ এটা চিংড়ির এক মারাত্মক ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ। পুকুরের অত্যধিক জৈব পদার্থ থাকার কারনে এ রোগ হয়। চিংড়ির খোলস, লেজ ও ফুলকায় কাল দাগ হয়। খোলসের গায়ে ছিদ্র হয়। পরবর্তীতে দ্বারা আক্রান্ত হয়ে চিংড়ি মারা যায়।	দ্রুত পানি পরিবর্তন এবং প্যাডেল হুইলের সাহায্যে বায়ু সঞ্চালনে রোগের প্রকোপ কমে যায়। মিথাইলিন ব্লু (২-৫ পিপিএম) পানিতে ব্যবহার করে রোগের নিরাময় করা যায়।	পুকুরের তলার পঁচা কাঁদা মাটি তুলে ভালমত শুকিয়ে চুন ও সার দিয়ে পুকুর প্রস্তুত করতে হবে। চাষকালীন সময়ে নিয়মিত পানি পরিবর্তনসহ সুষম খাদ্য ও সার প্রয়োগ করতে হবে।	গলদা চিংড়িতে এ রোগটি বেশী দেখা যায়।
খোলস নরম রোগঃ এটি একটি সাধারণ রোগ। ক্যালসিয়াম জনিত পুষ্টির অভাবে এ রোগ হয়। অনেকে একে স্পঞ্জ রোগ বলে। পানির লবণাক্ততা কমে গেলেও এ রোগে গলদা চিংড়ি আক্রান্ত হতে পারে। খোলস বদলানোর ২৪ ঘন্টা পরও শক্ত হয় না, কম বাড়ে ও ক্রমশঃ দুর্বল হয়ে যায়।	ক্যালসিয়ামযুক্ত খাদ্য প্রয়োগ করে পুষ্টির অভাব দূর করতে পারলে এ রোগ ভাল হয়। পানিতে শতাংশে ১ কেজি পরিমাণ পাথুরে চুন প্রয়োগ ভাল ফল দেয়।	ভালমত পুকুর শুকিয়ে চুন দিয়ে চাষের জন্য প্রস্তুত করতে হবে। রোগের আক্রমন হলে বড় চিংড়ি ধরে ফেলতে হবে। খামারে পানি নিষ্কাশন ও প্রবেশের পৃথক ব্যবস্থা রাখতে হবে।	কম লবণাক্ত বাগদা ঘেরে বর্ষা মৌসুমে এ রোগ বেশী দেখা যায়।
চিংড়ির গায়ে শেওলা সমস্যাঃ বদ্ধ পানিতে অতি মাত্রায় খাদ্য প্রয়োগে সবুজ শেওলার আধিক্যের কারনে এ সমস্যা হয়ে থাকে। সাধারণত ছোট ছোট খামারে বিশেষ করে গলদা খামারের গায়ে শেওলা রোগ বেশী দেখা যায়। খোলস বদলাতে পারে না। বৃদ্ধি কম হয়। চিংড়ি ধীরে ধীরে মারা যায়।	দূষিত পানি বের করে দিয়ে নতুন পানি দিতে হবে এবং পানি সরবরাহ নিয়মিত করতে হবে। পানির প্রবাহ দিলেও বেশী উপকার হয়।	পানির গভীরতা বাড়াতে হবে। মজুদ হার কমাতে হবে। চুন, সার ও খাদ্য প্রয়োগ মাত্রা সীমিত রাখতে হবে।	শীতকালে গলদা খামারে এ রোগ বেশী দেখা যায়। এ সময় সার প্রয়োগ বন্ধ রাখতে হবে।
ব্যাকটেরিয়া জনিত রোগঃ চিংড়ি বিভিন্ন প্রকার ব্যাকটেরিয়া দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে। এর মধ্যে ভিব্রিও, সিডোমনাস, কাইটিনোভরাস এবং ফিলামেনটাস অন্যতম। আক্রমনে চিংড়ির খোলসে কাল কাল স্পট সৃষ্টি হয়। খোলস ভেঙ্গে যায়, রং পরিবর্তন, রক্তপ্রবাহ কমে যায়, লেজের অংশ ও অন্যান্য উপাঙ্গ খসে পড়ে। এতে চিংড়ির ব্যাপক মৃত্যু হয় ও উৎপাদন মারাত্মকভাবে কমে যায়।	পানি পরিবর্তন ও নিয়মিত সার চুন প্রয়োগ করতে হবে। তলদেশের পচা কাঁদা উঠিয়ে ফেলতে হবে। পানিতে মাছের খাদ্য বৃদ্ধির মাধ্যমে এ রোগের প্রতিকার করতে হবে।	ভালমত শুকিয়ে চুন, সার প্রয়োগ করে পুকুর প্রস্তুত করতে হবে এবং পানি সরবরাহ ব্যবস্থা উন্নত করতে হবে।	এন্টিবায়োটিক দ্রব্য চিংড়ি আহরণের কমপক্ষে ৩০-৪৫ দিন আগে ব্যবহার করতে হবে।
ছত্রাক রোগঃ	দ্রুত পানি পরিবর্তন পূর্বক	পুকুর/খামারের তলা ভালমত	চিংড়ির লার্ভা,

দীর্ঘ দিন পানি পরিবর্তন না করলে সাপ্রোলেগনিয়া ছত্রাক দ্বারা চিংড়ি বেশি রোগাক্রান্ত হয়। এর আক্রমনের ফলে চিংড়ির ফুলকায় ফোটা ফোটা দাগ দেখা যায়। এতে খোলস নষ্ট হয়ে যায়। হ্যাচারীতে লার্ভা, পিএল বেশী আক্রান্ত হয়।	উর্বরতা বৃদ্ধি করতে হবে।	শুকিয়ে চুন প্রয়োগ করে চাষের জন্য তৈরি করতে হবে। হ্যাচারীর যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য মালামাল ১০% ফরমালিন দ্বারা ভালমত পরিশোধন করে নিতে হবে।	পিএল এ রোগে বেশী আক্রান্ত হয়।
অপুষ্টি জনিত রোগ: চিংড়ির খাদ্যে প্রয়োজনীয় এমিনো এসিড, কোলেষ্টরল, পটাসিয়াম এবং ভিটামিন সি এর অভাবে অপুষ্টি জনিত রোগ হয়ে থাকে।	সুষম খাদ্য প্রয়োগ করতে হবে।	সম্পুরক খাদ্য সরবরাহ করতে হবে। নিয়মিত চিংড়ির স্বাস্থ্য পরীক্ষা করার ব্যবস্থা নিতে হবে।	
প্রোটোজোয়া জনিত রোগ: প্রোটোজোয়া কমেনসেলস, এপিস্টাইলিস, সিলিয়েট, গ্রগরিনস, মাইক্রোস্পোরোডিয়ান, যুথামনিয়াম ইত্যাদি প্রোটোজোয়া আক্রমণে চিংড়ির খোলস, পুষ্টিতন্ত্র, বহিঃ কঙ্কাল এবং ফুলকা ক্ষতি হয়। অস্বাস্থ্যকর পুকুরে এ রোগ দেখা দেয়। যথুমনিয়ামের তীব্র আক্রমণে চিংড়ির গায়ে সাদা সাদা পশমের স্তর জমা হয়।	পুকুরে ক্লোরিন ডাই-ফসফেট (১.১ পিপিএম) ফরমালিন (১০-২০ পিপি এম) প্রয়োগ করে অবস্থার উন্নতি করা যায়। পানি পরিবর্তন ও প্রবাহ দিলে রোগের উন্নতি হয়। ডলোমাইট ব্যবহার করে পিএইচ নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে।	খামার/পুকুরের তলদেশের বর্জ্য পদার্থ ও কাল মাটি তুলে ফেলতে হবে এবং যথুমনিয়াম আক্রমণ প্রতিরোধে পুকুর প্রস্তুতের সময় ব্লিচিং পাউডার এবং ফরমালিন ব্যবহার করলে ভাল ফল পাওয়া যায়।	ঘেরে পোনা ছাড়ার সময় ১০ পিপিএম ফরমালিন দ্বারা গোসল দিয়ে ছাড়ুন।

গলদা চিংড়ির সাধারন রোগ ও প্রতিকার এবং প্রতিরোধ

১. এন্টেনা ও সন্তরণ পদ খসে পড়া

কারণ ● ব্যাক্টেরিয়ার আক্রমন; ● চাষ এলাকায় মাটি দুষণ।

লক্ষণ: ● মজুদের ৩-৪ মাস পর এন্টেনা, সন্তরণপদ খন্ডিত অথবা ঝরে পড়তে থাকে।

প্রতিকার

- সাময়িকভাবে সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগ বন্ধ; ● সম্ভব হলে পানি পরিবর্তন।
- পিএইচ পরীক্ষা করে ২৫০-৩০০ গ্রাম/শতাংশ হারে ডলোমাইট প্রয়োগ।

২. খোলস শক্ত হয়ে যাওয়া

কারণ পরিবেশগত, পিএইচ, লবনাক্ততা, পানির রাসায়নিক গুনাগুনের তারতম্য বা তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে খোলস পাল্টায় না, শক্ত হয়ে যায়।

লক্ষণ: ● খোলস স্বাভাবিক অবস্থার চেয়ে শক্ত; ● বয়সের তুলনায় চিংড়ির কম দৈহিক বৃদ্ধি।

প্রতিকার ● পানির পরিবেশ উন্নয়ন;

- পরিবেশের যে কোন হঠাৎ পরিবর্তন যেমন- পানির উচ্চতা বৃদ্ধি অথবা রাসায়নিক সার প্রয়োগ;
- সুষম পুষ্টিকর খাদ্য নিয়মিত পরিমাণমতো প্রয়োগ করা।

৩. ক্যারাপেস ও শরীরের উপর শেওলা ও ঝিনুক জাতীয় পরজীবের সংক্রামন

কারণঃ পরিবেশগত যে কোন প্যারামিটারের তারতম্যের কারণে বিশেষ করে লবনাক্ততা বৃদ্ধির ফলে এটা বেশী হতে দেখা যায়।

লক্ষণঃ করাত ও ক্যারাপেস অংশে ধূসর রংয়ের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাথর দেখা যায়।

প্রতিকারঃ ● পুকুরের পানি পরিবর্তন; ● পানির সরবরাহ বৃদ্ধি; ● পানির গভীরতা ১ মিটারের বেশী রাখা।

৪. নরম খোলস বা স্পঞ্জের মত দেহ

চাষাবাদের মাঝামাঝি সময়ে প্রায়ই গলদা চিংড়ির মাঝে এ রোগ দেখা দেয়।

কারণঃ

- পানিতে ক্যালসিয়াম কমে যাওয়া;
- এ্যামোনিয়া ও তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়া;
- পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব;
- অনেকদিন পানি পরিবর্তন না করা।

লক্ষণ

- খোলস নরম হয়ে যায়,পা লম্বা ও লেজ ছোট হয়;
- দেহ ফাঁপা হয়ে স্পঞ্জের মত হয়।

প্রতিকার

- পুকুরে ২-৩ মাস অন্তর শতাংশ প্রতি ০.৫ কেজি হারে চুন প্রয়োগ;
- খাবারে ক্যালসিয়ামের পরিমাণ বৃদ্ধিঃ ক্যালসিয়াম বৃদ্ধির জন্য শামুক/ ঝিনুকের গুড়া প্রতি কেজি সম্পূরক খাদ্যের সংগে ৫% হারে ব্যবহার করা যেতে পারে।

৫. খোলস পাল্টানোর পর মৃত্যু

কারণঃ খাদ্যে ভিটামিন বি-কমপ্লেক্স, ফ্যাটি এসিড, প্রোটিন এবং খনিজ দ্রব্যের অভাব;

লক্ষণঃ দেহ নরম থাকে এবং রং নীলাভ হয়ে যায়; ● মৃত চিংড়ি রান্না করলে রং হালকা কমলা বর্ণ ধারণ করে।

প্রতিকারঃ খাদ্যের সংগে ৫০ মিলি গ্রাম/কেজি হারে ভিটামিন প্রি-মিক্স (এমবাভিট-জি) প্রয়োগ।

৬. গায়ে শেওলা পড়া

কারণঃ খোলস পরিবর্তন না করা ও চিংড়ির চলাফেরার গতি কমে যাওয়া।

লক্ষণঃ চিংড়ি ধরার পর সারা দেহে সবুজ অ্যালজি দেখা যায়।

প্রতিকারঃ পানি বাড়িয়ে দিতে হবে এবং রাসায়নিক সার প্রয়োগ করতে হবে।

মাছ চাষে ঝুঁকি এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা

সঠিক ব্যবস্থাপনার ওপর অধিক এবং লাভজনক উৎপাদন সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল। ভাল ব্যবস্থাপনার পরও চাষকালীন সময়ে পুকুরে বেশ কিছু কারিগরি সমস্যা দেখা দিতে পারে। ফলে মাছের কাঙ্ক্ষিত উৎপাদনে বিঘ্ন ঘটার সম্ভাবনা থাকে। এরূপ কিছু সাধারণ সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করা হলো:-

রাক্ষুসে প্রাণী ও অবাঞ্চিত মাছের প্রবেশ

পুকুর শুকানো অথবা বিষ প্রয়োগ করার পরও অনেক সময় পুকুরে রাক্ষুসে প্রাণী ও অবাঞ্চিত মাছে থেকে যেতে পারে বা বাইরে থেকে অবাঞ্চিত মাছ পুকুরে প্রবেশ করতে পারে। এতে ব্যাপকভাবে মাছের উৎপাদন কমে যেতে পারে। পাখি, জাল, বৃষ্টির পানির স্রোত বা মানুষের মাধ্যমে এরা প্রবেশ করে। তাই এ সমস্ত উৎস থেকে সতর্ক থাকতে হবে। নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে উলেণ্ঢখিত সমস্যার প্রতিকার করা যেতে পারে:

- পুকুরের পাড় ঠিকমত মেরামত করা;
- কাঁকড়া বা ইঁদুরের গর্ত থাকলে তা বন্ধ করা;
- জাল ব্যবহারের সময় সতর্কতা অবলম্বন করা, ইত্যাদি।

পানির উপর ঘন সবুজ স্তর

সাধারণত উর্বর পুকুর এ সমস্যা দেখা যায়। পুকুরে সার প্রয়োগের বা অধিক খাদ্য প্রয়োগের কারণেও এ সমস্য দেখা দিতে পারে। অতিরিক্ত শেওলার জন্য পানির রং ঘন সবুজ হয়ে যায়। ফলে রাতের বেলায় পানিতে অক্সিজেন কমে যায় এবং দিনের বেলায় পিএইচ মান বেড়ে যায়। অতিরিক্ত অক্সিজেন স্বল্পতার কারণে মাছ পানির উপরিস্তরে এসে খাবি খায়। অক্সিজেন স্বল্পতা মাছের জন্য মারাত্নক হুমকি হয়ে দাঁড়াতে পারে এবং মাছ মারাও যেতে পারে।

তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা হিসেবে পুকুরে অগভীর নলকূপের পরিষ্কার ঠান্ডা পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করা গেলে ভাল হয়। সেই সাথে পুকুরে খাদ্য ও সার প্রয়োগ সাময়িকভাবে বন্ধ রাখতে হবে। এছাড়াও কিছু সিলভার কার্পের চারা পোনা ছেড়ে জৈবিকভাবে অতিরিক্ত ফাইটো-প্লাংক্টনের উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। ধানের খড় বা কলা গাছের শুকনা পাতার সাহায্যে রশি বানিয়ে পুকুরের উপর স্তর হতে সবুজ স্তর অপসারণ করা যেতে পারে। সাধারণত বাতাসে এ সবুজ স্তর পুকুরের এক কর্ণারে জমে, সেখান থেকে পেণ্ঢটের সাহায্যে অপসারণ করা যেতে পারে।

পানির উপর লাল স্তর

অতিরিক্ত লৌহ অথবা লাল শেওলার জন্যে পানির উপর লাল স্তর পড়তে পারে। ফলে সুর্যের আলো পানিতে প্রবেশ করতে পারে না। এ জন্যে পুকুরে খাদ্য ও অক্সিজেন ঘাটতি হয়। ধানের খড় বা কলাপাতা পেচিয়ে দঁড়ি বানিয়ে পুকুরের এক প্রান্তে জড়ো করে পানির উপর তুলে ফেলতে হবে।

রাক্ষুসে প্রাণীর উপদ্রব

সাপ, ব্যাঙ, কাঁকড়া, উদ সরাসরি মাছ ও চিংড়ি খেয়ে ফেলে পুকুর বা ঘেরের উৎপাদন কমিয়ে দিতে পারে। এ সমস্ত প্রাণী নিয়ন্ত্রণে কায়িক পরিশ্রমের মাধ্যমেই করতে হয়। সাপ, ব্যাঙ, কাঁকড়া ও উদ দেখার সাথে সাথেই মেরে ফেলতে হবে। উদ নিয়ন্ত্রণে চুন ভর্তি ডিমের খোসা উদ যেখান দিয়ে আসা যাওয়া করে পুকুরের সে পাড়ে রেখে দিলে উদের উৎপাত কমে যায়। বাঁশের চাঁই ব্যবহার করে সহজেই কাঁকড়া মারা যায়। সাধারণভাবে ব্যাঙ যে সমস্ত অঞ্চলে ডিম দেয় (যেমন - পানি ও পাড়ের সংযোগ স্থলের ঘাস) সেগুলো দূর করে ফেলতে হবে। বিশেষ করে বর্ষার প্রারম্ভে নতুন পানি যাতে পুকুরে প্রবেশ করতে না পারে সেদিকে বিশেষ নজর রাখতে হবে। কারণ ব্যাঙ নতুন পানিতে ডিম ছাড়তে পছন্দ করে। এছাড়াও যে সমস্ত পুকুরের আশেপাশে জঙ্গল থাকে সেখানেই এসব প্রাণীর উপদ্রব বেশি হয় বলে চারপাশ আগাছা-জঙ্গল মুক্ত রাখতে হবে।

ঘোলাত্ব

বৃষ্টি ধোয়া পানিতে পুকুর ঘোলাটে হয়ে যেতে পারে। বিশেষ করে নতুন পুকুর এবং এটেল মাটির পুকুরে এ সমস্যা বেশি হয়। এর ফলে সূর্যের আলো পানিতে কম প্রবেশ করে, সালোক সংশ্লেষণ কম হয় ফলে অক্সিজেন সল্পতার সমস্যা হতে পারে, মাছের ফুলকার মধ্যে মাটি প্রবেশ করে মাছ মারা যেতে পারে, পানিতে মাছের খাদ্য তৈরি হয় না, মাছের প্রাকৃতিক বর্ণ নষ্ট হয়, পানি অধিক গরম হয়ে যেতে পারে, মাছের চলাচলে অসুবিধা হয়, মাছ সহজে শিকারী প্রাণীর আক্রমনের শিকার হতে পারে। ঘোলাত্ব নিয়ন্ত্রণের জন্যে নানা প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:

- শতাংশ প্রতি ১-২ কেজি হারে পোড়া চুন প্রয়োগ;
- শতাংশ প্রতি ১-২ কেজি হারে জিপসাম প্রয়োগ;
- শতাংশ প্রতি ২৫০ গ্রাম হারে ফিটকারী প্রয়োগ;
- ধানের খড় অথবা কলাগাছের খন্ডিত অংশ দেয়া; এবং
- ছাই প্রয়োগ করা।

মাছ খাবি খাওয়া

মাছ চাষের পুকুরের এটি একটি সাধারণ সমস্যা। মাছ চাষে এক মাত্র বড় সমস্যা হচ্ছে পুকুরে দ্রবিভুত অক্সিজেন স্বল্পতার সমস্যা। এ সমস্যায় পুকুরের মাছ এমনভাবে মারা যায় যা দেখে মনে হতে পারে পুকুরে বিষ প্রয়োগ করা হয়েছে। বছরের বিভিন্ন সময়ে পুকুরে এ সমস্যা দেখা যায়। বিশেষতঃ আগষ্ট-সেপ্টেম্বর এবং এপ্রিল-মে মাসে এ সমস্যায় প্রায়ই মাছ মারা যায়।

পানিতে দ্রবিভুত অক্সিজেন স্বল্পতার কারণ

- মেঘলা আবহাওয়ার কারণে পর্যাপ্ত আলোর অভাবে ফাইটোপ্ল্যাংকটনের সালোকসংশ্লেণ্ঢষণ বন্ধ থাকলে এ সমস্যা দেখা দেয়;
- রৌদ্র উজ্জল দিনে হঠাৎ বৃষ্টিতে পানি গরম হয়ে অক্সিজেন স্বল্পতা হতে পারে;
- অধিক গরমের কারণে পানির অক্সিজেন বাতাসে চলে গিয়ে সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে;
- অধিক খাদ্য প্রয়োগ করলে অব্যহৃত খাদ্য পঁচে পুকুরের পানিতে অক্সিজেন স্বল্পতা হতে পারে;
- অধিক সার প্রয়োগ করলে পুকুরের পানি অধিক সবুজ হয়ে (Phytoplanktonic Bloom) যেতে পারে এবং অক্সিজেন স্বল্পতা হতে পারে;
- পুকুরে অধিক জৈব পদার্থ যেমন গোবর প্রয়োগ করলে পঁচে অক্সিজেন সমস্যা হতে পারে;
- পুকুরে অধিক আয়রণ সমৃদ্ধ পানি প্রবেশ করালে অক্সিজেন সমস্যা হতে পারে (ফেরাস অক্সাইড হতে ফেরিক অক্সাইড উৎপাদনের কারণে পুকুরের বিদ্যমান অক্সিজেন ব্যবহৃত হওয়ায়);
- অধিক ঘনত্বে পোনা মাছ ছাড়লে এ সমস্যা হতে পারে;
- পুকুরের পানি মাটির কণা দ্বারা ঘোলা হলে এ সমস্যা হতে পারে।

পুকুরে সাধারণত ভোর বেলা অক্সিজেন স্বল্পতাজনিত সমস্যা দেখা দেয়। ভালভাবে লক্ষ করলে দেখা যাবে যে, অক্সিজেন স্বল্পতা সমস্যা সৃষ্টির প্রধান কারণ গুলো চাষি নিজেই সৃষ্টি করে থাকে। এ জন্য অক্সিজেন স্বল্পতার কারণ চাষির ভালভাবে জানার প্রয়োজন এবং কারণগুলো সৃষ্টি যাতে না হয় সে জন্য সচেতন থাকতে হবে।

পুকুরে অক্সিজেন স্বল্পতা সমস্যা হলে করণীয়

১) **পানি আলোড়িত করেঃ** অক্সিজেন সমস্যা স্বল্প আকারে দেখা দিলে বা মাছ সকালে খাবি খেতে থাকলে দ্রুত পানি আলোড়নের ব্যবস্থা করতে হবে। পানি আলোড়নের জন্য পুকুরে সাঁতার কাটার ব্যবস্থা করতে হবে। এ কাজটি পাতিল দিয়েও করা যায়। পানির উপরে বাঁশের আঘাত করেও পানি আলোড়িত করা যায়। তবে এ সময় খেয়াল রাখতে হবে যেন পানি ঘোলা না হয়ে যায়।

২) **পানি সরবরাহ করেঃ** অক্সিজেন স্বল্পতা হলে পুকুরে পৃথক উৎস হতে পানি সরবরাহ করতে পারলে সহজেই সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। পৃথক উৎস হতে পানি না দিতে পারলেও একই পুকুরের পানি দ্বারা স্রোতের সৃষ্টি করতে পারলে সমস্যা দূর হবে।

৩) **এ্যারেটর দ্বারাঃ** পুকুরে অক্সিজেন স্বল্পতা দূর করার জন্য বাজারে অনেক ধরনের এ্যারেটর পাওয়া যায়। যা পুকুরে স্থাপন করে অত্যন্ত কার্যকরভাবে এ সমস্যা দূর করা যায়।

৪) **কৃত্রিম অক্সিজেন সরবরাহকারী উপকরণ প্রয়োগঃ** বর্তমানে বাজারে কৃত্রিম অক্সিজেন সরবরাহের বিভিন্ন উপকরণ পাওয়া যায় যেমন অক্সিগোল্ড, বায়ো-অক্স। জিওলাইট বালুর সাথে মিশিয়ে (অক্সিগোল্ড এর প্রয়োগ মাত্রাঃ সাধারণ মাত্রা, একরে ২৫০-৫০০ গ্রাম; অধিক সমস্যা হলে ৭৫০-১০০০ গ্রাম) পুকুরের সমস্ত পানিতে প্রয়োগ করলে অক্সিজেন স্বল্পতার সমস্যা নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

পুকুরে এ সমস্যা নিয়মিত হলে পুকুরের তলদেশে ভালভাবে হররা টানতে হবে এবং পুকরে শতকে ২৫০ গ্রাম হারে পাথুরে চুন প্রয়োগ করতে হবে। চুন প্রয়োগ করার পরও সমস্যা আবার দেখা দিলে মাছের ঘনত্ব কমাতে হবে অর্থাৎ বড় আকারের মাছ বাছাই করে বিক্রয় করে দিতে হবে। মাছের খাদ্য দেয়া বন্ধ রাখতে হবে। এ অবস্থায় পুকুরে সার প্রয়োগ করা ঠিক হবে না।

পাংগাস চাষের ক্ষেত্রে করণীয়ঃ

অনেক কারণে পাংগাস মাছের বর্ধন কম হতে পারে। প্রধান প্রধান কারণ নিম্নে উল্লেখ করা হলঃ

পুকুরে অতিরিক্ত শামুক ও ঝিনুকঃ অধিক ঘনত্বে প্রচুর খাদ্য প্রয়োগ করা হয় সে জন্য পুকুরে প্রচুর শামুক ও ঝিনুক উৎপাদিত হয়। এদের পরিমাণ অত্যধিক বেড়ে গেলে পানির রাসায়নিক গুণাগুণ এবং মাছের খাদ্যের উপর বিরুপ প্রভাব পড়ে।

প্রতিকার: পুকুরে শুকনা নারিকেলের পাতা অথবা তালের পাতা বা বাঁশের কঞ্চির আশ্রয় স্থল দিয়ে রাখলে শামুক এসকল অবলম্বনে আটকে থাকে। এসকল উপকরণ মঝে মাঝে পানির উপর তুলে শামুক অপসারণ করা যায়। পুকুর শুকিয়ে প্রস্তুতের সময় চুনের মাত্রা একটু বাড়িয়ে দিলে শামুক ঝিনুক কম হয়।

বিভিন্ন আকারের পোনা মজুদ: পুকুরে পোনা মজুদের সময় একই সাথে পোনা না ছেড়ে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে পোনা ছাড়া বা একই সময়ে ভিন্ন ভিন্ন আকারের পোনা মজুদ করলে অনেক সময় পুকুরে ছোট বড় পোনার মজুদ হয়ে যায়। এক্ষত্রে ছোট পোনার বেচে থাকার হার কম হয়। বড়দের সাথে ছোটরা খাদ্য গ্রহণে প্রতিযোগিতায় টিকতে পারে না। এভাবে ছোট গুলো দিন দিন পিছিয়ে পড়ে এবং পুষ্টিহীনতার সম্মূখীন হয়ে বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যেতে পারে। ফলে মাছ উৎপাদন কমে যেতে পারে।

প্রতিকার: পুকুরে পোনা মজুদের সময় একই আকারের পোনা একই সাথে ছাড়তে হবে। পরে পোনা ছাড়লেও পুকুরের বিদ্যমান পোনার আকারের পোনা মজুদ করতে হবে।

পানির উপরে ঘন সবুজ স্তর: সাধারণত পাংগাস মাছ অধিক ঘনত্বে চাষ করা হয় বলে প্রতিদিন প্রচুর পরিমাণ খাবার পুকুরে দিতে হয়। এর ফলে পুকুরে পাংগাসের উচ্ছিষ্ট খাবার ও জৈবিক বর্জ্য পদার্থ অণূজীব দ্বারা পঁচনের ফলে ফাইটোপ্লাংটন উৎপাদনের জন্য সহায়ক প্রচুর পুষ্টি উপাদান পানিতে ছেড়ে দেয়। এসকল পুষ্টি উপাদান পানিতে প্রচুর পরিমাণে নীল-সবুজ শেওলা (Blue Green Algae) জন্মাতে সহায়তা করে। পংগাস মাছ এসকল শেওলা খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে না বিধায় শেওলা পুকুরে অব্যাহতভাবে জমতে থাকে এবং পুকুরে ফাইটোপ্লাংটনের ব্লুম সৃষ্টি করে এবং পানির উপরে সবুজের স্তর সৃষ্টি করে। এ সবুজ স্তর পুকুরের পানিতে সূর্যের আলো প্রবেশে বাধা সৃষ্টি করে। ফলে সালোকসংশ্লেষণ হার কমে যায় এবং পানিতে অক্সিজেনের অভাব জনিত সমস্যা সৃষ্টি করে। অধিক ফাইটোপ্লাংটন এই সবুজ স্তর এক পর্যায়ে মরতে শুরু করে এবং পুকুরের তলদেশে জমে ক্ষতিকর গ্যাসের সৃষ্টি করে জলজ পরিবেশের মারাত্মক অবনতি ঘটায়। এ কারণে পানিতে দূর্গন্ধেরও সৃষ্টি হয়। এসময় মাছের নানা প্রকার সমস্য সৃষ্টি হয়। মাছে রোগও দেখা দিতে পারে। পুকুরের পানি অধিক গাঢ় হয়ে গেলে অনেক সময় পাংগাস মাছের স্বাভাবিক বর্ণ না হয়ে কালচে রং ধারণ করতে পারে এতে মাছের বাজার মূল্যে প্রভাব পড়তে পারে।

নীল-সবুজ শেওলা যেমন Anabaina, Aphanizomenon, Mycrocystis, Oscillatoria দ্বারা সৃষ্ট Geosmin I 2-Methylisoborneol (MIB) নামক রাসায়নিক পদার্থ দ্বারা পাংগাসের শরীরে এক ধরনের খারাপ গন্ধের (Off Flavour) সৃষ্টি হয় যা মাছ রান্নার পরও দূরীভুত হয় না। কোন মাছে এধরনের সমস্যা হলে বা সন্দেহ লাগলে মাছ কাটার পরে লবণ বা সিরকার পানিতে কিছু সময় ভিজিয়ে রেখে রান্না করলে মাছের এধরনের দূর্গন্ধ থেকে মুক্তি পাওয়া যায।

প্রতিকার-সবুজ স্তর পুকুরের পানির উপরে ভেসে থাকলে মাঝে মধ্যে ঘন জাল দিয়ে বা হাপা দিয়ে টেনে পুকুরের বাইরে ফেলে দেয়া যেতে পারে। পুকুরে শতাংশ প্রতি ২৫০ গ্রাম হারে চুন ভালভাবে গুলিয়ে ভোরে পুকুরে প্রয়োগ করা যেতে পারে। নিয়মিত বিরতিতে ভাল মানের প্রোবায়টিক্স ব্যবহারে করে সুফল পাওয়া যেতে পারে। এ অবস্থায় পুকুরে কোন প্রকার সার ব্যবহার করা যাবে না।

পুকুরের তলদেশে নাইট্রোজেন ঘটিত যৌগের আধিক্য: পাংগাস মাছ চাষে আমিষ সমৃদ্ধ খাবার প্রয়োগ করায় মাছের মল ত্যাগ এবং খাবারের উচ্ছিষ্ট পানিতে পঁচে পুকুরের পানিতে নাইট্রোজেন ঘটিত জৈব পদার্থের উপস্থিতি বেড়ে যায়। ফলে পানিতে এমোনিয়া ও নাইট্রাইট যৌগের উপস্থিতি বেড়ে যায় এবং মাছ চাষে নানা প্রকার সমস্যা সৃষ্টি হয়। পুকুরের পানিতে আয়নিত এমোনিয়ার পরিমাণ বেড়ে গেলে (০.০৫ পিপিএম এর উপরে) এবং এ অবস্থায় পানির তাপমাত্রা ও পিএইচ বৃদ্ধি পেলে মাছ অধিক সংকটে নিপতিত হয়। আয়োনিত এমোনিয়ার পরিমাণ পানিতে বেড়ে গেলে মাছের ফুলকা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মাছের দেহ থেকে মূল্যবান আয়নিত খনিজ পদার্থ বেরিয়ে গিয়ে (Dehydration & Electrolyte Imbalance) মাছ দূর্বল হয়ে যায়। অনেক সময় অবস্থা বেশি খারাপ হলে মাছ মারাও যেতে পারে। নাইটোজেন ঘটিত জৈব যৌগের উপস্থিতি বেড়ে গেলে পুকুরের সার্বিক পরিবেশ নষ্ট হয়, মাছ প্রাথমিকভাবে পীড়ণ (Stress) অবস্থার সম্মখীন হবে, পানিতে ক্ষতিকর গ্যাসের প্রাচুর্যতা বৃদ্ধি পাবে, মাছের খাদ্য গ্রহণ হার কমে যাবে, খাদ্যের এফসিআর ঋণাত্মকভাবে প্রভাবিত হবে, পরিশেষে মাছের নানা প্রকার রোগ হয়ে মাছে মড়ক দেখা দিবে।

প্রতিকার-

১. পুকুরের পানি সরবরাহ- পুকুরে পানি প্রতি ১০-১৫ দিন পরপর আংশিক পরিবর্তন করতে হবে। এ কাজটি করার জন্য পুকুরের পানি কিচুটা (নুন্যতম ১০%) আগে বের করে দিতে হবে। পানি বের করে দেওয়ার সময় তলদেশের পানি বের করার চেষ্টা করতে হবে। যাতে পুকুরের তলদেশে জমে থাকা অপদ্রব্য পানির সাথে বেরিয়ে যেতে পারে। পুনরায় নতুন পানি দিয়ে সে অংশ পূরণ করতে হবে।

২. গ্যাস শোষণকারী উপাদন ও জিওলাইট ব্যবহার: পুকুরে মাছের বর্জ্য থেকে পুকরের তলদেশে যে ক্ষতিকর গ্যাস জমে তা দূর করার জন্য নিয়মিত বিরতিতে বাজারে প্রাপ্য Yucca সমৃদ্ধ উপকরণ (2gm/Dec) ব্যবহার করা যেতে পারে। এ ছাড়াও মাছচাষ চলাকালে প্রতি মাসে এক বার প্রোবায়টিক্স ব্যবহার করা যেতে পারে। এতে ক্ষতিকর গ্যাস দূর করার পাশাপাশি উপকারী ব্যাক্টেরিয়ার পরিমাণ বৃদ্ধি হবে এবং ক্ষতিকর গ্যাস রুপান্তর ঘটিয়ে পরিবেশ উন্নত করে। বাজারে বেশ কয়েকটি প্রোবায়টিক্স পাওয়া যায়। যে কোন একটি প্রোবায়টিক্স পরিমাণ মত নিয়ে ২০০ গ্রাম চিনি এবং ২০ লিটার পানিতে ১২ ঘন্টা ভিজিয়ে রেখে পুকুরে প্রয়োগ করতে হবে। এ মিশ্রণে ১০ গ্রাম অক্সিজেন সরবরাহকারী উপকরণ সোডিয়াম পার কার্বনেট ব্যবহার করা যেতে পারে। সৃষ্ট উপকারী ব্যাক্টেরিয়া পুকুরের তলদেশের জৈব পদার্থ অপসারণ করে ক্ষতিকর রাসায়নিক যৌগের রুপান্তর ঘটিয়ে পুকুরে সার্বিক পরিবেশের উন্নয়ন ঘটাবে। পাশাপাশি প্রতিমাসে একবার ১০০/গ্রাম প্রতি শতাংশে জিওলাইট ব্যবহার করা যেতে পারে। জিওলাইট ক্ষতিকর গ্যাস শোষণ করে পরিবেশ উন্নত করে।

৩. হররা টানা: পুকুরের তলদেশে NH3,H2S ইত্যাদি গ্যাস জমে থাকালে তলদেশ আলোড়িত করে দিলেও গ্যাস বের হয়ে আসে। হররা টেনে দিলে বেশ ভালভাবে গ্যাস দূর হয়ে যায়। এ কাজটি করতে হবে সূর্যের আলো ভালভাবে উঠে গেলে (১১-১২ ঘটিকায়) অর্থাৎ পানিতে পর্যাপ্ত অক্সিজেন থাকা অবস্থায়।

অগভীর পুকুরের তাপমাত্রা বৃদ্ধি: মাছের তাপমাত্রা সহনশীলতার মাত্রা খুব একটা বিস্তৃত নয়। কম গভীরতার পুকুরের পানি দিনের তাপমাত্রা হঠাৎ বেড়ে যাবার কারণে অনেক সময় পানির তাপমাত্রা বেড়ে যেতে পারে। বিশেষ করে চৈত্র বৈশাখ মাসে অতিরিক্ত খরা দেখা দিলে বা অধিক বিলম্বে বর্ষা শুরু হলে সাময়িকভাবে এ সমস্যা দেখা দেয়। পুকুরের পানি গরম হলে পানির অক্সিজেন ধারণ ক্ষমতা কমে যায় ফলে পানিতে দ্রবণীয় অক্সিজেন বাতাসে ফিরে যায় এবং মাছ চাষের পুকুরে অক্সিজেন সমস্যার সৃষ্টি করে।

প্রতিকার: পুকুরে বাহির থেকে পানি দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। পানি দেয়ার ব্যবস্থা না থাকলে পুকুরের সুবিধাজনক স্থানে তলদেশের কাদা সরিয়ে অধিকতর গভীর অংশ সৃষ্টি করতে হবে যাতে মাছ পানি গরম হলে সেখানে আশ্রয় নিতে পারে।

জলজ আগাছার বিস্তার: পাংগাস চাষের পুকুরের পানি পুষ্টি উপাদানে সমৃদ্ধ সে জন্য পুকুরে জলজ আগাছা দ্রুত বিস্তারের সম্ভাবনা থাকে। পুকরের পাড় থেকে সন্তরমান লতা জাতীয় (হেলেঞ্চা-মালঞ্চ-কলমি ইত্যাদি) জলজ আগাছা দ্রুত পুকুরে ছড়িয়ে পড়তে দেখা যায়। টোপা পানা বা ক্ষুদি পানাও পুকুরের উপরে ছেয়ে ফেলতে দেখা যায়। এর ফলে পুকুরে মাছ বিচরণ বিঘ্নিত হয়, সূর্যের আলো প্রবেশ বাধাগ্রস্থ হয়। পুকুরে মাছ শিকারী প্রাণির আশ্রয় নেয়। সার্বিকভাবে মাছ চাষে সমস্যা সৃষ্টি হয়।

প্রতিকার: নিয়মিত জলজ আগাছা পরিস্কার করে ফেলেতে হবে। অল্প থাকা অবস্থায় পরিস্কার না করলে এরা দ্রুত বিস্তার লাভ করলে বাড়তি খরচে শ্রমিক নিয়োগ করতে হয়। এতে উৎপাদন খরচ বেড়ে যেতে পারে। এ কারণে অল্প থাকা অবস্থায় চাষি নিজেই একা পরিস্কার করে ফেলাই ভাল।

পুকুরে ঘোলাত্ব সৃষ্টি হওয়া: নতুন বা এঁটেল মাটির পুকুর হলে বৃষ্টিতে পুকুরের পানি ঘোলা হয়ে যেতে পারে। আবার অনেক সময় পুকুরে কার্পিও এবং মৃগেল মাছের পরমিাণ বেশি হলে তারা পুকুরে ঘোলাত্ব সৃষ্টি করে। পানি ঘোলা হলে সূর্যের আলো পানিতে প্রবেশে বাধা সৃষ্টি হয়, সালোকসংশ্লেষণ কম হয়ে পুকুরে অক্সিজেনের অভাব জনিত সমস্যা দেখা দিতে পারে। অধিক মাটির ঘোলাত্ব হলে তা মাছের ফুলকায় মধ্যে আটকিয়ে মাছের মৃত্যুর কারণ হতে পারে। পুকুরের পানি ঘোলা হলে পুকুরে প্রাথমিক উৎপাদনশীলতা কমে যায়। মাছের স্বাভাবিক বর্ণ নষ্ট হয়। মাছের চলাচলে অসুবিধা হয়। মাছ শিকারী প্রাণী দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে। পুকুরের পানি দ্রুত গরম হয়ে যেতে পারে।

প্রতিকার: ঘোলাত্ব দূর করার জন্য নানা পদ্ধতি অবলম্বন করা যেতে পারে:

- পুকুরে শতাংশ প্রতি ০.৫-১.০ কেজি হারে চুন প্রয়োগ করা;
- পুকুরে শতাংশ প্রতি ১-২ কেজি হারে জিপসাম প্রয়োগ করা;
- পুকুরে শতাংশ প্রতি ২৫০ গ্রাম হারে ফিটকারি প্রয়োগ করা;
- ধানের খড়/কলাগাছের খন্ডিত অংশ পুকুরে দেয়া যেতে পারে তবে এগুলো পঁচে যাবার আগেই তুলে ফেলতে হবে;
- পুকুরে পর্যাপ্ত ছায়া প্রয়োগ করলেও উপকার পাওয়া যেতে পারে।

শীতের পীড়ণ(Cold Stress): পাংগাস মাছ আমদের দেশের মাছ নয়। এ মাছ উষ্ণপ্রবন এলাকার মাছ। আমাদের দেশে শীত কালে যখন তাপমাত্রা কমে যায় তখন এ মাছ পীড়ণ অবস্থার সম্মূখীন হয়ে থাকে। তাপমাত্রা বেশি কমে গেলে (১৫^{০} সে. এর নীচে) মাছ খাওয়া বন্ধ করে দেয় এবং পোনা হলে অনেক সময় মড়ক দেখা দেয়। এ সময় খাদ্য প্রয়োগে সর্তকতা অবলম্বন করতে হয়। মাছকে খাবার দিতে হবে তবে পরিমাণ মত খাবার খাচ্ছে কিনা তা পর্যক্ষেণ করতে হবে। এসময় উচ্ছিষ্ট খাবার পঁচে পুকরের পরিবেশ মারাত্মক অবনতি ঘটায়।

প্রতিকার

পুকুরের পানির গভীরতা কমাতে হবে। পুকুরে প্রতিদিন ভোরে ২-৩ ঘন্টা গভীর নলকূপের পানি দিতে হবে যাতে পুকুরের পানির তাপমাত্রা বাড়ানো যায়। ছায়া প্রদানকারী গাছের ডালপালা কেটে দিতে হবে যাতে পর্যাপ্ত সূর্যের আলো পুকুরে পড়তে পারে। পুকুরে খাদ্য প্রয়োগে সর্তকতা অবলম্বন করতে হবে।

পুকুরে অতিরিক্ত খাদ্য প্রয়োগঃ পাংগাস মাছ চাষ চলাকালে সকল সময় সমান খাবার গ্রহণ করে না। আবহাওয়া ঠান্ডা থাকলে মাছ খাবার গ্রহণ কমিয়ে দেয়। প্রতি ১০^{o} সে. তাপমাত্রা কমে গেলে মাছ প্রায় অর্ধেক খাবার গ্রহণ কমিয়ে দেয়। আবার ১০^{o} সে. তাপমাত্রা বেশির জন্য মাছ খাদ্য দ্বিগুণ গ্রহণ করে। অর্থাৎ মাছের খাদ্য গ্রহণের উপর পরিবেশের তাপমাত্রা ব্যাপক প্রভাব ফেলে। এ জন্য পুকুরে খাবার প্রয়োগের সময় এ বিষয়ে খেয়াল রেখে খাবার পরিবেশন করতে হয়। কিন্তু অনেক সময় চাষি এ বিষয়গুলো নজর না রেখেই খাবার প্রয়োগ করে থাকেন। খাদ্য প্রয়োজনের তুলনায় বেশি হলে একদিকে খাবারের অপচয় হয় অপরদিকে এ অতিরিক্ত খাবার পঁচে পরিবেশের মারাত্মক ক্ষতি করে থাকে। পুকুরে নানা প্রকার ক্ষতিকর গ্যাসের সৃষ্টি হয়। যা মাছ চাষে নানাভাবে সমস্যা সৃষ্টি করে থাকে।

পুকুরের তলদেশের কালো কাদাঃ পাংগাস মাছ অধিক ঘনত্বে পুকুরে চাষ করা হয় এবং প্রচুর খাবার ব্যবহার করা হয় এবং বারবার একই পুকুরে পাংগাস মাছ চাষ করলে পুকুরের তলদেশে কালো কাদা (Slude) জমে। যা পরবর্তীতে পুনরায় পাংগাস চাষ করলে চাষে নানা প্রকার সমস্যা সৃষ্টি হয়। বিশেষ করে পুকুরের তলদেশে ক্ষতিকর গ্যাস সৃষ্টি হয় এবং মাছে নানা প্রকার সমস্যা সৃষ্টি হয়। দেশে পাংগাস চাষে অগ্রসর জেলাগুলোতে পুকুরের তলদেশে এই কালো কাদা জমার সমস্যা দেখা দিয়েছে এবং চাষি পরিবেশগত সমস্যার মাঝে আছেন। পাংগাস মাছ চাষে এ বিষয়টিকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় রাখতে হবে।

প্রতিকার

পাংগাস মাছের একটি ফসল উত্তোলনের পর পুকুরের তলদেশর এই কালো কাদা ফসলের ক্ষেতে বা সব্জি ক্ষেতে ব্যবহার করা যেতে পারে। চীন দেশে Ecological Farming Concept-G Slude ব্যবহার করে সাথি ফসল হিসেবে সব্জি, ফল ফুল চাষে ব্যাপক সফলতা অর্জন করেছে। আমাদের দেশেও এ পদ্ধতি অবলম্বন করা যেতে পারে। এছাড়া পরিবেশগত উৎকর্ষতা সাধনেও তা ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে। পর্যায় ক্রমিক চাষের (Crop Rotetion) কার্যক্রম হাতে নিয়ে এ সমস্যা দূর করা যেতে পারে। এ উদ্দেশ্যে পাংগাস চাষের পর আবার পাংগাস চাষ না করে অন্য যে কোন মাছ যেমন তেলাপিয়া বা রুই জাতীয় মাছের মিশ্র চাষ করা যেতে পারে।

পুকুরের মাছ চাষ নিরাপদ রাখার জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারেঃ

জীবাণুনাশক প্রয়োগ (Sanitizer): পুকুরে মাছ চাষ চলাকালিন পুকুরে বিভিন্ন ক্ষতিকর রোগ জীবাণুর আধিক্য দেখা দিতে পারে যা মাছে রোগের সৃষ্টি করতে পারে। এ জন্য সর্তকতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে মাছচাষ চলাকালে নিয়মিত বিরতিতে পুকুরের পরিবেশের জীবাণু ধ্বংশ করার জন্য বাজারে প্রাপ্ত যে কোন একটি জীবাণু নাশক প্রয়োগ করা যেতে পারে। জীবাণু নাশকের পর পুকুরের তলদেশের ক্ষতিকর গ্যাস দূর করার জন্য গ্যাস শোষণ কারী ঔষধ ব্যবহার করা যেতে পারে। এর ২ দিন পরে পুকুরে ভালমানের প্রোবায়টিক্স ব্যবহার করলে পুকুরের সার্বিক পরিবেশ ভাল থাকবে এবং মাছের ভাল পরিবেশ নিশ্চিত হবে এবং খাদ্য গ্রহণে রুচির সমস্যা হবে না মাছ নিরাপদ থাকবে।

যান্ত্রিক এ্যারেটর স্থাপনঃ বর্তমানে অনেক মাছ চাষি পুকুরে অক্সিজেন ঘাটতি মোকাবেলা করার জন্য প্যাডেল হুইল এ্যারেটর ব্যবহার করছেন। এ্যারেটর কেবল অক্সিজেন সমস্যা দূর করে না আরো অনেক উপকার করে থাকে। এ ব্যবস্থা কিছুটা ব্যয়বহুল হলেও নিরাপদ। নিরাপদ ও পরিবেশ বান্ধব পরিবেশে মাছ চাষের জন্য আধুনিক প্যাডেল হুইল এ্যারেটর ব্যবহার একান্ত প্রয়োজন। সাধারণত পুকরে অক্সিজেন সরবরাহ বৃদ্ধি করা গেলে অধিক হারে মাছ চাষ করা যায় এবং অধিক উৎপাদন লাভ করা য়ায়। যে সব পুকুরে মাছের সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগ করা হয় সে সব পুকুরে বাড়তি অক্সিজেন সরবরাহ একান্ত প্রয়োজন। এ্যারেটর পুকুরের সার্বিক পরিবেশ ভাল রাখে এবং মাছের উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা রাখে।

মাছের খাদ্যে খনিজ ও ভিটামিনের পাশাপাশি এনজাইম প্রয়োগঃ পাংগাস মাছ চাষ সম্পূর্ণভাবে পুকুরের বাহির হতে খাদ্য সরবরাহের ওপর নির্ভরশীল। আমরা জানি প্রতিটি প্রাণির প্রধান খাদ্য উপাদানের পাশাপাশি কিছু অতি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান (Trace Elements) কম করে হলেও থাকতে হয় (যেমন বিভিন্ন খনিজ উপাদান এবং ভিটামিন)। সম্পূরক খাবার প্রদানে মাছ চাষে অনেক সময় খাবারের ভিতর প্রদত্ত ভিটামিন বা মিনারেলসমূহ খাদ্য কারখানায় উৎপাদনের সময় নানা পর্যায় (Different Section) পেরিয়ে আসার সময় অথবা খাদ্য সঠিকভাবে গুদামজাত না করার কারণে খাদ্যের এই ক্ষুদ্র উপাদান নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু পুকুরের মাছের নিরাপদ স্বাস্থ্যের জন্য এ ক্ষুদ্র উপাদান একান্ত জরুরী। এ কারণে বাজার থেকে কেনা সম্পূরক খাবারের সাথে মাঝে মধ্যে বাজারে প্রাপ্ত মিনারেল প্রিমিক্স, ভিটামিন প্রিমিক্স, ভিটামিন সি, বিভিন্ন এনজাইম বা এমিনো এসিড সম্পূরক খাবারের সাথে মিশিয়ে মাছকে খাওয়ালে মাছের বর্ধন যেমন ঠিক থাকে মাছের রোগের প্রাদূর্ভাবও কম হয়।

বিদ্রঃ মাসিক নিয়মিত কাজঃ পুকুরের সার্বিক জৈব নিরাপত্তার (Bio-Security) জন্য প্রথমে জীবাণুনাশক, তার এক দিন পরে গ্যাস দূরিকারক এবং তারও ২ দিন পরে যে কোন একটি প্রোবাটিক্স প্রতি মাসে রুটিন মাফিক ব্যবহার করতে হবে। মাছ চাষে কোন প্রকার সমস্যা নাই, তার পরেও মাছের চাষ নিরাপদ রাখার জন্য এ কার্যক্রম চালিয়ে যেতে হবে।

শিং মাছ চাষে বিশেষ করণীয়

শিং ও মাগুর চাষে ঋতু ভিত্তিক ঝুঁকি থাকে। সঠিক ব্যবস্থাপনা না নিলে ক্ষতি গ্রস্থ হবার সম্ভাবনা থাকে অনেক বেশী, এমনকি অনেক সময় সমস্ত চাষ ব্যবস্থা হুমকির মাঝে পতিত হতে পারে।

মাছের স্বাভাবিক রং না আসাঃ অধিক ঘনত্বে শিং ও মাগুর মাছ চাষ করলে মাছের গায়ে অনেক সময় স্বাভাবিক রং আসে না। এতে ভোক্তার কাছে মাছের গ্রহণ যোগ্যতা কমে যায়। ফলে মাছের বাজার দর অনেক সময় কম পাওয়া যায়। এ সমস্যা দূর করার জন্য পুকুরের আকার অনুযায়ী পুকুরের কয়েকটি স্থানে কচুরীপানা/কলমিলতা/মালঞ্চ-হেলেঞ্চা প্রভৃতি লতা জাতীয় জলজ উদ্ভিদের আশ্রয় স্থল দেয়া যেতে পারে। শিং-মাগুর সেখানে লুকিয়ে থাকবে এবং তার গাঁয়ের রং স্বাভাবিক রুপ ধারণ করবে। এ কাজ মাছ বিক্রয়ের ১৫-২০ দিন আগে করলেই চলবে। এছাড়া বাজারজাতকরণের আগে শিং মাছের প্রতি কেজি খাদ্যের সাথে এভেলা জিন্ক ৩-৪ গ্রাম মিশিয়ে ৪-৬ দিন খাওয়ালে মাছের স্বাভাবিক রং নিশ্চিত করা যাবে।

পাবদা ও গুলশা মাছ চাষে বিশেষ করণীয়

অ্যামোনিয়াজনিত সমস্যা

পানিতে অনায়নিত অ্যামোনিয়া ০.০২৫ মি.গ্রাম/লিটার মাত্রার চেয়ে বৃদ্ধি পেলে পানির রং কালচে ও তামাটে হয়। মাছ অস্থিরভাবে ছুটাছুটি করে হঠাৎ মারা যায়। অনায়নিত অ্যামোনিয়া মাছ চাষের জন্য অধিক ক্ষতিকারক।

অ্যামোনিয়া নিয়ন্ত্রণঃ

- পুকুরের পানি পরিবর্তন করতে হয়।
- প্রতি ৩৩ শতাংশে ইউকা প্লান্ট এক্সট্রাক্ট সমৃদ্ধ গ্যাসনিবারক ১০০ মি.লি. পুকুরে প্রয়োগ করা যেতে পারে।

পানির খরতা (Hardness) সমস্যা

পানিতে দ্রবীভূত বাই-কার্বনেট (HCO_3) ও কার্বনেট (CO_3)-এর ঘনত্বই হল ক্ষারকত্ব। এ বাই-কার্বনেট ও কার্বনেট অন্য কতগুলো উপাদনের সাথে একত্রে মিলিত আকারে থাকে। উপাদানগুলোর মধ্যে ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম অন্যতম। এসব উপাদানের ঘনত্বকে খরতা (Hardness) বলে। এগুলোকে ক্যালসিয়াম কার্বনেট ($CaCO_3$) এর পরিমাণ দিয়ে প্রকাশ করা হয়। প্রয়োজনীয় মাত্রায় খরতা (৮০-২০০মি.গ্রাম/লিটার) এর কম হলে পানিতে প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদন পর্যাপ্ত পরিমাণে হয় না ও পুষ্টি উপাদানের অসামঞ্জস্যতা দেখা যায়।

খরতা বৃদ্ধির উপায়ঃ

- মাটি ও পানির pH প্রয়োজনীয় মাত্রায় নিয়ে আসার জন্য পরিমিত চুন ব্যবহার করা প্রয়োজন।
- পুকুরে তুষের ছাই ৩-৫ কেজি প্রতি শতাংশে ব্যবহার করে ক্ষরতা বৃদ্ধি করা যায়।
- পুকুরে খরতা (Hardness) ২০-৪০ mg/L মাত্রায় থাকলে প্রতি শতাংশে ১.০-১.৫ কেজি জিপসাম/ডলোচুন প্রয়োগ করলে খরতা বৃদ্ধি পায়।

গুড এ্যাকোয়াকালচার প্রাকটিসেস

গুড এ্যাকুয়াকালচার প্রাকটিস চাষ পর্যায়ে অনুসরণীয় সেই সমস্ত কার্যাবলী যা সঠিকভাবে অনুসরণ ও বাস্তবায়ন করা হলে পণ্য হিসেবে মাছ বা চিংড়ির গুণগতমান এবং খাদ্য-নিরাপত্তার (ফুড সেফ্টি) বিষয়টি নিয়ন্ত্রণ বা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়। চাষের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতিটি ক্ষেত্রে অনুসরণীয় নিয়মগুলিকেই "গুড এ্যাকোয়াকাল্চার প্রাকটিস বা জিএপি" বলা হয়।

চাষ পর্যায়ে কার্যক্রমগুলির জন্য অনুসরণীয় গুড এ্যাকুয়াকালচার প্রাকটিস বা ভাল চাষ অভ্যাসগুলি আলোচনা করা হল:

১। **খামারের অবস্থান সম্পর্কিত গুড প্রাকটিস:**

চাষের জন্য জলাশয় নির্বাচনের সময় চাষিকে সংশ্লিষ্ট জমির অতীত ব্যবহার এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার বিষয়টি বিশেষভাবে বিবেচনা করতে হবে। কারণ জমির অতীত ব্যবহার মাটির রাসায়নিক চরিত্রে গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা রাখে। একইভাবে পানি সরবরাহ ব্যবস্থা, পশু-পাখির বিচরণ বা বায়ূ-বাহিত দূষণের (যেমনঃ রাসায়নিক স্প্রে) মত বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে আশ-পাশের পরিবেশও চাষির খামারের ওপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলতে পারে। যদি কোন মৎস্য খামার কৃষি ক্ষেত, গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগীর খামার, জনবসতি বা বস্তির সন্নিকটে অবস্থিত হয় তাহলে চাষিকে মৎস্য খামারের ওপর স্থাপনাগুলির ক্ষতিকর প্রভাবের বিষয়টি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ ও মনিটর করে স্থান নির্বাচনের বিষয়টি স্থির করতে হবে।

২। **চাষে ব্যবহৃত পানি সম্পর্কিত গুড প্রাকটিস:**

খামারের পানির মান উৎপাদনাধীন মাছ/চিংড়ির স্বাস্থ্য, গুনগতমান এবং খাদ্য-নিরাপত্তার ক্ষেত্রে একটি অত্যাবশ্যকীয় বিষয়। দূষিত পানি যেমন মাছ/চিংড়ি মৃত্যুর কারণ হয় তেমনি তা বৃদ্ধিতেও বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। দূষিত পানি উৎপাদিত মাছ/চিংড়ির দেহে ক্ষতিকর রাসায়নিকের অবশেষ (রেসিডিউ) জমা করে ও ক্ষতিকর জীবাণুর দূষণ ঘটায়।

৩। **আশ পাশের পরিবেশ সম্পর্কিত গুড প্রাকটিস:**

মাছ ও চিংড়ি খামারের আশ পাশের পরিবেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও ভাল অবস্থায় রাখলে সরাসরি আর্থিক ক্ষতির হাত থেকে যেমন রক্ষা পাওয়া যায় তেমনি নিরাপত্তা সম্পর্কিত অনেক বিপদের সম্ভাবনাকে কমিয়ে আনা যায়। চাষ পর্যায়ে অনেক সময় ভূমি ক্ষয় বা ভূমি ধ্বস ঘটে থাকে যা চাষির জন্য সরাসরি আর্থিক ক্ষতির কারণ হওয়া ছাড়াও পানিতে রাসায়নিক ও জীবাণুর দূষণ ঘটায়। জলাশয়ের চারদিকে পরিকল্পিত উপায়ে গাছ লাগালে (যেমনঃ ম্যানগ্রোভ) ভূমিক্ষয় বা ভূমিধ্বস রোধ করার পাশা পাশি জলাশয়ে রাসায়নিক ও জীবাণু ঘটিত দূষণকেও রোধ করা যায়।

৪। **স্বাস্থ্যসম্মত অভ্যাস/হাইজিন প্রাকটিস:**

মাছ বা চিংড়ি খামারে স্বাস্থ্যসম্মত অভ্যাস বলতে মূলতঃ মানুষের মল ও অন্যান্য ক্ষতিকর কার্যকলাপ থেকে উদ্ভূত রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণু নিয়ন্ত্রণ বা পশু-পাখীর মল ও বর্জ্যের সার হিসাবে ব্যবহারকে নিয়ন্ত্রণ করা বুঝায়। এক্ষেত্রে বিপদজনক বিষয়টি হল এই যে, স্তন্যপায়ী বা উষ্ণ রক্তের প্রাণীর বর্জ্য বা মল মারাত্মক রোগ সৃষ্টিকারী জীবানু বহন করে যা মাছ ও চিংড়ি খামারে বিস্তার লাভ করতে পারে। খামারে, বিশেষ করে জলাশয়ে এবং সংলগ্ন এলাকায় স্বাস্থ্যসম্মত অভ্যাস মেনে চললে পানিতে মল-মূত্রের দূষণকে ন্যূনতম পর্যায়ে রাখা সম্ভব হয়। খামারে কর্মরত লোকজনকে কোন অবস্থাতেই পুকুরের পানিতে, পাড়ে, পুকুর সংলগ্ন এলাকায়, পানির উৎস হিসাবে ব্যবহৃত হয় এমন সব জলাশয়ে (যেমনঃ নদী, খাল, ইত্যাদি) মল-মূত্র ত্যাগ করতে দেয়া যাবে না। মানুষ সহ সকল স্তন্যপায়ী প্রাণী ও উষ্ণ রক্তের প্রাণীর মলে বিভিন্ন ধরণের মারাত্মক রোগসৃষ্টিকারী জীবাণু থাকে। এ জন্য পুকুরে অপরিশোধিত মল ও বিষ্ঠাকে সার হিসাবে ব্যবহার চিংড়ির গুনগত মান ও খাদ্য-নিরাপত্তার উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। সংগত কারনেই তাই পুকুরে উল্লেখিত উৎসের জৈব সার ব্যবহার না করাই উত্তম।

৫। **মাছ বা চিংড়ির খামারে ব্যবহৃত খাদ্য সম্পর্কিত যত্ন ও সতর্কতার গুড প্রাকটিস:**

চিংড়ি একটি দামী পণ্য হওয়ায় চাষ পর্যায়ে তার যথাযথ দৈহিক বৃদ্ধি নিশ্চিত করার জন্য বাড়তি খাবার দেয়ার ক্ষেত্রে চাষি খুবই সচেতন। তবে অধিক বৃদ্ধির প্রত্যাশায় চাষি অনেক সময় সঠিক নিয়ম অনুসরণ না করেই খাবার ব্যবহার করে থাকেন। এর ফলে যেমন নিম্ন মানের খাবার ব্যবহার করা হয়ে থাকে তেমনি সার্বিক খাদ্য ব্যবস্থাপনার বিষয়টি অনিয়ন্ত্রিত হয়ে পড়ে। নিম্ন মানের খাদ্য এবং খাদ্যের অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার কেবল চিংড়ির জন্য ক্ষতিকর নয় তা ভোক্তার স্বাস্থ্য ঝুঁকিও তৈরী করে। শুধু তাই নয়, চাষ পর্যায়ে ব্যবহৃত খাদ্যে অগ্রহনযোগ্য বা ক্ষতিকর উপাদানের ব্যবহার এবং ত্রুটিপূর্ণ ও অস্বাস্থ্যকর সংরক্ষণ ব্যবস্থা খাদ্যকে চিংড় এবং ভোক্তার জন্য বিপদজনক করে তুলতে পারে। চাষ পর্যায়ে চিংড়িকে স্থানীয়ভাবে সহজলভ্য বিভিন্ন কাঁচা খাবার, যেমনঃ শামুক ও ঝিনুকের মাংস, মরা মাছ, মরা প্রাণীর মাংস ও নাড়ী-ভূড়ী, স্কুইড, কাঁকড়া চূর্ন, ইত্যাদি দেয়া হয়। এ ধরণের খাবার ব্যবহারে চাষিরা বেশী উৎসাহী, কারণ তাতে খরচ কম। কিন্তু, বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই এ ধরণের কাচা খাবার বিভিন্ন ধরণের রোগ-জীবাণু দ্বারা সংক্রমিত থাকে, যেমন- স্যালমোনেলা, ভি.কলেরা, ই.কলি, ইত্যাদি এবং খাবারের মাধ্যমে তা খুব সহজেই চিংড়িতে সংক্রমিত হয়।

তাছাড়া এ ধরনের কাঁচা খাবার খুব সহজেই পানিকে দূষিত করে পানির স্বাভাবিক গুণাগুনকে নষ্ট করে ফেলে। এর ফলে চিংড়ির ব্যাপক মড়কও দেখা দিতে পারে। তবে এ সমস্ত কাঁচা খাবার ভালভাবে সিদ্ধ করে ব্যবহার করলে সম্ভাব্য রোগ-জীবাণু সংক্রমন রোধ করা সম্ভব হবে।

৬। ঔষধের ব্যবহারের গুড প্রাকটিস:

প্রাণীকুলের রোগ নিরাময়ের জন্য বিভিন্ন ঔষধের আবিষ্কার হলেও এর অপব্যবহার আবার প্রাণীর জন্য মারত্মক অবস্থা সৃষ্টি করে। উদাহরণ হিসাবে চাষ পর্যায়ে বিভিন্ন এ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহারের বিষয়টি উল্লোখ করা যেতে পারে। এ্যান্টিবায়োটিকের ব্যবহার চাষ ক্ষেত্রে মাছ ও চিংড়ির রোগ নিরাময়ে সহায়ক হলেও এর অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার পরিশেষে চাষির জন্য বিপদ ডেকে আনে। অনিয়ন্ত্রিত ও দীর্ঘ ব্যবহার চিংড়ির দেহে এ্যান্টিবায়োটিকের অবশেষ (রেসিডিউ) জমা করে এবং চিংড়ির মাধ্যমে তা মানুষের শরীরে প্রবেশ করে বিভিন্ন বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। চাষ পর্যায়ে ঔষধের নিয়ন্ত্রণহীন ব্যবহার চাষির জন্য উপকারের পরিবর্তে ক্ষতির কারণ হয়ে দাড়ায়। খামারে নিয়োজিত কর্মী, পরিবেশ এবং ভোক্তার স্বাস্থ্যের উপর ঔষধের ক্ষতিকর প্রভাব প্রশমনের জন্য ঔষধ প্রয়োগ, মাত্রা নির্ধারণ এবং এর অবশেষ নি:শেষের সময় (উইথড্রয়াল পিরিয়ড) মেনে চলার ক্ষেত্রে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বনের পাশা পাশি স্টোরে ঔষধ সংরক্ষণ ও ব্যবহারের পর অবশিষ্টাংশ এবং খালি প্যাকেট বা পাত্র ফেলে দেওয়ার বিষয়টিও গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা উচিৎ।

৭। খামারে আহরণপূর্ব গুড প্রাকটিস:

চাষের সময় সাধারণত: প্রত্যেক চাষি নির্দিষ্ট সময় অন্তর চিংড়ির আকার, পরিমাণ এবং স্বাস্থ্যগত অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে থাকেন। এটি এক ধরণের রুটিন চেক, যা উত্তম চাষ ব্যবস্থাপনার জন্য খুবই প্রয়োজন। খামারে উৎপাদিত মাছ বা চিংড়ির গুণগতমান এবং খাদ্য-নিরাপত্তার অবস্থা কাংখিত স্ট্যান্ডার্ডে অর্জন করা সম্ভব হয়েছে কিনা আহরণের পূর্বে সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া খুবই জরুরী। এ জন্য চিংড়ি আহরণের ৭-১০ দিন আগে একটি আহরণ-পূর্ব পরীক্ষা কার্যক্রম সম্পন্ন করা উচিৎ। পক্ষান্তরে, আহরণ-পূর্ব পরীক্ষায় বা মূল্যায়ণে ত্রুটি ধরা পড়লে পুকুরে প্রয়োজনীয় সংশোধন ব্যবস্থা প্রয়োগ করে সম্ভাব্য সমস্যা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যেতে পারে।

৮। সামাজিক ও পরিবেশগত বিষয়ের গুড প্রাকটিস :

মাছ বা চিংড়ি চাষের ক্ষেত্রে সামাজিক ও পরিবেশ সম্পর্কিত বিষয় উৎপাদিত মাছ বা চিংড়ি খাদ্য নিরাপত্তার ওপর সরাসরি প্রভাব না ফেললেও টেকসই মাছ বা চিংড়ি চাষ, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং চাষ এলাকার জনগোষ্ঠীর জীবন-জীবিকার ওপর একটি সুদূর প্রসারী প্রভাব রয়েছে। এ জন্য ঘের/খামার মালিককে দেশের প্রচলিত আইনসমূহ যথাযথভাবে মেনে চলতে হবে। উপকূলীয় ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল ও প্রাকৃতিক জলাশয় ধ্বংস করে, এলাকার জনগোষ্ঠীর জীবন-জীবিকাকে ক্ষতিগ্রস্থ করে ঘের/খামার নির্মাণ করা যাবে না।

৯। শ্রম অধিকার ও শিশু শ্রমের ব্যবহার সম্পর্কিত গুড প্রাকটিস:

মাছ ও চিংড়ি চাষের ক্ষেত্রে সামাজিক ও পরিবেশগত বিষয়ের ন্যায় শ্রম অধিকার ও শিশু শ্রমের বিষয়টিও গুরত্বপূর্ণ। শ্রমিকের অধিকার সংরক্ষণ এবং শিশুশ্রম নিয়ন্ত্রণের জন্য দেশে "শ্রম আইন ২০০৬" বিদ্যমান আছে। আইনের কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিচে উল্লেণ্থখ করা হলো:

- সকল শ্রমিককে লিখিত নিয়োগপত্র এবং পরিচয়পত্র দিতে হবে।
- দুর্ঘটনায় কোন শ্রমিকের মৃত্যু বা পঙ্গু হলে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।
- ৮ ঘন্টার বেশী কাজ করালে ওভার টাইম দিতে হবে।
- সপ্তাহে একদিন সাধারণ ছুটি দিতে হবে।
- ১৪ বছরের কম বয়সের কোন ব্যক্তিকে কাজে নিয়োগ করা যাবে না।

১০। আহরণের সময় অনুসরণীয় প্রাকটিসসমূহ:

মৎস্য বা চিংড়ি খামারে মৎস্য আহরণের কাজটি এমন কতগুলি ধাপের মধ্য দিয়ে সম্পন্ন হয় যা উৎপাদিত চূড়ান্ত পণ্যের গুণগতমান ও খাদ্য-নিরাপত্তাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করতে পারে। গুরুত্বপূর্ন ধাপগুলি হল:

- খাবার কমিয়ে দেয়া/বন্ধ করে দেয়া;
- আহরণের জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম, উপকরণ, কর্মী প্রস্তুত রাখা;
- হ্যান্ডলিং ও পরিবহন;

মাছ বা চিংড়ি ধরার কাজটি সাধারণত: নোংরা অবস্থায় হলেও মাছ রাখার কাজে ব্যবহৃত পাত্রগুলিকে ভালভাবে পরিষ্কার ও জীবাণু মুক্ত করে নিতে হবে। কারণ, নোংরা পাত্রের গায়ে লেগে থাকা ময়লা থেকে জীবাণু সংক্রমণ ঘটতে পারে। চিংড়ি রাখা এবং পরিবহনের কাজে ব্যবহৃত সকল বাস্কেট, টাব ও অন্যান্য পাত্রকে যথাযথভাবে পরিষ্কার এবং জীবাণূ মুক্ত করতে হবে।

মাছ বা চিংড়ি ধরার কাজে যে সমস্ত ব্যক্তিকে নিয়োজিত করা হবে তাদেরকে অবশ্যই সুস্বাস্থ্যের অবস্থায় (রোগ মুক্ত) থাকতে হবে। বিশেষ করে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির হাতে কোন কাটা ঘা বা দূষিত ক্ষত থাকবে না। ধরার পর সরাসরি হাত দিয়ে মাছ বা চিংড়ি হ্যান্ডলিং না করে দস্তানা (হ্যান্ড গেণ্ল্গাভস্) পরে হ্যান্ডলিং করা সবচেয়ে ভাল।

মাছ বা চিংড়ির আহরণোত্তর পরিচর্য্যার উপর অতিমাত্রায় গুরুত্ব আরোপের ফলে সাধারণভাবে আমরা মনে করে থাকি যে, কেবলমাত্র আহরণোত্তর পরিচর্য্যার উপরই চিংড়ির গুনগতমান ও খাদ্য-নিরাপত্তার বিষয়টি নির্ভরশীল। কিন্তু অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা যায় যে, খামারে উৎপাদিত চিংড়ির গুনগতমান ও খাদ্য-নিরাপত্তার বিষয়টি মূলতঃ চাষের পরিবেশের উপর নির্ভর করে। খাদ্য-নিরাপত্তার বিষয়টি চাষের পরিবেশের সংগে সরাসরি সম্পর্কিত হওয়ায় চিংড়ি চাষে সফলতা অর্জন অনেকাংশেই চাষের পরিবেশ নিয়ন্ত্রণের সক্ষমতার সংগে ওতপ্রতভাবে জড়িত। চাষ পর্যায়ে পরিবেশ নিয়ন্ত্রণের এই কাজটি গুড এ্যাকুয়াকালচার প্রাকটিস বা ভাল চাষ অভ্যাস অনুসরণের মাধ্যমে অর্জন করা যেমন সম্ভব হবে তেমনি একই সাথে চাষ পর্যায়ে “হ্যাসাপ নীতিমালা” বাস্তবায়ন সুগম হবে।

পরিশিষ্ট-১(Annexure-1)

তফসিল-৩ (ধারা -১১) Schedule 3 (Rule-11)

মৎস্য হ্যাচারি বিধিমালা ২০১১ (Fish Hatchery Rules, 2011)

গ্রুপ- এ

মৎস্যচাষ ও মৎস্যপণ্য উৎপাদনে নিষিদ্ধ ঘোষিত ঔষধ ও রাসায়নিক দ্রব্যের তালিকা

১। স্টীলবিন্স এবং তার সহযোগী লবণ ও এ্যাস্টার (গলদা ও বাগদা হ্যাচারির জন্য উক্ত দ্রব্যাদি পরীক্ষা করতে হবে)

২। স্টেরয়েড

৩। ইসি নির্দেশিকা ২৩৭৭/৯০, ২৬ জুন ১৯৯০ এর সংযুক্তি ৪ এ উল্লেখিত ড্রাগসমূহ:

(ক) ক্লোরামফেনিকল
(খ) ক্লোরোফর্ম
(গ) ক্লোরোপ্রোমাজিন
(ঘ) কোলছিসিন
(ঙ) ডেপসন
(চ) ডাইমেট্রিডায়াজল
(ছ) মেট্রোনিডায়াজল
(জ) নাইট্রোফিউরান
(ঝ) রোনোডাজন

হ্যাচারিতে উপরোক্ত ১, ২ ও ৩ ক্রমিকে বর্ণিত দ্রবাদির উপস্থিতি সম্পর্কে হ্যাচারি মালিক বছরে একবার পরীক্ষা করতঃ তার প্রতিবেদন খামারে সংরক্ষণ করবেন।

গ্রুপ-বি

প্রাণির চিকিৎসার জন্য ব্যবহৃত ঔষধ এবং তার অবশিষ্টাংশ

১। অ্যান্টি ব্যাকটেরিয়াল দ্রব্যসমূহ, সালফোনিমাইডস এবং কুইনোলনস

২। (ক) অন্যান্য পশু বা প্রাণীর চিকিৎসায় ব্যবহৃত ঔষধ
(খ) এ্যাসথালমিনটিকস

৩। অন্যান্য দ্রব্য এবং পরিবেশ হতে মিশ্রিত অবশিষ্টাংশ-

৩ (এ) চপইং সহ অরগানোক্লোরিণ যৌগ।
৩ (বি) অরগানো ফসফরাসের যৌগ।
৩ (সি) রাসায়নিক পদার্থ।

৩ (ডি) মাইকোটক্সিন।

৩ (ই) রং।

হ্যাচারিতে উপরোক্ত ৩ (এ), (বি), (সি), (ডি), (ই) ক্রমিকে বর্ণিত দ্রব্যাদির উপস্থিতি সম্পর্কে হ্যাচারি মালিক বছরে একবার পরীক্ষা করতঃ তার প্রতিবেদন খামারে সংরক্ষণ করবেন।

গ্রুপ -সি

মৎস্যচাষে ব্যবহার করা যাইবে এমন ঔষধের তালিকা এবং তাহার ব্যবহার মাত্রা ইউএসএফডিএ এবং এনএফআই অনুমোদিত (২১সিএফআর-৫২২-১০৮১)।

ক্রমিক নং	দ্রবণ/যৌগের নাম	ব্যবহার
১।	ক্রোনিক গোনাডেট্রপিন	স্পনিং কার্যক্রম উন্নয়নের জন্য ব্রুড এর ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাইবে (২১ সিএফআর -৫২২-১০৮১)।
২।	ফরমালিন দ্রবণ	প্রোটোজোয়া এবং মনোজেনেটিক ট্রেমাটোড এবং ফাংগি (fungi) নিয়ন্ত্রণে ব্যবহার করা যাইবে (২১ সিএফআর -৫২৯-১০৩০)। খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হইবে এমন কোন মৎস্য বা তাহার মাংসল অংশে ব্যবহার করা যাইবে না।
৩।	ট্রাইকেইন-মিথেন সালফোনেট	ক্যাটফিস, ট্রাউট, স্যালমন, পাইক, পার্চ এর ক্ষেত্রে খুবই স্বল্প পরিমাণে হ্যাচারিতে ব্যবহার করা যাইবে। ব্যবহারের ২১ দিনের মধ্যে কোন মৎস্য ধরা যাইবে না (২১ সিএফআর -৫২৯-২৫০৩)।
৪।	অক্সিটেট্রাসাইক্লিন	চিংড়ি ও মাছ এর ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাইবে। ব্যবহারের কমপক্ষে ৩০ দিন পর মৎস্য ধরা যাইবে (২১ সিএফআর ৫৫৮- ৪৫০)।
৫।	সালফাডাইমিথোক্সিন বা আরমেট্রপিন যৌগ	চিংড়ি ও মাছ জাতীয় মৎস্যে ব্যবহার করা যাইবে। ব্যবহারের কমপক্ষে ৪২ দিন পর মৎস্য ধরা যাইবে। মৎস্যের মাংসল অংশে এর গ্রহণযোগ্য মাত্রা ০.১ পিপিএম (২১ সিএফআর ৫৫৬-৬৪০)।

খ) বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থের গ্রহণযোগ্য মাত্রা হ্যাচারিতে নিম্নে বর্ণিত রাসায়নিক দ্রব্যাদির উপস্থিতি সম্পর্কে হ্যাচারি মালিক বছরে একবার পরীক্ষা করতঃ তার প্রতিবেদন খামারে সংরক্ষণ করবেন।

১.	লেড	৪.	কপার
২.	মারকারি	৫.	আর্সেনিক
৩.	ক্যাডমিয়াম	৬.	জিংক

গ) বিভিন্ন কীটনাশকের গ্রহণযোগ্য মাত্রা

১.	অরগানো-ক্লোরিণ	৫০.০ মাগ্রা/কেজি পানিতে
২.	পিসিবিএস (চঙ্গইং)	৫০.০ মাগ্রা/কেজি মৎস্যের মাংসে
৩.	এলড্রিন	০.০২ মাগ্রা/কেজি মৎস্যের মাংসে

৪.	ডিডিটি	২.০ মাগ্রা/কেজি মৎস্যের মাংসে
৫.	হেপ্টাক্লোর	২.০ মাগ্রা /কেজি মৎস্যের মাংসে
৬.	ডাইএলড্রিন	২.০ মাগ্রা /কেজি মৎস্যের মাংসে

ঘ) বিভিন্ন অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল দ্রব্যের গ্রহণযোগ্য মাত্রা

১.	টেট্রাসাইক্লিন	৭.	এমোক্সিসিলিন
২.	অক্সিটেট্রাসাইক্লিন	৮.	অক্সিলিনিক এসিড
৩.	সালফা মিথোক্সিন	৯.	ডাইফ্লক্সিন
৪.	সালফা ডাইমিথোক্সিন	১০.	ক্লোরটেট্রাসাইক্লিন
৫.	সালফা ডায়াজিন	১১.	সালফোনিলামাইডস
৬.	সালফা থায়াজিন	১২.	কুইনোলনস

ঙ) রোগ প্রতিরোধে হ্যাচারিতে ব্যবহৃত রাসায়নিক দ্রব্যাদি ও ঔষধপত্রের নাম নিম্নে দেওয়া হলো:

• ব্লিচিংপাউডার (৬০-৬৫% ক্লোরিণ)	• ইডিটিএ (Ethylene Di-amino Tetra acetic Acid)
• সোডিয়াম হাইপো-ক্লোরাইড (তরল)	• অ্যাকোয়াকালচার প্রোবায়োটিক্স
• ফরমালিন (ল্যাব গ্রেড)	• জুথামসাইড/প্রোটোজোয়াসাইড
• ফরমালিন (কমার্শিয়াল গ্রেড)	• মিথিলিন ব্লু
• সোডিয়াম থায়োসালফেট	• ভিটামিন প্রিমিক্স/মাল্টিভিটামিন/ভিটামিন-সি
• সোডিয়াম বাই-কার্বনেট	• এমএস-২২২(চেতনা নাশক)
• অক্সি-টেট্রাসাইক্লিন	• কুইনালডিন(চেতনা নাশক)
• ট্রেফলন	• ক্লোভ অয়েল (চেতনা নাশক)
• প্রিফুরান	• খাবার লবণ (ছত্রাকনাশক ও জীবাণুনাশক)

চ) হরমোন /প্রণোদক

- **প্রাকৃতিক প্রণোদক:** পিজি, এলআরএইচ (LRH) এবং GdGmGBP (FSH)
- **সিনথেটিক প্রণোদক:** ওভাপ্রিম, এইচসিজি (HCG), ওভাক্লিন
- **HCG-**গ্লাইকোপ্রোটিন, ৪০-১২০ দিনের গর্ভবতী মহিলার প্রস্রাব হতে প্রস্তুত
- **পিজি-** মাছের মাথার খুলির মধ্যে থাকে।

মাছ চাষের রেকর্ড সংরক্ষণ

উত্তম মৎস্য চাষ অনুশীলনে (Good Aquaculture Practice) মাছ চাষের তথ্য সংরক্ষণ অতিব প্রয়োজন। মাছ চাষের পুকুর প্রস্তুতি, পোনা সংগ্রহ, খাদ্য প্রয়োগ, ঔষধ প্রয়োগ, নমুনায়ন, আহরণ, বাজারজাতকরণসহ প্রতিটি ধাপের রেকর্ড লিখিতভাবে সংরক্ষণ করা উত্তম। একটি রেকর্ড বইয়ে, পুকুরের আয়তন, চুন, সার, ঔষধের নাম, প্রয়োগের পরিমাণ, প্রয়োগের তারিখ, মজুদ সংখ্যা, আকার, মজুদের তারিখ, চাষকালীন খাদ্য প্রয়োগের তারিখ ও পরিমাণ, ক্রয় মূল্য, মাছ চাষের নমুনায়ন ও মাছের শারীরিক বৃদ্ধির হার, আহরণ ও বিক্রয় মূল্য ইত্যাদি তথ্য নিয়মিত লিপিবদ্ধ করা প্রয়োজন। এসব লিখিত তথ্য সংরক্ষণ করলে তা যুগপতভাবে চাষির ভবিষ্যত চাষের পরিকল্পনা গ্রহণে এবং নতুন বছরের চাষে উন্নয়ন ও অগ্রগমন ঘটাতে সহায়তা করবে। সার্বিক চাষ ব্যবস্থা মূল্যায়নে এবং তুলনা মূলক বিচার বিশ্লেষণে সহায়তা করবে।

যারা লিখেছেন

জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়

১.	জনাব মোঃ তোফাজ উদ্দিন, জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, নরসিংদী
২.	জনাব মোহাঃ মোজাম্মেল হক, সিনিয়র সহকারী পরিচালক, এনএটিপি-২, মৎস্য অধিদপ্তর
৩.	জনাব অজিত কুমার সাহা, সহকারী পরিচালক, জেলা মৎস্য দপ্তর, নেত্রকোনা
৪.	জনাব বিশ্বজিৎ বৈরাগী, উপপ্রকল্প পরিচালক, যশোর অঞ্চলে মৎস্যচাষ উন্নয়ন প্রকল্প, যশোর
৫.	জনাব মনিষ কুমার মন্ডল, সহকারী পরিচালক, উপপরিচালকের দপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর, খুলনা
৬.	জনাব মুহাম্মদ মামুনুর রশিদ, সহকারী পরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর
৭.	বেগম শবনম মোস্তারী, সহকারী পরিচালক (অর্থ), মৎস্য অধিদপ্তর
৮.	জনাব শেখ মনিরুল ইসলাম মনির, সহকারী পরিচালক, এনএটিপি-২, মৎস্য অধিদপ্তর
৯.	বেগম আয়েশা সিদ্দিকা, সহকারী পরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর
১০.	মোছাঃ নাসিমা সুলতানা, সহকারী পরিচালক, প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট, এনএটিপি-২, মৎস্য অধিদপ্তর
১১.	জনাবঃ বিচিত্র কুমার সরকার, খামার ব্যবস্থাপক, মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার, সদর, নরসিংদী
১২.	জনাব এ এস এম সানোয়ার রাসেল, সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ঈশ্বরগঞ্জ, ময়মনসিংহ

১৩.	জনাব মোঃ ইসহাক, খামার ব্যবস্থাপক, মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার, টঙ্গী, গাজীপুর
১৪.	জনাব আ.ন.ম মাহফুজ আল হামিদ, খামার ব্যবস্থাপক, মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার, শম্ভুগঞ্জ, ময়মনসিংহ